প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৭৮
[অগাস্ট, ১৯৭১]

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় ডিভিশন
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণ
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন
আরমানিটোলা, ঢাকা ১

প্রচ্ছদ ঃ এ. মুক্তাদির

MEER MOSHARRAFER GADYA RACHANA—an analysis of prose works of Meer Mosharraf Hossein by Dr. Md. Abdul Awal, published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh.

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মুহম্মদ আবদুল হাই

শহীদ মুনীর চৌধুরী

আমার শ্রদ্ধেয় তিন শিক্ষকের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত

লেখকের নিবেদন

আলোচ্য গ্রন্থটি মূলতঃ আমার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে রচিত পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের বাংলা রূপান্তর। 'মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনা (১৮৬৯-৯৯)' এই ছিল আমার অভিসন্দর্ভের শীর্ষনাম। মশাররফ সম্পর্কে এদেশে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য এবং বিদেশে প্রাপ্ত আরও অধিকতর তথ্যের সাহায্যে এই গ্রন্থ রচিত।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুই বৎসর চার মাস (অক্টোবর, ১৯৬৪ থেকে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭) অধ্যয়নকালে এই সন্দর্ভ রচিত।

আমার পরলোকগত শিক্ষক প্রফেসার ক্লার্ক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই অভিসন্দর্ভটি রচিত। বছর কয়েক আগে তিনি পরলোকগমন করেন। আমার গবেষণা-কর্মে তাঁর সহায়তা আজ বারংবার স্মরণ করছি। তদুপরি লণ্ডনস্থ স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের গ্রন্থাগার, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহযোগিতাও এ প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনা-পাঠ দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গদ্যে উপন্যাস কিংবা নাট্য শাখায় মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সার্থক শিল্পী। দ্বিতীয়তঃ তাঁর গদ্য রচনা তৎকালীন বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিকের পরিচয় বহন করে। সমাজ জীবনের এই পট উন্মোচন শুধু সমাজবিজ্ঞানী নয়, সাধারণ পাঠকদেরও কৌতূহলের উদ্রেক করে।

যে কোন সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন রকমের তাৎপর্য বহন করে থাকে। কোন গ্রন্থকার প্রথমেই কোন নাট্যিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করার জন্য কাহিনীর কল্পনা করে থাকেন। অথবা বিভিন্ন রকম চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য; অথবা কোন মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে হউক বা যেভাবে হউক তিনি তাঁর রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বা অনন্যসাধারণ করে তোলেন। এবং কল্পনায় তিনি সমস্যা বা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে থাকেন। সমাজে মানুষের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, তা এই নির্বাচনের দ্বারা লেখক সুপরিস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা করেন। শ্রেণী হিসাবে মানুষের দায়িত্ব, অধিকার, কর্ম সম্পর্কে ধারণা, প্রেম, ধর্মপ্রীতি প্রকৃতিপ্রীতি বা শিল্পপ্রীতি এ ধরনের বিষয়কে লেখক তাঁর সাহিত্যের অঙ্গীভূত করেন।[১] মশাররফ সম্পর্কেও উপরের এই উক্তিগুলি সত্য। তাঁর রচনায় বিভিন্ন আবেগ-উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটেছে নানা-ভাবে—যেমন সমাজে নারীর নিরাপত্তার অভাব, জমিদার শ্রেণীর লোকদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন। মীর মশাররফ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের জীবন বিভিন্ন শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত—এই শক্তিগুলি মনুষ্য সমাজে সর্বদা ক্রিয়াশীল। যেহেতু মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে, অতএব সে এর মধ্যে প্রেমে পড়ে বা ঘৃণা-বিদ্বেষের শিকার হয় এবং সংগ্রাম করে, দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, পরিশেষে

ঐ সমাজের একজন সদস্য হিসাবেই মৃত্যুবরণ করে। সৃজনশীল লেখকরা, যেহেতু বলা হয়ে থাকে মীর মশাররফ হোসেনও একজন সৃজনশীল লেখক; মানুষ কিভাবে এই সমস্ত সাধারণ অভিজ্ঞতায় সাড়া দেয়, তাই বর্ণনা করে থাকেন। যেহেতু মানুষের মশাররফ একজন সূক্ষ্মদর্শী পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং যে সমস্ত নরনারী সমাজের বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে পড়ে সংগ্রাম করছে তাদের চরিত্র এবং স্বভাব ও আচরণকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ করার মত শক্তি তাঁর ছিল। মানুষের এই কষ্ট বা সংগ্রামকে তিনি কখনো সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন, কখনো বা বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। বিশেষ করে ধনীদের আচরণ, নীতি বা প্রচলিত ধর্মবোধকে যখন তাঁরা বর্জন বা পরিহার বা উপেক্ষা করেছেন, সে ক্ষেত্রে মশাররফ অত্যন্ত কঠোর হয়েছেন।

পরে আমরা লক্ষ্য করবো যে, মশাররফের কিছু সংখ্যক রচনা গল্প বা উপন্যাস, কিছু সংখ্যক হচ্ছে জীবনী, তা-ও আবার আত্মজীবনীমূলক রচনা।

উনবিংশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে মশাররফ যে প্রথম প্রতিভাবান স্রষ্টা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি লিখেছেন কবিতা, গদ্য, কাহিনী এবং নাটক। অবশ্য মীর মশাররফের পূর্ববর্তী কয়েকজন গদ্য লেখকের সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু সাহিত্যিক রচনা বলতে যা বুঝায় ঐগুলি ঠিক তা নয়। এই সমস্ত রচনার মধ্যে প্রথমে আমরা ১৮৬০ সালে প্রকাশিত খোন্দকার সামসুদ্দিন সিদ্দিকী রচিত "উচিৎ শ্রবণ"-এর উল্লেখ করতে পারি।[২] এটি একটি আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থ। ঐ যুগে রচিত অন্যান্য উপদেশমূলক রচনার সগোত্রও এটি। সাধারণ রসিক পাঠকের কাছে এর আবেদন ছিল অতি সামান্যই। অধিকন্তু এ পুস্তকের অনেকটা অংশ পদ্যে রচিত। তারপর আমরা আরও দুই-তিনজন লেখকের সন্ধান পাই, এরা হলেন: মুন্সী নামদার গোলাম হোসেন (সম্ভবতঃ নামদারের অন্য নাম) এবং শেখ আজিমুদ্দিন।

মুন্সী নামদার কমপক্ষে বারখানা[৩] পুস্তিকা রচনা করেন। নামদারের পুস্তিকাগুলি গদ্যে পদ্যে রচিত, পুস্তিকাগুলির আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কোনটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮, কোনটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। এগুলি ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য নেহায়েৎ তুচ্ছ। যদিও কোন কোন রচনার চতুর্থ মুদ্রণ পর্যন্ত হয়েছিল। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত গোলাম হোসেনের 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' নামদারের রচনা থেকে নেওয়া

হয়েছিল মনে হয়।[৪] শেখ আজিমুদ্দিনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে'[৫] একটি ক্ষুদ্র প্রহসন। এর বিষয়বস্তু হলো অর্থবান বৃদ্ধ কর্তৃক তরুণী বিবাহ। আলোচ্য পুস্তিকাটিও গদ্য পদ্য মিশ্রিত ভঙ্গীতে রচিত। মীর মশাররফ হোসেনের ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম রচনা 'রত্নবতী' বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। উপরে বর্ণিত গ্রন্থকারদের রচনার চাইতে রচনাশৈলীর দিক থেকে 'রত্নবতী' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। যদি কোন লেখক দ্বারা মশাররফ প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন তবে একথা নিশ্চিত যে, তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী, কোন মুসলমান লেখকের নিকট নয়। মশাররফের 'রত্নবতী' প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের দু'খানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়।[৬] বঙ্কিমের রচনাভঙ্গী ও মশাররফের রচনাশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত হওয়াতে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মশাররফ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসমূহ পাঠ করে থাকবেন।

'রত্নবতী'র চরিত্রগুলি অতিপ্রাকৃত বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন বা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন তথাপি তাদের মধ্যে মানবিক অনুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। 'রত্নবতী'র এক নায়ক সুমন্ত যে রাজকুমারীকে ইন্দ্রজালের সাহায্যে লাভ করেন, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সুমন্ত তার বন্ধুর জন্য উক্ত রাজকুমারীকে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মশাররফের রচনায় প্রেম কখনও সফল হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'বিষাদ সিন্ধু'র এজিদ যে নারীকে চেয়েছিল তাকে পায়নি। তাঁর রচনায় অন্যান্য নায়কদের জীবনেও আমরা ব্যর্থতা ও হতাশা লক্ষ্য করি। নরেন্দ্র এবং বসন্তকুমারীর জীবন বিনাপরাধে নষ্ট হয়ে গেল। 'জমিদার দর্পণে' নুরুন্নেহার এক দুশ্চরিত্র জমিদারের লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিল। আবু মোল্লা এক দুর্বল নিরীহ কৃষক, পরাক্রান্ত জমিদার কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত হলো। অভিজাত বা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে লাম্পট্য উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান ছিল। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'র হাকিম সাহেব বেগম সাহেব দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের প্রতিনিধি। নীলকর কেনী একটি ঐতিহাসিক চরিত্র, তাকেও দেখি মানসিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। যার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকতার দিকে

দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। অপরপক্ষে মুসলমান সমাজ অনেক পশ্চাতে পড়ে থাকে। মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়, বিশেষ করে জমিদার সমাজ ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছিল। দারিদ্র্য ও কুসংস্কার হেতু মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ হয়। ফলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, চাকরীর ক্ষেত্রে বা সামাজিক সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে তারা পশ্চাতে পড়ে থাকে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত নগণ্য ছিল। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও অবস্থা একইরূপ ছিল। সবকিছু মিলিয়ে মুসলমান সমাজে, বিশেষ করে উচ্চ মহলে একটা হতাশার ভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মশাররফের সব রচনায়ই তিনি যে মুসলমান সম্প্রদায়ের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন তার মধ্যে একটা হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এই হতাশা মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে এই সময়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মুসলমান সমাজে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল কিনা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালে মুসলমান সমাজ উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তবে 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে ডাক্তার হাকিম বা মৌলবী সাহেব বা ভেড়াকান্ত চরিত্রগুলোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ বলে অনুমান করা যেতে পারে। তবে সমাজে এদের গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প। আলোচ্য পুস্তকে সংঘাত হচ্ছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সাহায্যপুষ্ট ধনী জমিদার এবং দরিদ্রের মধ্যে। ধনী ব্যক্তিরা সম্পদ বা পদমর্যাদার সব রকম সুযোগ ভোগ করতো। আর গরীবেরা দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচার যন্ত্রণা ভোগ করতো। আর মশাররফের রচনায় যে ইউরোপীয় নীলকর সাহেবের আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে সেও ধনী ব্যক্তি ও সমাজের উচ্চ স্তরের অধিবাসী।

মশাররফ এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় সামাজিক অগ্রগতির দিক থেকে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দেখা যায় মশাররফ সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করেছেন একটি সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে সংগ্রামের জন্য, এবং সমাজে উচ্চতর আসন লাভের জন্য। 'গাজী মিঁয়ার

বস্তানী' এবং 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থে যেখানে কৃষক সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত এবং অত্যাচারিত, সে সব স্থলে মশাররফ বিত্তবান অভিজাতদের প্রতি কটু মন্তব্য করেছেন। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' এবং 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে মশাররফের মন্তব্য থেকে এ কথা অনুমান করা যায় যে, তিনি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে ন্যায়বিচার এবং সকলের সমান অধিকার থাকবে।

সর্বশেষে আত্মজীবনী রচয়িতা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে মশাররফ হোসেনের স্থান উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর কৃতিত্বের কথা পাঠকদের জোর করে শোনাতে চান না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। এ হিসাবেও তিনি প্রশংসার দাবীদার। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।[৭] সে সব গ্রন্থে মোটামুটি লেখকেরা নিজেদের কৃতিত্বের কথা কল্পনার রঙ চড়িয়ে বেশ ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। ঐ সব লেখকদের তুলনায় মশাররফ অনেকটা আত্মপ্রচারবিমুখ ও বিনীত ছিলেন। যদিও মাঝে মাঝে এমন সন্দেহ হয় যে, লেখক কি সত্যি কোন যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, না তাঁর জীবনের কোন সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন, না কবি-কল্পনার রাজ্যের কোন গল্প বলেছেন।

মশাররফের জীবন-কাহিনী তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনেক উপাদান যুগিয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব তাঁর রচিত সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে মেয়েকে ভালবেসেছিলেন, তাকে লাভে ব্যর্থ হন। ঘটনাচক্রে অন্য মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, এবং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড গমনে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি ঘটনা তাঁর সমগ্র জীবন-ব্যাপী তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে এবং এই ব্যর্থতার স্বাক্ষর তাঁর রচনায় পরি-লক্ষিত হয়।

এই গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র গদ্য রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও তিনি কয়েকটি কবিতা গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, সেগুলিকে তেমন উঁচুদরের সাহিত্যকীর্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না। শুধু তাঁর যে সমস্ত রচনাগুলো ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোই আলোচনা করা হয়েছে। যদিও তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের পরেও প্রকাশিত হয়েছিল : যেমন, 'এসলামের জয়' (১৯০৮), এটি মোটামুটিভাবে এসলামের তথা আরবের ইতিহাস; 'আমার জীবনী'

(১৯০৮-১০) বার খণ্ডে রচিত আত্মজীবনী; 'বিবি কুলসুম' (১৯১০), তাঁর স্ত্রীর জীবনী। জীবনী গ্রন্থগুলি মশাররফের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক তথ্য সরবরাহে সহায়তা করে। এই গ্রন্থে—এই সমস্ত জীবনী গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী তাঁর প্রথম জীবনের রোমান্টিক মধুর স্মৃতিচারণ, এবং 'বিবি কুলসুম' তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

উক্ত সময়ের মধ্যে মশাররফ একটি প্রহসন 'এর উপায় কি' (১৮৭৬) রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া গিয়াছে। 'গো-জীবনী' নামক প্রবন্ধটি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। একটি বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে রচিত এ প্রবন্ধ। এ সমস্ত কারণে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

সর্বশেষে মশাররফ হোসেনের খ্যাতি যে সমস্ত গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল সেগুলো ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ঐ রচনা-গুলিই মশাররফের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যকর্ম। ঐ গ্রন্থগুলির জন্যই মশাররফ উনিশ শতকের গদ্য লেখকদের মধ্যে একজন যথার্থ প্রতিভাবান শিল্পী।

তথ্য নির্দেশ

১ "Sets out to invent a plot to describe action, to depict inter-relationship of characters, to emphasize certain values......he presents an explicit or implicit picture of man's orientation to society." Leo Lowenthal, *Literature and the Image of Man*, Boston, 1958, Introduction; *Social Meaning in Literature.*

২ মানবের পক্ষে কি শ্রবণ করা উচিৎ বা অনুচিৎ তাহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে এই লেখকের সম্পাদনায় উক্ত পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।

৩ মুন্সি নামদারের গ্রন্থগুলি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে:

(ক) কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ, ১৮৬৩

(খ) দুই সতীনের ঝগড়া, ১৮৬৮

(গ) কলির বউ হা ; জ্বালানী, ১৮৬৮

(ঘ) কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী, ১৮৬৮

(ঙ) ননদ ভাজের ঝগড়া, ১৮৬৮

(চ) ও বাঞ্ছারামের গল্প, ১৮৬৮

(ছ) বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা, ১৮৬৮

(জ) মনোহর ফেঁসেড়া, ১৮৬৮

(ঝ) নারীর ষোল কলা, ১৮৬৮

(ঞ) ও খেলারামের গীত, ১৮৬৮

(ট) নূতন ঝড়, ১৮৬৮

(ঠ) খেদের গান, ১৮৬৮।

[৪] গোলাম হোসেনের পরিচয় জানা যায় না। বিশেষতঃ নামদারের সঙ্গে তার একটা বিভ্রান্তিকর জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সুকুমার সেন অনুমান করেন [দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সং, পৃঃ ১০৩] যে, নামদার হচ্ছে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। যদিও তিনি এই অনুমানের কোন কারণ দেখাননি। গোলাম হোসেন ও নামদার সম্পর্ক মোটেই পরিষ্কার নয়। যদি গোলাম হোসেন পৃথক ব্যক্তি হন তা হলে বলতে হয় যে, নামদারের রচনা থেকে তিনি তাঁর লেখা চুরি করেছেন। তদুপরি তাদের রচনা প্রকাশের সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না বলে আরও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

[৫] শেখ আজিমুদ্দিনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে', ১৮৬৯, লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

[৬] বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় রচনা 'মৃণালিনী' এবং মশাররফ হোসেনের রত্নবতী' একই বৎসরে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

[৭] উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী হচ্ছে ঃ

(ক) রাস সুন্দরী দাসী, আমার জীবন, ১৮৬৮

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বরচিত বিদ্যাসাগর চরিত, ১৮৯১

(গ) কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, আমার জীবন চরিত, ১৮৯৬

(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মচরিত, ১৮৯৮

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', সোমেন বসু, কোলকাতা, ১৯৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন-কথা

মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এক কীর্তিমান পুরুষ। তাঁর জন্ম হয় ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে।[১] মশাররফ হোসেনের জীবনের যাবতীয় তথ্যের উৎস হলো তাঁর স্বরচিত আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর রচিত তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবনী 'বিবি কুলসুম' এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন বাঙলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির কাহিনী।

মীর মশাররফ হোসেনের পিতার নাম মীর মোয়াজ্জম হোসেন। আর মায়ের নাম দৌলতন্নেসা। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা-পিতামহের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল।

মীর মশাররফের এক পূর্বপুরুষ তাপস সৈয়দ সাদুল্লা বাগদাদ থেকে বাংলা দেশে এসেছিলেন প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে। (এ সময় দিয়েছেন মশাররফ তাঁর 'আমার জীবনী' গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯০৮-১০)। তিনি ফরিদপুর জেলার সেকাড়া গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি এসেছিলেন তাঁর নিখোঁজ পিতার খোঁজে। কিন্তু তিনি তাঁর পিতাকে পেয়েছিলেন কিনা সে কথা জানা যায়নি। সাদুল্লার পীর-পুত্র শাহ পাহ্‌লওয়ান থাকতেন সেই সেকাড়া গ্রামে। সাদুল্লা শাহ পাহ্‌লওয়ানের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন আর তাঁরই এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

সাদুল্লার চারি পুত্র, কিন্তু মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে এদের কারো নাম উল্লেখ করেননি। যা হোক সাদুল্লার এক পৌত্রের নাম পাওয়া যায়; সে হচ্ছে মীর কুতুবউল্লা। এখানে মীর মশাররফ এক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে সাদুল্লা তাঁর চার ছেলেকে বলেছিলেন যে,

তাঁর কবর যেন পূর্ব-পশ্চিমে খনন করা হয়। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মুসলমানদের কবর উত্তর-দক্ষিণে হয়ে থাকে। সাদুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা প্রচলিত পদ্ধতিতেই তাঁর কবর দেন। ঐ রাত্রেই সাদুল্লার ছেলেরা স্বপ্ন দেখে যে, তাঁদের পিতা তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে কবরটিকে পূর্ব-পশ্চিম দিকে করে ফেলেছেন। সাদুল্লা তাঁর ছেলেদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের অভিশাপ দেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কেউ কোনদিন ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত হতে পারবে না, আর জীবিত অবস্থায় তাঁর বংশধরেরা কোমরের বেদনায় কষ্ট পাবে।

সাদুল্লা নিজেকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধর মনে করতেন। আর সাদুল্লার উপাধি ছিল মীর, এটি কোন নবাব বা সুলতান তাঁকে দিয়ে থাকবেন।[২]

মীর মশাররফ রচিত আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' অবলম্বনে তাঁর বংশ-তালিকা তৈরী করা হলো।
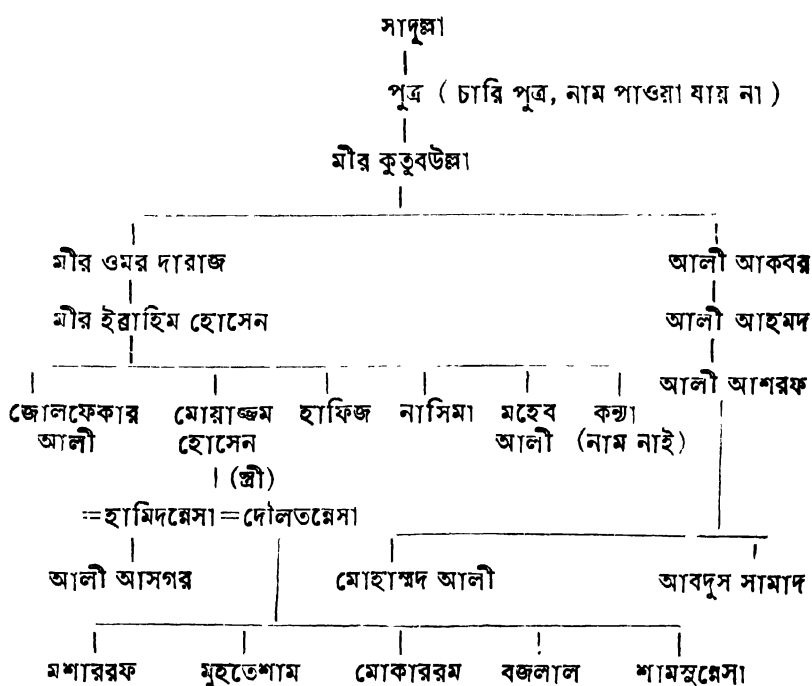
মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর পিতামহ ইব্রাহিম হোসেনের জীবন-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যৌবনে ইব্রাহিম সুপুরুষ ছিলেন। বিদ্যা

শিক্ষায় তাঁর উৎসাহ মোটেই ছিল না, তাঁর আগ্রহ ছিল কুস্তি, লাঠি খেলা, শিকার ইত্যাদিতে। এতে ইব্রাহিমের পিতা ওমর দারাজ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং ছেলের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। একদিন ইব্রাহিম হোসেনের মা ভাতের পরিবর্তে বাসনে কিছুটা ছাই রেখে দেন। ভাত খেতে এসে ইব্রাহিম এ দৃশ্য দেখে এতই মর্মাহত হন যে, সেই রাত্রিতেই গোপনে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এরপর ইব্রাহিমের জীবনে ভাগ্য পরিবর্তনের নাটকীয় সূচনা হয়।

ইব্রাহিম স্থির করলেন, তিনি মুর্শিদাবাদ যাবেন। সে যুগে মুর্শিদাবাদ ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ। পথে সাঁওতা গ্রামের বৃদ্ধা জমিদার আনার খাতুনের গৃহে রাত্রিযাপন করেন ইব্রাহিম। আনার খাতুনের সঙ্গে ইব্রাহিমের পিতার আত্মীয়তা ছিল। এই পরিচয় পেয়ে আনার খাতুন ইব্রাহিমকে তাঁর বাড়ীতে রেখে দেন। মৃত্যুর পূর্বে আনার খাতুন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইব্রাহিমকে দিয়ে যান। কিন্তু আনার খাতুনের সম্পর্কীয় ভ্রাতারা এসে জোর করে ইব্রাহিমকে আনার খাতুনের বাড়ী থেকে বের করে দেয়। যশোরে চলে গেলেন ইব্রাহিম হোসেন। সেখানে এক সহৃদয়া মহিলা তাঁকে আবার আশ্রয় দেন। যশোরে থাকাকালীন ইব্রাহিম যশোর জেল থেকে পলাতক কয়েকজন কয়েদীকে গ্রেফতারে পুলিশকে সহায়তা করেন। এতে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুব খুশী হয়ে তাঁকে প্রথমে দু'শো টাকা, পরে একটি চাকুরীও দেন। কিন্তু ইব্রাহিম কোন কিছু পুরস্কার গ্রহণ করলেন না। তিনি নিজের জীবনের কাহিনী তাঁকে বললেন। কিভাবে তিনি তাঁর সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছেন সে কথা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইব্রাহিমের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন। এরপর ইব্রাহিম ফিরে গেলেন তাঁর পৈত্রিক বাড়ীতে। সেখানে তিনি বিয়ে করেন এবং তাঁর দুই পুত্র এবং দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিছুকাল পরে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইব্রাহিম আবার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইব্রাহিম ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যান। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেব আলীকে লাহিনীপাড়ায় একটি আলাদা বাড়ীও তৈরী করে দিয়ে যান।

ইব্রাহিমের বড় ছেলে জোলফেকার আলী এক কন্যাসন্তান রেখে মারা যান। এই কন্যাটিকে লালন-পালন করেন ইব্রাহিমের দ্বিতীয় ছেলে

মোয়াজ্জম হোসেন। কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শাহ্ গোলাম আজম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। এই গোলাম আজম পরে তার চাচাশ্বশুর মোয়াজ্জম হোসেনকে তাঁর পৈতৃক বাড়ী থেকে উৎখাত করেন। মোয়াজ্জম হোসেন যখন তাঁর বোনের বাড়ীতে যান ঐ সময় গোলাম আজম ইব্রাহিম হোসেনের উইল জাল করে মোয়াজ্জম হোসেনের বাড়ী-ঘর দখল করে নেয়।[৩]

মীর মশাররফ হোসেনের পিতা হলেন মীর মোয়াজ্জম হোসেন। মোয়াজ্জম হোসেনের প্রথমা স্ত্রী হামিদন্নেসা একটি পুত্রসন্তান রেখে অল্প বয়সে মারা যান। পরে অবশ্য ঐ পুত্রও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৩৬-এর প্রথমে মোয়াজ্জম হোসেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন মুন্সী জিনাতুল্লা নামক জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যাকে। জিনাতুল্লা ছিলেন রংপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্লার্ক। ইনি প্রথম দিকে নদীয়া জেলার কাসিমপুর গ্রামে থাকতেন। পরে ইনি লাহিনীপাড়া গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। মাঝখানে মোয়াজ্জম হোসেন জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের পর আবার তিনি সংসারে মনোযোগ দেন।

লাহিনীপাড়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে গৌরী নদী। এই গৌরী নদীর উৎপত্তির কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন মশাররফ তাঁর জীবনী-গ্রন্থে। এই কাহিনীর উৎস হলো কিংবদন্তী। এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাপূজার জন্য বাড়ী থেকে বের হয়। গঙ্গাকে স্তব করবার জন্য গৌরীদাসী কিছু ফুল দিয়েছিল। গঙ্গাপূজা করে ফিরে আসার সময় ঐ ব্রাহ্মণের মনে হলো যে, গৌরীদাসীর দেওয়া ফুল গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করা হয়নি। ব্রাহ্মণ আবার রওয়ানা হলো গঙ্গার দিকে। পথে একটা গোষ্পদে সামান্য কিছু জল ছিল। ব্রাহ্মণ ঐ জলে নিক্ষেপ করলেন ঐ ফুলগুলি। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গঙ্গাদেবী আবির্ভূত হলেন। গঙ্গাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ দেখলেন, এ যে তারই বাড়ীর গৌরীদাসী। মুহূর্তে দেবী অদৃশ্য হলেন। ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন ঘরে। এসেই গৌরীদাসীর পায়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীদাসীও পালিয়ে গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে। ব্রাহ্মণ গৌরীদাসীর পিছু নিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ তার নাগাল পেল না। গৌরীদাসীর পেছনে পেছনে জলধারা উত্থিত হলো। শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল গৌরী। এমনি করেই এক নদীর সৃষ্টি হলো। সেই নদীরই নাম গৌরী নদী। মশাররফ হোসেন তাঁর জীবনীতে এ কথা

উল্লেখ করেছেন যে, গৌরী নদীর জল অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম করেছে। কোলকাতা থেকে গৌরী নদীর জল আনিয়ে পান করতেন মীর মশাররফ।

এই গৌরী নদীর তীরেই লাহিনীপাড়া গ্রাম। এই লাহিনীপাড়া গ্রামেই জিনাতুল্লার বাড়ী। মাতামহ জিনাতুল্লার বাড়ীতেই মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। জিনাতুল্লা চাকরী করতেন তখন রংপুরে। খবর নিয়ে গেল এক সংবাদবাহক। জিনাতুল্লা খুব খুশী হয়ে তাকে অনেক বখশীস দিলেন। মাতামহের বাড়ীতেই মশাররফ হোসেন মানুষ হতে থাকেন। সে বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন শিশু ছিল না—সে কারণেই বাল্যে মশাররফ অনেকটা আদরে প্রশ্রয়ে মানুষ হতে থাকেন। মশাররফের পিতা সময়ে সময়ে তাঁকে শাসনও করেছেন।

মশাররফের বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন, তখন তাঁর 'হাতে খড়ি' আরম্ভ হয়। তখনকার দিনে এই বয়সেই আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুদের লেখাপড়া আরম্ভ করা হতো। মশাররফের 'হাতে খড়ি' বা 'তাক্তি' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুন্সী জমিরুদ্দিন। এই জমিরুদ্দিন মশাররফের পিতারও 'হাতে খড়ি' দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং মিষ্টি ও বাতাসা বিতরণ করা হয়। মশাররফকে আরবী-ফার্সিতে প্রথম পাঠ দেওয়া হয়। মুসলমানদের পরিবারে লেখাপড়া সে যুগে আরবী-ফার্সি দিয়েই শুরু হতো। মুন্সী হেরাসতুল্লা নামে একজন শিক্ষক মশাররফকে আরবী-ফার্সি পড়াতেন। পরে অবশ্য জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংলা পড়াশুনা শুরু হয়। জয়নাবাদ গ্রামে ছিল নন্দী মশায়ের পাঠশালা। মশাররফের পিতার অনুরোধে নন্দী মশায় পাঠশালা তুলে নিয়ে আসেন লাহিনীপাড়ায়।

পাশেই ছিল শালঘর মধুয়া গ্রাম। সেখানে নীলকর কেনী সাহেবের কুঠি ছিল। কেনী সাহেবের সঙ্গে মশাররফের বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। কেনী সাহেব বালক মশাররফকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মেয়েদের সঙ্গে তিনি মশাররফকে বিলেতে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মশাররফ বিলেতে যাবে এবং (ভারতীয়) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু মশাররফের মাতামহীর প্রবল বিরোধিতার জন্য মশাররফের বিলেতে যাওয়া ঘটেনি। ঘটলে হয়তো মীর মশাররফের জীবনের ধারাই অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো। মশাররফের মাতামহীর ধারণা ছিল যে, মশাররফ বিলেতে গেলে খ্রীস্টান হয়ে যাবে এবং মেম বিয়ে করবে ইত্যাদি। এই ধারণা অবশ্য সে যুগের একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। যা হোক পরবর্তী-

কালে যে মশাররফ হোসেনের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন এ কথাও সত্য।

এই সময় মশাররফের ছোট বোনের বিয়ের কথা হয়। তখন মশাররফের বয়স তের কি চৌদ্দ। পাবনা জেলার কালেক্টরেটের কেরানী নাদের হোসেনের এক ছেলের সঙ্গে মশাররফের নবম বর্ষীয়া ভগ্নীর বিবাহের কথাবার্তা হয়। কিন্তু মশাররফের মায়ের আপত্তির জন্য এ বিয়ে হলো না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মেয়েটি এই প্রস্তাবের কিছুদিন পরেই অসুখে মারা যায়। এর কিছুকাল পরেই মশাররফের জীবনে নেমে এল এক চরম আঘাত। মশাররফ মাতৃহারা হলেন। আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে মশাররফ হোসেনের মাতৃবিয়োগ হয়। মশাররফ কিন্তু তাঁর মায়ের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করতে পারেননি। তাঁর সন্দেহের পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। মশাররফের বাবা রূপসী নামে এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঐ রূপসী গোপনে বাড়ীর দাসীদের প্রলোভন দেখিয়ে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয়। তার ফলে ছয় মাস ভুগে মশাররফের মা মৃত্যুমুখে পতিত হন।[8] মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বই-এ তাঁর বাবা এবং মায়ের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। মশাররফের পিতা গান-বাজনা ইত্যাদি নিয়ে মশগুল থাকতেন এবং স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি যে উদাসীন ছিলেন তার উল্লেখ মশাররফ হোসেনের একাধিক রচনায় পাওয়া যায়। অবশ্য এটা সে যুগের সমস্ত জমিদার শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দেখা যাবে।

মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল আগে তাঁদের বাড়ীতে যে চুরি হয়েছিল তার এক সুন্দর বর্ণনা দেন। আর এই সময় নীলকর কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধেও প্রজারা আন্দোলন করছিল। মশাররফের রচনায় তারও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৫] এই সময় একবার গৌরী নদীতে পুলিশের নৌকায় বাঙ্গালী মাঝিদের সঙ্গে অবাঙ্গালী (মাড়োয়ারী) ব্যবসায়ীদের ভীষণ ঝগড়া ও মারামারির উপক্রম হয়। যা হোক পুলিশের নৌকায় এক সাহেব ছিল। সে ঐ ঝগড়া থামিয়ে দু'দলকে শান্ত করে।

মশাররফ এই বয়সেই সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী হন এবং কবিতা তৈরির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতেন। 'আমার জীবনী'র ১৬৫ পৃষ্ঠায় এমনি একটি হেঁয়ালি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন মশাররফ হোসেন।

"কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা"

ইত্যাদি। উত্তর—কাঁঠাল।

বলা বাহুল্য এগুলি ধাঁধা বা হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতাংশ। দু'দলের মধ্যে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে যে প্রতিযোগিতা চলত—তাও মশাররফ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। একদল যে অক্ষর দিয়ে পদ শেষ করতো, অপর দলকে সে অক্ষর দিয়েই পদ রচনা আরম্ভ করতে হতো। এ লড়াইয়ে যে দল রচনায় অসমর্থ হতো সে-ই হেরে যেতো। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীর ষষ্ঠ খণ্ডে এমনি একটি কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন:

"সালামালেকুম ভাই। —হাজার সালাম।
তোমাদের ওস্তাদের বল কিবা নাম।
মনিরুদ্দি মুন্সীজিকে সকলেই চেনে।
বিদ্যার পাহাড় তিনি সর্বদেশে জানে।
নরুদ্দির সুফিজির দাড়ি সব পাকা
মেদী দিয়ে লাল করে লোকে দেয় ধোকা।
কামারের মার ফেলে, পাঁঠার ফেলে পা
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে বেছে বেছে খা।
খামার আমার নয় মামার মামিব
ডাঙ্গায় জামির ফলে পানিতে কুমীর।...
লাঠি বঁটি দাও খুন্তি খুরপাই কাঁচি
চাচা হল নিজ রক্ত পর হল চাচি।
চলিতে চলিতে ভেড়া ফিরাইল ঘাড়
পাল ছেড়ে দিল দৌড় দেখে কাল ষাঁড়।"

এখানে 'ড়' দিয়ে পদ শেষ হয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে 'ড়' বর্ণ নাই। এখানেই প্রতিপক্ষ পরাজিত হলেন। কেননা 'ড়' দিয়ে পদ তৈরী করা সম্ভব নয়।

মশাররফ তাই কবিতায় জবাব দিচ্ছেন:

"মাত করেছি 'ড'র বয়েতে
জিত আমাদের ভাই
হাজার খোঁজ হাজার ভাব
ড় এর বয়েত নাই।

সম্ভবতঃ এগুলি মশাররফ হোসেনেরই রচনা। এ ছাড়া সেকালে বহুল প্রচারিত পুথিসাহিত্যের প্রতিও মশাররফ অনুরক্ত ছিলেন। এসব পুথি, যেমন 'আমীর হামজা' এবং 'সোনাভান' সুর করে পাঠ করা হতো এবং শ্রোতারা আগ্রহভরে শুনতো।[৬]

মশাররফ তখন পনর-ষোল বছরের কিশোর। এই সময় মশাররফ তাঁর বাবার সঙ্গে ফরিদপুরের পদমদী গ্রামে নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর বাড়ীতে যান। নবাবের জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট দালান দেখে মশাররফ অবাক হয়ে যান। মশাররফ কিছুদিন এই নবাবের বাড়ীতে অবস্থান করেন। নবাব মোহাম্মদ আলী মশাররফের চাচাত ভাই। নবাবের বাড়ীতে মশাররফ সর্বপ্রথম বাইজী নাচ দেখেন। অবসর সময়ে নবাবের প্রিয় বাইজীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাস খেলার সঙ্গী হন মশাররফ। নবাব ছিলেন কুমার। বিবাহিত জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা থাকলেও নারী-সাহচর্যের আনন্দ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। একবার নবাব মোহাম্মদ আলী তাঁর ছোট ভাই-এর বিবাহ উপলক্ষে নৌকায় সিলেট যান। মশাররফও সেই নৌকায় ছিলেন এবং নবাবের এক বাইজীও সেই নৌকায় তাদের সঙ্গিনী ছিলেন।

পদমদীতে ফিরে আসার পর মশাররফের বাবা তাকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে যান। ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁরা কয়েকদিন ছিলেন। ঢাকায় মশাররফের বাবা টাকা ধার করে কিছু গয়না কিনেন। এতে মশাররফ একটু বিস্মিত হন। কেননা তখন মশাররফের মা জীবিত ছিলেন না এবং অলঙ্কার পরার মত তাঁর কোন বোনও বাড়ীতে ছিল না। মনে হয় মশাররফ তাঁর পিতার বিলাসপূর্ণ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সেকালের আর পাঁচজন জমিদারের মতই মশাররফের বাবা নৃত্য-সঙ্গীত চর্চায় ও উপভোগে সময় অতিবাহিত করতেন। ঢাকায় মশাররফ একজন স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ শিক্ষক ভদ্রলোক মশাররফকে সংস্কৃত নাটক 'কাদম্বরী'র বঙ্গানুবাদ উপহার দেন। ঐ শিক্ষকের কাছ থেকে একটি অভিধানও মশাররফ সংগ্রহ করেন এবং অভিধান ব্যবহারও শেখেন।

ঢাকা থেকে মশাররফ ও তাঁর পিতা নৌকা করে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন। নৌকায় আসবার সময় তীরে একটি বাঘ দেখতে পান মশাররফ। আসলে ঐ বাঘটি নদীর পাড়ে পাড়ে মশাররফদের নৌকাটি অনুসরণ করছিল। সুযোগ পেলেই বাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়ত। যা হোক, মাঝি চালাকি করে নৌকাটি নদীর মাঝখানে চালিয়ে নিয়ে যায়। মশাররফ ও তাঁর বাবা ঠিক মতই বাড়ী এসে পৌঁছলেন। কিছুদিন পরেই মশাররফের বাবা সিরাজগঞ্জে বেড়াতে যান। পদমদী থেকে বৈমাত্রেয় মাতামহী বেড়াতে আসেন। এই মাতামহী মশাররফকে দেখাশুনা করতেন।

এই সময় কুষ্টিয়ায় ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। কুষ্টিয়া থেকে কোলকাতা পর্যন্ত রেল লাইন বসানো হচ্ছিল, আর কুষ্টিয়াতে নতুন মহকুমা শহর প্রতিষ্ঠিত হলো।

মশাররফকে গল্পচ্ছলে নানা রকম নীতিমূলক উপদেশ দিতেন তাঁর মাতা-মহী। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল মশাররফের জীবনে একটা সংকটকাল-রূপে দেখা দেয়। বিলাসিতাকে পরিহার করার জন্য মশাররফকে বার বার সতর্ক করে দেন তাঁর মাতামহী। মশাররফকে এই সময় কুষ্টিয়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে সমবয়সী ছেলেদের পাল্লায় পড়ে মশাররফ বাড়ী থেকে পালিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন। পথে এক ভণ্ড সাধু মশাররফ ও তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে সব টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে। কাজেই হেঁটে হেঁটে মশাররফরা কোলকাতা পৌঁছল। মশাররফ তাঁব বন্ধুর চাচার বাসায় ক'দিন থাকে। ঐ ভদ্রলোক মশাররফ ও তাঁর বন্ধুকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য ভাড়ার টাকা দিলেন। টাকা পেয়ে দুই বন্ধু বাড়ী ফিরে আসে। এই ঘটনায় মশাররফের বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন আর তাঁর মাতামহীও খুব মর্মাহত হন।

এ সমস্ত ঘটনার পরে মশাররফের বাবা মশাররফকে পদমদীর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। কিন্তু সেখানেও তার পড়াশুনার বিশেষ উন্নতি হলো না। নবাব মোহাম্মদ আলীর বাড়ীর কাছেই মশাররফ থাকতেন, এবং সুযোগ পেলেই নবাবের বাড়ীতে গিয়ে সময় কাটাতেন। মশাররফের বাবার কাছে এইসব খবর আসতো। ছেলে সম্বন্ধে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পদমদী থেকে তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলেন বাড়ীতে। তারপর মশাররফকে পাঠানো হলো কৃষ্ণনগর। সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে

দেওয়া হলো। সে যুগে কৃষ্ণনগর জ্ঞান-চর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। মূলতঃ কৃষ্ণনগর হিন্দুপ্রধান শহর ছিল, যদিও বেশ কিছু মুসলমান অধিবাসীও সেখানে ছিল। এখানে এসেই মশাররফ প্রথমবারের মত হিন্দু-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণনগরেও বেশী দিন থাকতে পারলেন না। বছরখানেকের মধ্যেই কয়েক বন্ধু মিলে কোলকাতা গেলেন।

কোলকাতায় মশাররফ তাঁর আর এক বন্ধুর সাক্ষাৎ পান। ঐ বন্ধুর পিতার নাম নাদের হোসেন। তিনি ঐ সময় চব্বিশ পরগণা জেলার আলিপুরে আমিন ছিলেন। নাদের হোসেন বালক মশাররফকে তাঁর কোলকাতা চেতলার বাসায় থেকে পড়াশুনা করবার জন্য বলেন। নাদের হোসেন মশাররফের বাবা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন। এই নাদের হোসেনের এক ছেলের সঙ্গে মশাররফের ভগ্নীর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যাহোক মশাররফ কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে পড়াশুনায় মন দেন। গরমের ছুটিতে মশাররফ গ্রামে ফিরে এলেন। বাড়ীর সবাই মশাররফের চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেল। হিন্দু ভদ্রলোকদের মত তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর কথাবার্তাও কৃষ্ণনাগরিক। মশাররফের এবম্বিধ পরিবর্তনে তাঁর বাবা খুশী হয়েছিলেন।

ছুটি শেষ হয়ে গেলে মশাররফের বাবা তাঁকে কোলকাতা যেতে দিলেন। মশাররফ নাদের হোসেনের বাসায় যেয়ে উঠলেন। নাদের হোসেন দুই বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রী কোলকাতা থাকতেন আর এক স্ত্রী ও তাঁর দুই কন্যা থাকতেন যশোরের মোক্তারপুর গ্রামে। নাদের হোসেনের ভৃত্য যাদুর কাছে মশাররফ নাদের হোসেনের প্রথমা কন্যার রূপগুণের বিবরণ শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যাদু আরও বলে যে, মশাররফকে বড় চাকুরী নিয়ে দেবে নাদের হোসেন। স্কুলে ভর্তি হওয়া বা পড়াশূনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু হলো না মশাররফের। গোপনে বিয়ে স্থির হয়ে গেল মশাররফের। মশাররফ চলে এলেন মোক্তারপুর গ্রামে। সেখানে নাদের হোসেনের বড় মেয়ে লতিফুন্নেসার সঙ্গে মশাররফ চিঠিপত্র লেখালেখি করেন। এর মধ্যে নাদের হোসেনের অপর মেয়ে আজিজুন্নেসারও বিয়ে ঠিক হয়। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মে, শুক্রবার নাদের হোসেনের দুই মেয়ের বিয়ে একই দিনে হবে ঠিক হলো।

বিবাহ মজলিসে মশাররফ ও অপর বর হোসেন আলী বসে আছে। এমন সময় মোল্লা এল বিয়ে পড়াতে। প্রথমে হোসেন আলীর বিয়ে পড়ানো

হলো। মশাররফ তখন অন্যমনস্ক ছিল। মশাররফ ভাবছিল তাঁর বাবা বা অন্য কাউকে না জানিয়ে এভাবে বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে কিনা। মশাররফ হঠাৎ বড় মেয়ের নাম উচ্চারিত হতে শুনলো। এরপরে যখন মৌলভী সাহেব মশাররফের কাছে এল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়ে, তখন কন্যার নাম উচ্চারিত হলো আজিজুন্নেসা। মশাররফ শোনা মাত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরে পেল মশাররফ, তখন দেখল সে এক সুসজ্জিত কক্ষে বিরাট পালঙ্কে শায়িত। মশাররফকে সবাই তখন ছোট জামাই বলে সম্বোধন করছে। মশাররফ তার স্ত্রীকে দেখে মোটেই খুশী হতে পারেনি। আজিজুন্নেসা ছিল বুদ্ধিহীনা এবং দেখতেও তেমন সুশ্রী ছিল না। এমনি ঘটনার জন্য লতিফুন্নেসাও প্রস্তুত ছিল না। লতিফুন্নেসা অত্যন্ত মর্মাহত হয় এবং তার হিস্টিরিয়া রোগ দেখা দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে লতিফুন্নেসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মশাররফও শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে যান।

তারপর মশাররফ ফিরে এলেন গ্রামে, লাহিনীপাড়ায়। পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। লেখাপড়ার ইতি এখানেই। সম্ভবতঃ তাঁর বাবাও মারা গেছেন এর মধ্যে। ঘোড়ায় চড়ে মশাররফ জমিজমা দেখাশোনা করতেন। এর মধ্যে অনেকদিন চলে গেছে। একদিন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন সাঁওতা গ্রামের মধ্যে দিয়ে। পথে ক্রীড়ারত একটি সুশ্রী বালিকাকে দেখতে পান। তার নাম ছিল 'কালী' বা কুলসুম।

পরে একদিন চৈত্রের দুপুরে সাঁওতা গ্রামে আগুন লাগে। ঘটনাক্রমে মশাররফ তখন সেখানে। সে আগুন দেখে ভয়ে পালিয়ে এসে কালী মশাররফের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ মেয়েকেই মশাররফ দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। বিয়ের পর ঐ মেয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে কুলসুম হয়। কুলসুমের মায়ের নাম ছিল লালন আর তার বাবার নাম ছিল সদরুদ্দীন। মশাররফের পীর হযরত শাহ্ ওবায়দুল হক 'কালী' নাম পরিবর্তন করে কুলসুম রেখেছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে মশাররফের দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এই বিয়েতে মশাররফের প্রথমা স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে কুলসুমকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে সে চক্রান্ত সফল হয়নি। মশাররফ দ্বিতীয়া স্ত্রী কুলসুমকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে বিবি কুলসুমের মৃত্যু হয়।

বিবি কুলসুম মীর মশাররফের জীবনের সমস্ত উন্নতির মূলে ছিল, এ কথা তিনি বহুবার বলেছেন। প্রথমা স্ত্রীকে যে তিনি ভালবাসতে পারেননি এবং

প্রথমা স্ত্রী যে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে কথাও তিনি বলেছেন। "কুলসুমকে নেকাহ করিবার পূর্বে আমি মানব সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্তই ছিলাম না। খুন করি নাই, ডাকাতি করি নাই, পরদ্রব্য অপহরণ করি নাই, পরস্ত্রী হরণ করি নাই। তবে করিয়াছি কি? আজিজান বিবি যে আমাকে জাবরাণে বাঁধিয়া ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন ...ছ'মাসে ন'মাসে ১২ মাস তাহার সহিত আমার দেখা হইত কিনা সন্দেহ। সংসারে টান ছিল না। সংসার থাক বা অধঃপাতে যাক সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। পাঁচ এয়ার লইয়া পঞ্চ 'ম'কারের সেবা করিতে পারিলেই হইল। পঞ্চ মকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়া পাঁচ এয়ারের মন যোগাইতে পারিলেই জীবন জুড়াইল। ...এইত ছিল আমার অবস্থা। ঈশ্বর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। দয়ার হস্ত বিস্তার করিলেন। বিবি কুলসুম আমার গৃহে আসিলেন। গৃহিণী হইলেন। তাহার প্রথম কার্যই হইল আমার মতিগতি ফিরান, আমাকে সৎপথে আনা, ভূত-প্রেত ছাড়ান। ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে? ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিল।"[৭]

মশাররফের সাহিত্য-জীবন শুরু হয় তাঁর দুই বিবাহের মধ্যবর্তী কালে। তার বাল্যরচনা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। কুমারখালির কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সঙ্গে মীর মশাররফের ঘনিষ্ঠতা ছিল। একবার ফিকিরচাঁদের দলের লোকেরা কাঙ্গালের বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চায় রত ছিল। মশাররফ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কাঙ্গালের অনুরোধে মশাররফ ফিকিরচাঁদের দলের জন্য একটি গান লেখেন—

"রবে না চিরদিন সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে
আমার আমার সব ফক্কিকার কেবল তোমার নামটি রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ সোনার অঙ্গ ধূলায় গড়াগড়ি যাবে,
সংসারের মিছে বাজি ভোজের বাজি সব কারসাজি ফুরাইবে,
মরি এক পলকে তিন ঝলকে সকল আশা মিটে যাবে,
তোমার এই আত্ম-স্বজন ভাই পরিজন হায় হায় করি কাঁদবে সবে,
তারা পেয়ে ব্যথা ভাঙ্গবে মাথা তুমি কথা না কহিবে
তোমার এই টাকাকড়ি ঘর বাড়ী ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে
আবার হাত থাকিতে পা রহিতে পরের কাঁধে যেতে হবে
চিরকাল করে হেলা গেল বেলা এখন সন্ধ্যার বেলায় আর কি হবে,
জগতের কারণ যিনি—দয়ার খনি তিনি 'মশার' ভরসা ভবে।"[৮]

মশাররফ 'মশা' এই ছদ্মনামে লিখতেন। শৈশব থেকেই মশাররফ কাব্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তাছাড়া স বাদপত্রের সঙ্গে মশাররফ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর'[৯] আর কুমারখালি থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'[১০] পত্রিকা দুটিতে মশাররফ মফঃস্বল সংবাদ লিখে পাঠাতেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশাররফকে তাঁর লেখায় উৎসাহ দিতেন। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র কোন এক সংখ্যায় একটি মজার চিঠি ছাপা হয়েছিল। মশাররফ নাকি অন্যের লেখা একটি কবিতা নকল করেছেন এমনি অভিযোগ করা হয়েছিল। আসলে মশাররফের এক বন্ধু একটি কবিতা লিখে এনে মশাররফকে দেখায় এবং সে বন্ধুটি মশাররফকে বলে যে, সে চায় এ কবিতাটি মশাররফের নামে ছাপা হোক। মশাররফ তখন সে কবিতার নীচে নিজের নামটি লিখে দেন। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় উক্ত কবিতাটি ছাপা হলে বরিশাল থেকে জনৈক পাঠক প্রতিবাদ করেন যে, উক্ত কবিতাটি অন্যের লেখা কবিতা এবং তা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। মশাররফ তখন মর্মাহত হন এবং পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে লিখেন।[১১]

মশাররফের প্রথম পুস্তক 'রত্নবতী' ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি তাঁর পীর (ওবেদাল হক) পড়েছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা লাভ করেছিল। মশাররফের পরবর্তী বই 'গোরাই ব্রিজ' বা 'গৌরি সেতু' ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বা ১৮৭৩-এর প্রথম দিকে ছাপা হয়। এ পুস্তক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন, "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।"[১২] এর পরের বছর মশাররফের দুটি নাটক প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হলো 'বসন্তকুমারী নাটক', আর একটি হলো 'জমিদার দর্পণ'। 'জমিদার দর্পণ' নাটকটিও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করেছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'আজিজন নেহার' নামে একটি পত্রিকা মশাররফ হোসেন সম্পাদনা করেছিলেন এমন একটি সংবাদ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন।[১৩] কিন্তু এই পত্রিকার কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটি হুগলী থেকে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে মশাররফের একটি প্রহসন 'এর উপায় কি'[১৪] প্রকাশিত হয়। এই বইটি সম্পর্কে একটি বিরূপ সমালোচনা ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় ছাপা হয়।[১৫] এরপর মশাররফের

সাহিত্য রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মশাররফ টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে করিমুন্নেসার জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবি কুলসুমও ছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সম্পর্কে আর কোন খবর পাওয়া যায় না। এই দেলদুয়ারে অবস্থানকালেই মশাররফ 'বিষাদ সিন্ধু' নামক তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এর বছর দুই পরে 'বিষাদ সিন্ধু'র দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। একই বছরে মশাররফের 'সঙ্গীত লহরী' প্রকাশিত হয়: এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে 'গো-জীবন' নামক মশাররফের একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হলে গোঁড়া মুসলমান সমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।[১৬] মশাররফ গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য মুসলমানদের নিকট আবেদন করেন।

'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা মশাররফ সম্পাদনা করেছিলেন এমন সংবাদ পাওয়া যায়।[১৭] এই পত্রিকাটি প্রথমে লাহিনীপাড়া, পরে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয়। এই সময় 'বেহুলা গীতাভিনয়' নামক একটি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। এরপর 'উদাসীন পথিক' ছদ্মনামে মশাররফ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়, এবং এর পরের বছর 'বিষাদ সিন্ধু'র তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। তারপর বহুদিন আর মশাররফ কিছু লেখেননি। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। সম্ভবতঃ এই সময় তিনি দেলদুয়ারের চাকরী ছেড়ে দেন। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' থেকে জানা যায় যে, মশাররফের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত হয়েছিল এবং তার ফলে তাঁকে কিছুদিন হাজতে থাকতে হয়। পরিশেষে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই বইটি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এতে মুসলমান জমিদারদের জীবনচিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। এই পুস্তকের শেষে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে, মশাররফ আরও চারটি উপন্যাস[১৮] শীঘ্রই প্রকাশ করবেন। কিন্তু এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বইগুলির নাম হচ্ছেঃ (ক) 'রাজিয়া খাতুন', (খ) 'তহমিনা',[১৯] (গ) 'বাঁধা খাতা', (ঘ) 'নিয়তি কি অবনতি'।[২০] এই পুস্তকগুলি ছাড়াও চারটি প্রহসন এবং দুটি কবিতা-পুস্তক মশাররফ রচনা করেছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়।[২১]

এরপর মশাররফ কাব্যগ্রন্থ রচনায় উৎসাহী হন। তিনি বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন। ১৯০০

খ্রীস্টাব্দে তাঁর গদ্যে পদ্যে রচিত 'মৌলুদ শরীফ' প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকটি সে যুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কয়েক বছরের মধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থের নাম 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা'। পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে তাঁর ছয়খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'হজরত আমির হামজার ধর্মজীবন লাভ', 'হজরত বেলালের জীবনী ও উপদেশমালা' প্রকাশিত হয়। পরের বছর 'মদিনা গৌরব' প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে 'মোসলেম বীরত্ব' প্রকাশিত হয় এবং পরের বছর প্রকাশিত হয় ইসলামের ইতিমূলক গ্রন্থ 'এসলামের জয়'। একই বছরে বের হয় 'বাজিমাত'। এটি কাব্যাকারে রচিত একটি ব্যঙ্গরচনা। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের দিকেই তাঁর আত্মজীবনীর কয়েক খণ্ড ছাপা হয়। দু'বছরের মধ্যে তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবনী" ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা' ২য় ভাগ এবং 'খোতবা' প্রকাশিত হয়। 'আমার জীবনী'তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, মশাররফ 'হজরত ইউসোফ' নামক একটি পুস্তকের রচনা সমাপ্ত করেছেন এবং তা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। মশাররফের সর্বশেষ গ্রন্থ 'বিবি কুলসুম' ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এটি রচিত ও মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া আরও তিনটি পুস্তক মশাররফ লিখেছিলেন এ রকম খবর পাওয়া যায়।[২২] যদিও এই বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে[২৩] মশাররফের দ্বিতীয় স্ত্রী এমন উক্তি করেছেন, "বই এর নাম দিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, বই কৈ?" মশাররফ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪]

মশাররফ কখন দেলদুয়ার ছেড়ে চলে যান তার সঠিক তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না। অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি দেলদুয়ার ছেড়ে যান। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অষ্টম সন্তান টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেছে এমন কথা তিনি 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে বলেছেন। দশম ও একাদশ সন্তানদ্বয় লাহিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এদের জন্ম-তারিখ তিনি দেননি। নবম সন্তান ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে সে স্থানের নাম পাওয়া যায় না। অনুমান করা যেতে পারে যে, মশাররফের নবম সন্তানও টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করে। তা হলে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মশাররফ টাঙ্গাইলে ছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। আরও

একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, মশাররফ বলেছেন 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' (১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) ছাপা হওয়ার আগে পাঁচ বছর ছাপাখানায় পড়ে ছিল। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে মশাররফের টাঙ্গাইলে প্রবাস জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতেও অনুমান করা যায়, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে টাঙ্গাইলে বসে তিনি বইটি লিখেন। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে যে ভোলানাথ নামে হাকিমের কথা বলা হয়েছে, খুব সম্ভবতঃ তিনি টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিম শিবচন্দ্র নাগ। তিনি ১৮৯২ থেকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টাঙ্গাইলের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'ভোলানাথ' আর 'শিব' একই অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে বর্ণিত ভোলানাথ আর শিবচন্দ্র নাগ একই ব্যক্তি। এ সব থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মশাররফ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টাঙ্গাইলে ছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকাতে মশাররফ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে সমালোচনা করাতে মশাররফের উপর উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বিরূপ হন, এমন কথাও শোনা যায়।[২৫]

টাঙ্গাইল ছেড়ে মশাররফ সম্ভবতঃ তাঁর স্ব-গ্রাম লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'র ভূমিকায় মশাররফ বলেছেন যে, তিনি বগুড়ায় ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশী দিন ছিলেন বলে মনে হয় না। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে দেখা যায় যে, মশাররফ সপরিবারে ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোলকাতায় বসবাস করেছেন।[২৬] কিন্তু তিনি কী চাকরী করতেন তা বলেননি। The Statesman and Friend of India পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, মশাররফ অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।[২৭] এ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না।

মশাররফের সন্তান-সন্ততি হচ্ছে এগারটি। সব সন্তানই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। এ ব্যাপারে মশাররফ একেবারেই নীরব। দেলদুয়ার যাওয়ার পর প্রথমা স্ত্রীর কী হলো, কোথায় থাকলো, সে সম্পর্কে মশাররফ কোথাও কিছু বলেননি। মশাররফের সন্তানদের মধ্যে পাঁচজনই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[২৮]

মশাররফের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবি কুলসুম ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। পদমদীতে (ফরিদপুর) মশাররফ তাঁর জীবনের শেষ

ছয় বছর কাটান। পদমদীতে নবাব মোহাম্মদ আলীর জমিদারীতে তিনি চাকরী করতেন।

বিবি কুলসুমের সমাধিসৌধে মশাররফ একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন :

"জীবনের নিয়োজিত কার্য শেষ করি
দয়ামায়া ভালবাসা স্নেহ পরিহরি।
বসন ভূষণ ধন আত্মীয় স্বজন,
লালসা বাসনা ভোগ করি বিসর্জন
স্বামী সোহাগিনী বিবি কুলসুম হেথায়
সমাধি শয্যায় রয় অনন্ত নিদ্রায়
পঞ্চ পুত্র এক কন্যা রাখি প্রাণপতি
জগৎ ছাড়িয়ে স্বর্গে করিতে বসতি।
তেরশত ষোল সাল ছাব্বিশে অঘ্রাণ
রবিবার প্রাতে প্রাণ করিল প্রয়াণ।
পতিগত প্রাণধনী পতিসহ আসি
পদমদীর মৃত্তিকায় রহিলেন মিশি।
ভাই ভগ্নি যেই হও ক্ষণেক দাঁড়াও
আত্মার কল্যাণে তার আশিষিয়ে যাও।"

বিবি কুলসুমের মৃত্যুর পর মশাররফ আর বিশেষ কিছু লিখেননি। স্ত্রীর মৃত্যুতে মশাররফ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তিনিও অনন্ত পথের যাত্রী হন।[২৯] তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণও শ্রদ্ধার সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেনের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩০]

তথ্য নির্দেশ

১ সঠিক তারিখ সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে, ২৯ নম্বর পুস্তকের

(চতুর্থ সংস্করণ) ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, মশাররফের জন্ম-তারিখ ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭। বলা হয়েছে যে, এ তারিখটি অক্টোবর ১৯০৩-এর এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত মশাররফ-এর পিতার জীবনী থেকে হিসাব করে বের করা হয়েছে। মশাররফ তাঁর 'আমার জীবনী'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, তিনি বিগত ৬৫ বৎসরের জীবন-কথা বর্ণনা করবেন। পুস্তকটি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়—সে হিসাবে তাঁর জন্ম-সন হচ্ছে ১৮৪৩। আবার উক্ত 'আমার জীবনী' গ্রন্থের ৩০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে মশাররফের বিয়ের সময় তিনি প্রায় বিশ বৎসরের যুবক। এ থেকে তাঁর জন্ম-সন হয় ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ। উক্ত গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় মশাররফ তাঁর মায়ের বিয়ের তারিখ দিচ্ছেন ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর বা ১৮৪৬ এর জানুয়ারী। এ থেকেও বলা যায়, ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগে তাঁর জন্ম হয়নি।

২ 'মীর' শব্দের অর্থ রাজপুত্র, শাসনকর্তা, দলপতি ইত্যাদি হতে পারে। (*Persian English Dictionary*, F. Steingass, p. 1360)। মীর শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলমান সাধু তপস্বীদের 'মীর' বলা হয়ে থাকে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কন্যা ফাতেমার বংশধরদের 'সৈয়দ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই সৈয়দদেরও মীর বলা হয়ে থাকে। (*A Dictionary of Islam*, T. P. Hughes, p. 350)।

মশাররফ লিখেছেন ('আমার জীবনী', পৃষ্ঠা ৮) যে, সাদুল্লা কোন রাজা বা সুলতান কর্তৃক 'মীর' উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু মশাররফ রাজার নাম উল্লেখ করেননি।

৩ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে (পৃঃ ১২৯-৩৩)।

৪ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে (পৃঃ ১৭০, ১৭৭, ১৮৫)।

৫ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে নীলকর কেনী সাহেবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৬ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান লেখকেরা এক ধরনের মিশ্র ভাষায় কাব্য-কাহিনী রচনা করতেন। বিষয়বস্তু হতো ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম জীবন এবং কিংবদন্তী। এ সমস্ত পুথির ভাষায় হিন্দী, উর্দু,

পারসী, আরবী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করা হতো। সাম্প্রতিক কালে এগুলোকে 'দোভাষী পুথি' বলা হয়ে থাকে। পুথি-সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক হলেন সৈয়দ হামজা, গরীবুল্লাহ। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: Q. A. Mannan, *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengali*, Dacca, 1967.

[৭] 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ৫৫-৫৬।

[৮] জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, কোলকাতা, ১৯১৭, পৃঃ ৪০-৪১।

[৯] 'সংবাদ প্রভাকর', ২৯শে এপ্রিল, ১০ই মে, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫।

[১০] 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', অক্টোবর, ১৮৬৫।

[১১] 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', আগস্ট, ১৮৬৫, পৃঃ ৬১।

[১২] 'বঙ্গদর্শন', পৌষ, ১২৮০, পৃঃ ৪৩১।

[১৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঙলা সাময়িক পত্র', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪।

[১৪] পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি সিকাগো শহরে এ পুস্তকের একটি কপি পাওয়া গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

[১৫] 'বান্ধব', সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঢাকা, আশ্বিন, ১২৮৩, পৃঃ ২২০।

[১৬] 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', কলিকাতা, কার্তিক, ১৩২৬, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২০২।

[১৭] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

[১৮] আবদুল লতিফ চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেন', সিলেট, ১৯৫২, পৃঃ ২৭।

[১৯] 'তহমিনা' গ্রন্থের মূল হচ্ছে ফেরদৌসির "শাহনামা"। কোলকাতার মাসিক পত্রিকা 'হাফেজে' এটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ২৩৬।

[২০] 'কোহিনুর' পত্রিকায় 'নিয়তি কি অবনতি'র কিয়দংশ ছাপা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: কাজী আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

[২১] (ক) 'টালা অভিনয়', (খ) ভাই ভাই এইতো চাই, (গ) ফঁস কাগজ, (ঘ) এ কি, (ঙ) পঞ্চ নারী (পদ্য), (চ) প্রেম পারিজাত। আবদুল লতিফ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮। 'টালা অভিনয়' 'হাফেজ' পত্রিকায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ, কাজী মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬।

[২২] পুস্তকত্রয়ের নাম: 'ইউসুফ জোলেখা', 'গাজী মিঁয়ার গুলি', 'হীরক খনি'। দ্রষ্টব্য: 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ঢাকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ২০।

[২৩] 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ১১১।

[২৪] কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', পৃঃ ২৪৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ২৯ নম্বর পুস্তিকা, 'মীর মশাররফ হোসেন', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৪৫।

[২৫] 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী', পাকিস্তান সংস্করণ, সম্পাদকের ভূমিকা।

[২৬] 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ৯।

[২৭] *The Statesman and Friend of India*, Calcutta, 31 May, 1885.

[২৮] মশাররফ তাঁর 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের ১১৩-১১৫ পৃষ্ঠায় একটি ইঙ্গ বার-বণিতার গর্ভে তাঁর এক অবৈধ সন্তানের জন্ম-কাহিনী বিবৃত করেছেন এবং এ ঘটনার জন্য উক্ত কামিনী তাঁকে ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করতে চেয়েছিল এমন কথাও মশাররফ লিখেছেন।

[২৯] 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় (১৯৫৮) ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এই তারিখ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ সংবাদের উৎস উল্লেখ করেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঠিক তারিখ দেননি, তিনি বলেছেন ১৩১৮ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ('সাহিত্য সাধক চরিত-মালা', ২য় খণ্ড, ২৯ নং পুস্তিকা, পৃঃ ৪৭)।

[৩০] কুমুদনাথ মল্লিক, 'নদীয়া কাহিনী', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৬। কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহের বিবরণ', ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৮৩।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক গদ্য রচনা

'রত্নবতী'

'রত্নবতী' মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১] ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "রত্নবতী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনাকার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। ইহা কোন পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। আজকাল অনেকানেক সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার অনুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক না হইয়া যথাসাধ্য এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইলাম বলিতে পারি না। গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব ইহার মধ্যে শতশত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব। ভরসা করি, গুণজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে সকলে এক একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার শ্রম সফল হয়।"

এ গল্পের কাহিনী কাল্পনিক একথা লেখক বলেছেন। তবে মনে হয়, লেখক প্রচলিত কোন লোক-কাহিনী থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এটি একটি স্বল্প আয়তনের পুস্তক; পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ৬১। পরবর্তীকালে এর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। এর কাহিনী হলো গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সঙ্গে রত্নপুরের রাজকন্যার পরিণয়।

রত্নবতী

রাজ্যের নাম গুজরাট, রাজকুমার সুকুমার। মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের সঙ্গে সুকুমারের আবাল্য প্রণয়। একদা তাদের মধ্যে তর্কের সূত্রপাত হয়—ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। রাজপুত্র সুকুমার বলে, ধন শ্রেষ্ঠ। সুমন্ত তাতে সমর্থন দেন না। তার মতে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য উভয়ে বিদেশ পর্যটনে বের হলেন।

রাজনন্দন বহু দেশ পরিভ্রমণ ক'রে একদা মধ্যাহ্নে তৃষ্ণার্ত হয়ে জলান্বেষণে ব্যস্ত হলেন। অকস্মাৎ বনের ভিতর তিনি এক সুরম্য সরোবরের সম্মুখীন হলেন। সেই সরোবরের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে জগদীশ্বরের ধ্যান করছিলেন। রাজপুত্র সরোবরে হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য অবতরণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একবিন্দু বারি কপিদেহে পতিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কপি মনুষ্যদেহে রূপান্তরিত হলো। তখন ঐ মনুষ্য-দেহধারী তপস্বী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জন করতে লাগলেন। সুকুমার প্রথমে বিস্মিত ও পরে ভীত হলেন। ভীত হয়ে তিনি তপস্বীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে বহু কাকুতি মিনতী করায় তপস্বী শান্ত হলেন। তারপর তাঁর হাতের আংটি দিয়ে বললেন, এইটি একটি ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয়ক। এর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। শেষে তিনি বললেন, এই বনের উত্তর দক্ষিণ পুব দিকে যেতে কোন বাধা নেই, তবে পশ্চিম দিকে কখনও ভ্রমণ করা উচিৎ হবে না। সুকুমার তপস্বীর পদস্পর্শ করলেন এবং তপস্বীও পুনরায় কপিদেহ ধারণ ক'রে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন।

নিষিদ্ধ বস্তু চিরদিনই মানুষকে প্রলুব্ধ করে। তাই রাজকুমার পশ্চিম দিকেই যাত্রা করলেন। তার মনে এ আশঙ্কাও ছিল—হয়তো সে কোন বিপদে পড়তে পারে. তবে যতক্ষণ তপস্বীদত্ত অ [illegible]রীয়ক আছে ততক্ষণ ভয় কি। সুকুমার অবশেষে রত্নপুর রাজ্যের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে হাজির হলেন। উক্ত রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটি ঘোষণা পাঠ ক'রে সুকুমার অধীর হয়ে পড়লেন। ঐ রত্নপুরের রাজকন্যা একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন, তিনি তাকেই পতিত্বে বরণ

করবেন। সুকুমার রাজপ্রাসাদের দ্বারে যে ঘণ্টা ছিল তা বাজিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা তাকে রাজা রত্নধ্বজের কাছে হাজির করলো। রাজা সুকুমারকে প্রথমে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কেননা এ পর্যন্ত বহু রাজ-পুত্র তার কন্যার লোভে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করছে। সুকুমার এতে মোটেই নিরুৎসাহ হলেন না। তখন তাকে রাজকন্যার কাছে উপস্থিত করা হলো। রাজকন্যা তার সহচরী মারফৎ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করলেন। সুকুমারের নিকট যে আংটি ছিল তার কাছে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে গেলেন এবং রাজকন্যাকে দিয়ে দিলেন। এমন ক'রে চারদিনই রাজকন্যার প্রার্থনা সুকুমার পূর্ণ করেন। পঞ্চম দিনে রাজ-কন্যার মনে নানা ভয় উপস্থিত হয়—হয়তো এই ব্যক্তি কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে শক্তিমান। রাজকন্যা রত্নবতী তখন সহচরীকে গোপনে সুকুমারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে নির্দেশ দেন। পঞ্চম দিনে রাজকুমার রাজকন্যার ইপ্সিত গজমুক্তার হার তার হাতের আংটির কাছে প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতে হার এসে উপস্থিত হয়। রত্নবতীর সহচরী গোপনে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে সে রাজকন্যার কাছে সব রহস্য উদ্ঘাটন করে। পরদিন রাজকুমার যখন গজমুক্তার হার নিয়ে উপস্থিত হলো তখন রাজকন্যা সুকুমারের কাছে একটি আংটি প্রার্থনা করলেন; পরদিন সুকুমার তার নিজের হাতের আংটিটিই রাজকন্যার সহচরীর হাতে দিয়ে দিলেন। সুকুমার ভাবছিল রাজকন্যার প্রার্থনা যখন ছয় দিন পূর্ণ করতে পেরেছে তখন হয়তো রাজকন্যা আর কিছু চাইবেন না। সপ্তম দিবসে রাজকন্যা আরও একটি আংটি প্রার্থনা করে বসলেন। রাজকন্যার এই কথা শোনামাত্র সুকুমারের কাছে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেলো। তার কাছে তো আর কোন আংটিও নাই। সেই তপস্বীর দেওয়া আংটিটি তো সে রাজকন্যাকে দিয়ে ফেলেছে। রাজকন্যার প্রার্থনা পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন বলে তৎক্ষণাৎ সুকুমারকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো।

এদিকে মন্ত্রিপুত্র সুমন্তও ভ্রমণ করতে করতে উক্ত তপস্বীর কাছে এসে উপস্থিত। সুমন্ত হাত-মুখ ধোবার জন্য জলে নামা মাত্রই তপস্বীর গায়ে কয়েক ফোঁটা জল গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তপস্বী মানুষের রূপ ধারণ ক'রে সুমন্তকে তিরস্কার করতে থাকেন। সুমন্ত তপস্বীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অনেক স্তুতি-বাক্যে তপস্বীর কৃপা লাভ করে। তপস্বী হৃষ্ট হয়ে সুমন্তকে এই বর দিলেন যে, জগদীশ্বরকে স্মরণ ক'রে সুমন্ত যে প্রকার শরীর ও আকৃতি ধারণ করতে

চাইবে তৎক্ষণাৎ তা-ই হবে। বিদায়কালে তপস্বী সুমন্তকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করলেন। তখন তপস্বী সরোবরের এক পাশের জল স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বানরাকৃতি লাভ করলেন। সুমন্ত গোপনে ঐ সরোবরের দুই দিকের জল তার সঙ্গে নিয়ে পর্যটনে বের হলেন।

সুমন্তও তপস্বীর আদেশ অমান্য ক'রে পশ্চিম দিকেই ভ্রমণ করতে থাকেন এবং অবশেষে রত্নপুর রাজ্যের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজকন্যার ঘোষণা দেখতে পেলেন। সুমন্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা না বাজিয়ে এক গাছের তলায় গিয়ে বসে ভাবতে থাকলেন। এমন সময় কয়েকজন পরিচারিকা জলকুম্ভ নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ পরিচারিকাদের কথাবার্তা থেকে সুমন্ত রাজকন্যার খামখেয়ালীপনা এবং রাজপুত্রদের কারা-লাঞ্ছনার কথা জানতে পারলেন। যখন ঐ পরিচারিকারা জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন সুমন্ত তাদের সাথে আলাপ করলো। পরিচারিকারা রাজকন্যার স্নানের জল নিয়ে যাচ্ছে। অতএব তারা গল্প করতে পারছে না। সুমন্ত নিশ্চিত যে, এই রাজকন্যার লোভেই তার বন্ধু সুকুমার কারাগারে বন্দী হয়েছে। সুমন্ত পরিচারিকাদের কাছে জল পানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং চাতুরীর সাহায্যে তার কাছে সরোবরের যে জল ছিল তা পরিচারিকাদের কলসীতে নিক্ষেপ করে দেন। ঐ জলে রাজকন্যা স্নান করতে গিয়ে বানরাকৃতি হয়ে পড়লেন। ঐ জল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দাসীরা এমনকি রাজমহিষীও বানরে রূপান্তরিত হয়ে পড়লো। একজন চতুরা দাসী জল স্পর্শ না ক'রে রাজাকে সব বৃত্তান্ত বললো। রাজা অন্তঃপুরে এ দৃশ্য দেখে উন্মাদবৎ হয়ে গেলেন।

এদিকে সুমন্ত এক গণক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ ক'রে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে এ বিপদ থেকে মুক্তির উপায় বলবার জন্য আকুল আবেদন করেন। সুমন্ত কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বললেন যে, রাজার দুহিতাই এ সমস্ত বিপদের কারণ। কিন্তু তার পক্ষে এ বিপদ দূর করা সম্ভবপর নয়। তবে পরদিন সরোবরতীরে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হবে, তিনি এ বিপদ থেকে রাজাকে মুক্ত করতে পারবেন।

পরদিন সুমন্ত এক সন্ন্যাসীর বেশে সরোবরতীরে বসে ধ্যাননিমগ্ন হলেন। প্রথমে রাজার সভাসদরা, পরে রাজা রত্নধ্বজ স্বয়ং সরোবরতীরে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী বললেন যে, রাজকন্যার পাপেই এ বিপদ সংঘটিত হয়েছে। তখন সন্ন্যাসী রাজাকে আদেশ করলেন যে, সকল অবরুদ্ধ রাজপুত্রদের মুক্তি

দিতে হবে এবং তাদের অর্থের দ্বিগুণ অর্থ প্রদান ক'রে তাদের বাড়ী ফিরে যেতে দিতে হবে। রাজা সন্ন্যাসীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। সকলের শেষে রাজপুত্র সুকুমারকে মুক্ত করা হলো। সুমন্ত সুকুমারকে মুক্তি না দেওয়ার কথা বললেন। তৎপরে সন্ন্যাসীবেশী সুমন্ত সেই বনের সরোবরের পবিত্র জল দ্বারা সমস্ত কপিরূপী নারীদের মানুষে রূপান্তরিত করলেন। কেবল রত্নবতীই বানরাকৃতি রয়ে গেলেন। রাজার কাতর অনুরোধে, এমনকি শেষে রাজা কন্যাটিকে সন্ন্যাসীর হাতে সমর্পণ করতেও সম্মত আছেন বলে ঘোষণা করেন। পরে রত্নবতীও মানবাকৃতি লাভ করলেন। সন্ন্যাসী তখন রাজাকে জানালেন যে, সে বিষয়-ত্যাগী যোগী ; গৃহী হওয়ার তার ইচ্ছা মাত্র নাই। অতএব এই কন্যাটিকে রাজকুমার সুকুমারের হস্তেই সমর্পণ করলে সে সুখী হবে। সুকুমারের সঙ্গে শুভদিনে জাঁকজমকের মধ্যে রত্নবতীর বিবাহ হলো। সন্ন্যাসী রাজাকে বলে পাঠান যে, তিনিও রাজ-জামাতা ও কন্যার সঙ্গে বাসরঘরে উপস্থিত থাকবেন। সন্ন্যাসীকে বাসরঘরে দেখতে পেয়ে সুকুমার অবাক হলেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী সুমন্তের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করলে সুকুমার বিস্মিত হন। উভয় বন্ধু তখন আলিঙ্গন অশ্রুতে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন। এ সংবাদ রাজা ও রানীর নিকট পৌঁছে গেল। রাজা ও রানী ছুটে এলেন। সুমন্ত আদ্যোপান্ত সব খুলে বললেন। রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সুমন্তের বুদ্ধির প্রশংসা করতে থাকলেন। পরে মন্ত্রিকন্যার সঙ্গে সুমন্তের বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে দুই বন্ধু সস্ত্রীক দেশে ফিরলেন।

এই হলো রত্নবতীর কাহিনী।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত রাজা বা রাজপুত্র রাজকন্যার নাম উল্লেখ রয়েছে এগুলি কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। গুজরাটে রত্নপুর নামে শহরের কথা সবাই জানে—কিন্তু এ গ্রন্থের শহরগুলির সঠিক অবস্থান বুঝা যায় না। পশ্চিম ভারতে গুজরাট প্রদেশ আছে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও, যেমন চণ্ডীমঙ্গলে, গুজরাট নগরের বর্ণনা আছে। রত্নপুর খুবই পরিচিত নাম। নর্মদা নদীর তীরে একটি রত্নপুর[২] ; যোধপুরের নিকট একটি[৩] ; তৎকালীন বাংলাদেশের নদীয়ায় একটি[৪] রত্নপুর আছে। যাহোক এ কাহিনী থেকে এ সমস্ত স্থানের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান বুঝা যায় না।

'রত্নবতী' একটি রূপকথা জাতীয় গল্প এবং এর মধ্যে একটি নীতিশিক্ষা আছে। এই গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীরা ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। জীবনে

এই সমস্ত ঘটনা একেবারেই অবাস্তব। এই ইন্দ্রজাল ছাড়া গল্পটি অগ্রসর হতে পারে না। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে মানুষের বানরাকৃতি লাভ এবং বানরের মনুষ্যদেহ লাভ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে সর্বশক্তিমান অঙ্গুরীয়ক। এই অঙ্গুরীয়কের কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তা-ই পাওয়া যায়। আর একটি হচ্ছে তপস্বীর বর, যার দ্বারা মানুষ যে-কোন আকৃতি ধারণ করতে পারে।

এই গল্পের চরিত্রগুলির সবই মানব ও মানবী; যদিও তাদের কারো কারো ঐন্দ্রজালিক শক্তি রয়েছে। এই শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক যুগের কথা ও কিংবদন্তীকে। এ কাহিনী পাঠকের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে; যদিও বুদ্ধি ও যুক্তি এসব স্বীকার করে না। এ গল্পের নায়ক বা নায়িকাদের মনোজগতের বিস্তৃত বিবরণ বা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে নাই সত্য, কিন্তু মাঝে মাঝে মানবীয় অনুভূতির বিদ্যুৎচমক পাঠকের হৃদয়কে সহসা আলোকিত করে, স্পর্শ করে। গল্পের নায়ক রাজপুত্র সুকুমারকে দেখে রত্নধ্বজ বারবার তাকে নিষেধ করে এহেন দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতে। তার কন্যা রাজকুমারী রত্নবতীর এরূপ অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিজ্ঞাকে রাজা বাতুলতাই মনে করতো। কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা কন্যার অন্যায় আবদার বারবার প্রশ্রয় দিয়েছে। রত্নধ্বজের অন্তর্দ্বন্দ্বের যদিও কোন বিস্তৃত বিবরণ নেই, বা সেই দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা মশাররফ করেননি, তথাপি, মশাররফ এ কথাটি বলেছেন রত্নধ্বজের মুখের ভাষায়। এ সমস্ত কারণে গল্পের নায়ক-নায়িকারা একেবারে রক্ত-মাংসের নয় বলে মনে হয় না বা একান্তভাবে এরা কেউ কল্পলোকের অধিবাসীও নয়। সুমন্ত, যে সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা, মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হতো—হৃদয় দ্বারা নয়, সেও কোন এক মুহূর্তে অপরূপ লাবণ্যময়ী রাজকন্যাকে দেখে অভিভূত হয়, মুগ্ধ হয়। কারণ এটিই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

মশাররফের সমসাময়িক বাঙলা উপন্যাস বা গদ্যগ্রন্থগুলির আলোচনা করলে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয় যে, এত অল্প বয়সে মশাররফ কী পরিমাণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম গ্রন্থে। সে শক্তির প্রকাশ ঘটেছে গল্পের গ্রন্থন-নৈপুণ্যে এবং ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। গল্পটি এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, পাঠক রুদ্ধনিঃশ্বাসে বইটি শেষ ক'রে তবে ছাড়বে।

সে যুগের প্রধান প্রধান গদ্য ও উপন্যাস লেখক ছিলেন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মূলতঃ অনুবাদক ; সৃষ্টিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্যারীচাঁদের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয় বরং সমাজচিত্র ; অনুরূপভাবে 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা'ও। ভূদেবের 'অঙ্গুরী বিনিময়' ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও তাতে আধুনিক উপন্যাসের বীজ রয়েছে বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'কেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম গ্রন্থ বলা যায় এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমের আরও দু'টি উপন্যাস,—'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়। এ থেকে এ কথাই বলা যায় যে, মশাররফ যখন সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন, তখন মাত্র এই কয়টি উপন্যাসই আদর্শ হিসেবে তাঁর সামনে ছিল।

এ ছাড়া আরও কথা আছে। ইংরেজী সাহিত্যে মশাররফের কতটা ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা ছিল তার কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় না। কাজেই আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে মশাররফের ধ্যান-ধারণা যে খুব বেশী ছিল এমন কথা বলা যায় না। এ সমস্ত কারণেই হয়তো মশাররফ কল্পনার রাজ্য থেকে বা রূপকথার দেশ থেকে একটি কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। আজকের দিনে এমন একটি গল্পের কোন আবেদন পাঠকের কাছে হয়তো বা নাই। কিন্তু সে-যুগে এ বইটি যে সমাদৃত হয়েছিল সে-কথা একেবারে অসম্ভব নয়। সে-যুগের অতি অল্প লেখায়ই সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল।

চরিত্র

এ কাহিনীতে মশাররফ কতকগুলি চরিত্র বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এগুলিকে চরিত্র সৃষ্টি বলা চলে না। এদের কোন বিকাশ নাই, পরিণতি নাই। কাহিনীর একটি নীতি (moral) আছে, এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চরিত্রগুলিকে ঠিক তেমনি ভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। গল্পের নায়ককে তাই শেষ পর্যন্ত জিততেই হবে,—যত বাধা-বিপত্তি আসুক সব কাটিয়ে উঠবে সে। সম্ভব অসম্ভব সব কিছুই ঘটানো হবে প্রয়োজন হলে। এই ধরনের রূপকথা জাতীয় গল্পে আধুনিক উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি অবশ্য আশা করা যায় না।

প্রথমে ধরা যাক তপস্বীর কথা। এক হিসাবে তপস্বী হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরিত্র। আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সে নিজে যে-কোন আকৃতি ধারণ করতে পারে—এবং শুধু তাই নয়, সে অন্যকেও বর দিলে সে-ও যে-কোন আকৃতি ধারণ করতে পারে। এই অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী এ তপস্বী। প্রাচ্য

দেশীয় তপস্বীর মতোই তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সে অতি সহজে ক্রুদ্ধ হয়, আবার অল্পেতেই সে খুশী হয়—অল্প স্তুতিতেই তার মন দ্রবীভূত হয়। হিন্দু-পৌরাণিক দেবতা 'শিব'-এর সঙ্গে এই তপস্বীর অদ্ভুত সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

সুকুমার গুজরাটের রাজপুত্র। এটুকু পরিচয় নিয়েই সে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সে যা বিশ্বাস করে তার থেকে তাকে একবিন্দু নড়ানো যায় না। সে মনে করতো, সে খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সে কোন সময় অন্যের মত সহ্য করতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে সে অসহিষ্ণু ও অস্থিরমতি ছিল। তপস্বীর দৈব-বল দেখে সে আবার ভীত হয়ে পড়ত। রাজকন্যার বিজ্ঞপ্তি দেখে সে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না ক'রে রাজকন্যার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হলো। আসলে সে নিজের শক্তি বা বুদ্ধিকে বিশ্বাস করত না, তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল। সে বিশ্বাস করল, নির্ভর করল দৈবশক্তিসম্পন্ন ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয়কের উপর। কিন্তু নিজের বুদ্ধির অভাব থাকার জন্যে সে অশেষ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করে। অবশ্য পরে তার অনুশোচনা হয় ঠিকই। বন্ধুর প্রতি শেষ পর্যন্ত সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, কেননা বন্ধুই তাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে এবং রাজকন্যাপ্রাপ্তি বন্ধুর বদৌলতেই ঘটে।

সুমন্ত হলো মন্ত্রিপুত্র। গুজরাটের রাজপুত্রের সঙ্গে তার অভেদ্য প্রণয়। প্রকৃতিতে সে সুকুমারের বিপরীত। সে ধীরস্থির, বন্ধুবৎসল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে শুধু দৈব-বলের উপর, ইন্দ্রজালের উপর বিশ্বাস করেনি। সর্বদাই সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করত। সে ছিল কুশলী ব্যক্তি। রত্নপুরের রাজার পরিচারিকাদের চোখে ধূলা দিয়ে সে তার কাজ উদ্ধার করে। সুমন্তকে দেখে রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয়। রাজকন্যাকে প্রথম যখন সে দেখল সেই মুহূর্তে সুমন্তের চিত্তে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সে রাজকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরমুহূর্তে বন্ধুবাৎসল্য তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ রাজকন্যা তার বন্ধুর প্রাপ্য। কেননা তার বন্ধু এই কন্যাটির জন্য অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছে।

রত্নধ্বজ স্নেহশীল পিতা। তাঁর দুহিতার জন্য তিনি অনেক মনঃকষ্ট লাভ করেন। একদিকে পিতৃত্বের দাবী, অন্যদিকে কর্তব্যের আহ্বান তাকে মাঝে মাঝে সংশয়াকুল করেছে। সুকুমারকে প্রথমে রাজা রত্নধ্বজ চেষ্টা করলো তার কন্যার অসম্ভব প্রার্থনা পূরণের কাজে অগ্রসর না হতে। রাজা জানতো যে, এমনি

অসম্ভব রকমের অভিলাষ মানুষের পক্ষে পূর্ণ করা অসম্ভব। তার কন্যার খামখেয়ালিতে যে বহু রাজপুত্র কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করছে সেটাও রাজা উপলব্ধি করতো। কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যার আবদারকে সে প্রশ্রয় না দিয়ে পারত না। রাজা সুমন্তের ব্যবহারে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। সুমন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাকেই কন্যা দিতে সম্মত হয়। কেননা সুমন্তই তার কন্যা ও স্ত্রীকে ইন্দ্রজালের প্রভাব থেকে মুক্ত করে।

রত্নবতী রাজা রত্নধ্বজের একমাত্র কন্যা। রূপবতী ব'লেই হয়তো তার আকাশচুম্বী গর্ব ছিল। সে নিজেকে মনে করতো রক্ত-মাংসের মানুষের স্পর্শের বাইরে। পরের কর্তৃত্ব সে সহ্য করতে পারবে না—এই জন্যেই সে বিবাহে অনিচ্ছুক ছিল। আর অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দলাভ করাও তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল। তার স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারটি পুরোপুরি রূপকথার বিষয়। তার ভিতরের 'অহং' তাকে সব সময় বাধা দিত। সেজন্যই সুকুমার যখন পরপর চারদিন তার প্রার্থনা পূরণে সমর্থ হলো, তখনই সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ভাবে, এবার বুঝি তার দর্প চুর্ণ হবে। তাকে স্ত্রী হতে হবে—পুরুষের অধীন হতে হবে।

চরিত্র চিত্রনে মশাররফ সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও স্বল্প পরিচয়ে তিনি যে কয়টি মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন, সে মানুষগুলি আমাদের কাছে একেবারে অবাস্তব মনে হয় না। সে মানুষগুলির মনোজগতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ তিনি করতে পারেননি সে কথা ঠিক, কিন্তু সে যুগের কোন বাংলা উপন্যাসেই মনোজগতের মনোসমীক্ষণ দেখা যায়নি।

'রত্নবতী'র আবহাওয়া ও পরিবেশ

'রত্নবতী' রূপকথা জাতীয় গল্প হলেও এই গ্রন্থে কেবল কল্পলোকের অধিবাসীরাই চিত্রিত হয়নি, এই গল্পে বাংলা দেশের মাটির ঘ্রাণও পাওয়া যায়। রত্নপুর অবশ্য রূপকথার গল্পের মত—এখানে রাজা ঐশ্বর্যশালী, রাজকন্যা বিচিত্র উপায়ে স্বামী নির্বাচন করেন। ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয়ক এক আলাদীনের প্রদীপের মতই এর অধিকারীর ইচ্ছা পূরণ করে। সরোবরের বারি মানুষকে কপিতে রূপান্তরিত করে এবং কপিকে মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। রাজা স্বর্ণ-মুদ্রায় আর্থিক লেনদেন করেন, স্বর্ণ-সিংহাসনে শুধু নিজেই বসেন না, সম্মানিত অতিথিদের জন্যেও স্বর্ণ-আসন প্রদান করেন।

এ সমস্ত সত্ত্বেও বাংলার বিশেষ রূপটি এই গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে। এর বৃক্ষলতা, এর ফুল-ফল, এর পাখী, এর শিশিরবিন্দু, এর বকুল গাছ, সবই যেন বাংলাদেশের মনে হয়। এ দেশের মেয়েরা কক্ষে কলসী নিয়ে জল সংগ্রহে যায়। বিয়ের পর বাসরঘরের চারিদিকে আড়িপেতে থাকা—এসব বাংলার রীতিনীতি। মাথা নত ক'রে প্রণাম করা, পদস্পর্শ করা, এ সমস্তই বাংলার। অবশ্য জ্যোতিষী, সংস্যাসী, ব্রাহ্মণ, এরা বাংলার তথা ভারতের। বঙ্গ-ভারতের সংস্কৃতির চিহ্ন মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। নারী-সৌন্দর্য বর্ণনায় মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে যেমন দেখা যায়, এখানেও তার কিছু নিদর্শন রয়েছে। যেমন জ্যোৎস্না রাত্রিকে সিঁথিতে সিন্দুর দেওয়া রমনীর সঙ্গে, সিন্দুরকে চন্দ্রের সঙ্গে, এই যে উপমা এগুলি মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

এই গল্প রচনায় মশাররফ যে লোক-কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। কেননা বাংলার লোক-কাহিনীর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হলো রাজপুত্র কর্তৃক রাজকন্যার অন্বেষণ এবং পরিশেষে অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ।

মশাররফ নিজে মুসলমান ছিলেন এবং মুসলিম পরিবেশে লালিত প্রতি-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু, তথাপি রত্নবতীতে যে জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা মূলতঃ হিন্দু-জীবন। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র মুসলমানী ভাবধারা বা জীবন-পরিচর্যার কোন চিহ্ন নাই। যদি কেউ লেখকের নাম না জানে তবে সে এই সিদ্ধান্ত করবে যে, 'রত্নবতী'র লেখক একজন অমুসলমান। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন Calcutta Review-তে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাতেও এই কথাটি বলা হয়েছিল। সে সমালোচনাটি এরূপ ছিল: "This is a romantic tale designed to show that knowledge is of greater importance than wealth, but as it is founded on the marvellous and the supernatural, it is not likely to be of much use··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· We take it that the author has concealed his name under the nom de plume of a Musalman."

পরিশেষে রত্নবতীর ভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 'বিষাদ সিন্ধু'র লেখক মশাররফের ভাষা প্রয়োগে নৈপুণ্য ও অপরূপ লাবণ্যময়ী গদ্যভঙ্গীর সূত্রপাত হয় এই রত্নবতীতেই।

তথ্য নির্দেশ

[১] মশাররফ তাঁর 'আমার জীবনী'র (৮ম খণ্ড) পেছনের প্রচ্ছদপটে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি 'রত্নবতী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। যেহেতু তাঁর কাছে ঐ পুস্তকের কোন খণ্ড নাই, তাই তিনি পাঠকের কাছে এই পুস্তকের একটি খণ্ডের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল মশাররফ উল্লেখ করেছেন ১২৭৩ বাংলা, ফলে ইংরেজী তারিখ দাঁড়াচ্ছে ১৮৬৬ খ্রীঃ। তারিখটি মুদ্রণপ্রমাদও হতে পারে।

[২] Comissariat, *A History of Gujrat*, 1957, vol. 11, p. 212.

[৩] *Bombay Gazetteer*, vol. 1, PT 1, 1878, p. 471.

[৪] *Bengal District Gazetteer*, Nadia, 1910, p. 188, মেহেরপুর মহকুমায় এক রত্নপুরের নাম পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

মশাররফ ও তাঁর নাট্য রচনা

বাংলাদেশের তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে মশাররফের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা জানা যায়নি। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত না হয়েও মশাররফ বাংলা-নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন মাত্র দু'খানা নাটক[১] নিয়ে। বাংলার প্রথম দিকের নাট্যকার—যেমন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এঁরাও অভিনেতা ছিলেন না। জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার শেক্সপীয়ার ও মলিয়েরর রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। একথা অবশ্যই যথার্থ যে, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত থাকলে নাট্য রচনার কলাকৌশল অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায় এবং নাটক রচনায় মঞ্চ-জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। মশাররফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর এ সম্পর্কে খুব জ্ঞান না থাকলেও বা নিজে নট না হয়েও তিনি যে দু'খানা নাটক রচনা করেছেন সেগুলো মঞ্চের অনুপযোগী নয়।

বাঙলা নাটকে মশাররফের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার পূর্বে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুতঃ বাঙলা নাটকের সূত্রপাত হচ্ছে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে। এ সমস্ত নাটকের বিষয়বস্তু প্রায়শঃ ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। অবশ্য ঐ যুগে সমসাময়িক যুগ-সমস্যা নিয়ে কয়েকখানা প্রহসনও রচিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে এ যুগে নাটক রচনা করেন তারাচরণ শিকদার, জি. সি. গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং মনোমোহন বসু।[২]

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, সে যুগের অতি অল্প মৌলিক নাটকেই তৎকালীন বাঙালীর জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে রামনারায়ণ তর্করত্ন ছিলেন পথপ্রদর্শক। তাঁর নাটক বা প্রহসনগুলির বিষয়বস্তু ছিল কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। দীনবন্ধুর নাটকে অর্থনৈতিক সমস্যা, যেমন নীলচাষ এবং কৃষকদের উপর নীলকর কুঠিয়ালদের

অত্যাচার প্রাধান্য লাভ করে। মধুসূদন তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'য় মহাভারত থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেন। যদিও তিনি সংস্কৃত-নাটকের কলাকৌশল অনুসরণ করেননি। মধুসূদন প্রচলিত সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক অনুসরণ করেননি। মধুসূদন প্রচলিত সংস্কৃত নাটকের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ কেবল আঙ্গিকের দিক থেকে নয়, নাটকের ভাববস্তুর ক্ষেত্রেও।[৩] মশাররফ মধুসূদনের কিঞ্চিৎ পরে বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। পাশ্চাত্য নাটকের প্রতি মধুসূদনের যে আগ্রহ দেখা যায় মশাররফের তদ্রূপ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করেন মশাররফ। সংস্কৃত নাটকে যেমন 'প্রস্তাবনা', 'সূত্রধর' ও 'নটনটী'—নাটকের বিষয়বস্তুর মর্ম সংক্ষেপে বর্ণনা করে, তেমনি মশাররফের নাটকেও 'নটনটীরা' পূর্বাহ্নে নাটক সম্পর্কে মোটামুটি আভাস দিয়ে যান। এ ধরনের আঙ্গিক বা কলাকৌশল মশাররফ রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক বা প্রহসন থেকে গ্রহণ করেছেন বলা যেতে পারে। অবশ্য মশাররফ তাঁর নাটকে 'নান্দী' (স্তুতিমূলক পদ) ব্যবহার করেননি। এক যুগ আগে মধুসূদন এ সমস্ত রীতিনীতিকে বর্জন করেছিলেন; মশাররফ সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বলে মনে হয় না।

মশাররফ বাঙলার মুসলমান সমাজের প্রথম নাট্যকার।[৪] তাঁর প্রথম নাটক একটি প্রণয়োপাখ্যান। আধুনিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর নাটক বলা যাবে কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে এটি একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এ প্রসঙ্গে এটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাংলা নাটকের সূত্রপাতই হয়েছে উনিশ শতকের তৃতীয় অংশে অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই।

মশাররফের প্রথম নাট্যরচনা 'বসন্তকুমারী নাটক' বাংলার গণজীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'জমিদার দর্পণে' বাংলার অভিজাত সমাজের দুর্নীতিকে উন্মোচিত করেছেন মশাররফ।

'বসন্তকুমারী নাটক' মশাররফের দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে 'রত্নবতী' (১৮৬৯) একটি রূপকথা জাতীয় প্রণয় উপাখ্যান। 'বসন্তকুমারী নাটক' মশাররফের প্রথম নাটক। এটি ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৫] এর পরে নাটকের আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।[৬] 'বসন্তকুমারী নাটকে'র

ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) মশাররফ লিখেন, "আমার অনুরাগ-তরুর দ্বিতীয় কুসুম 'বসন্তকুমারী' প্রস্ফুটিত হইল।[৭] বাসন্তী-সুসৌরভ এ কুসুমে বিদ্যমান আছে কিনা, নিজে আমি সেটি জানি না। শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীন শ্রবণের, দর্শনেন্দ্রিয়-বিহীন দর্শনের, আর ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিহীন ঘ্রাণের স্বভাবসিদ্ধ গৌরব অবগত হয় না। সাহিত্য-অবয়বে আমিও সেইরূপ স্বভাবের দৈহিক গৌরবে অন্ধ—বিমূঢ়। নাট্যপ্রিয় সাহিত্য বন্ধুগণ আমার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ করিয়া এই অভিনব নাটকের কুসুমিতা নায়িকা বসন্তকুমারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একবার সস্নেহে কটাক্ষপাত করিলে পরম কৃতার্থ হইব। নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম; ইহাতে নানা দোষসম্ভাব অবশ্যম্ভাবী; যে সকল দোষ আর যে সকল ভ্রম থাকিল, অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিয়া উৎসাহ দান করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। পরিশেষে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি, মদীয় অকপট প্রিয় মিত্র সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মৌলবী বজলল করিম সাহেবের উৎসাহে আমি এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। কৃতকার্য হইলাম কিনা, সাধারণ সাহিত্য-সমাজের বিচার্য।"

'বসন্তকুমারী নাটক'টি মশাররফ উৎসর্গ করেন নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরকে। সেকালের বাংলার মুসলমান সমাজের একজন নায়ক ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। 'উপহার'-পত্রে মশাররফ লিখেন, "মহামহিম মিত্র। আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার অকপট অকৃত্রিম স্নেহ। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্নেহ আর অনুরাগের বশম্বদ হইয়া আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ইন্দ্রপুর রাজকুমারী এই বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার উদারচিত্ততা, মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমি এই বহু যত্নপ্রসূত বসন্তকুসুম-কলিকা 'বসন্তকুমারী'কে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। সাহিত্য-উদ্যানে বিচরণ করিবার ফলস্বরূপ এই আমার একটি নবকুসুম। প্রত্যাশা করি, এই কুমারীকে আপনি সস্নেহ-নয়নে দর্শন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন।"

নাটকটি মূলতঃ গদ্য-রচনা; যদিও তার মধ্যে কিছুসংখ্যক গান ও কবিতা রয়েছে। গান আছে পাঁচটি। আর আছে একটি দীর্ঘ প্রেমপত্র। এবং ছন্দে লেখা কঞ্চুকীর স্তুতি। বলা বাহুল্য এ সমস্ত সঙ্গীত সংযোজনার উদ্দেশ্য হলো দর্শকের চিত্তে অনুভূতি জাগানো এবং নাটকীয়তার সৃষ্টি করা।

নাটকের কাহিনী (plot) হলো কাল্পনিক কোন রাজা-রাজকুমারের প্রেমের উপাখ্যান। এ নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রীরা কেউ সমাজের সাধারণ মানুষ নয়, সবাই সমাজের উঁচুস্তরের লোক। রাজ-রাজড়ার কাহিনী হলেও এটি কোন ঐতিহাসিক নাটকও নয়। 'ইন্দ্রপুর', 'ভোজপুর' প্রভৃতি স্থানের নামগুলিও কাল্পনিক। এ নাটকে যে জীবন ও পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে তাকে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জীবন-পরিবেশ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে বাংলা-দেশের যে সমস্ত জীবজন্তু বা তরুলতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত গতানুগতিক। পদ্ম, জবা, শিমুল, কোকিল, কাক, নারিকেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির উল্লেখ এবং বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কিংবা ভারতের অন্যান্য সাহিত্যেও পাওয়া যায়। এই ধরনের ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্য আরও অনেকগুলি রীতিনীতি বর্ণনার মধ্যেও পাওয়া যায়ঃ যেমন, গর্ভবতী নারীর সাধভক্ষণ, নারী-সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক দীর্ঘকেশ, অগুরুচন্দন, সিন্দুর ও আলতার ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুই বঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক। মশাররফের প্রথম রচনা 'রত্নবতী'তেও যেমন হিন্দুজীবন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি 'বসন্তকুমারী নাটক'ও মূলতঃ হিন্দুসংস্কৃতির আলেখ্য। হিন্দু-পৌরাণিক চরিত্র, যেমন রামচন্দ্র ইন্দ্র, অহল্যা, গৌতম শচী ইত্যাদির উল্লেখ একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

কিন্তু এ সমস্তই বাহ্য, এই নাটক এবং 'রত্নবতী' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে একটি বিরাট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে ; সেটি হচ্ছে এই যে, এ নাটকে অতিপ্রাকৃতের কোন স্থান নেই। এ নাটক মানবমনের অনুভূতি এবং হৃদয়ের আবেগের আলোড়নের চিত্র। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, মশাররফ কল্পলোকের জগৎ থেকে বাস্তব জগতে প্রবেশ করছেন এবং বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'জমিদার দর্পণ' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমাজ ও জীবন সম্পর্কে এই 'জমিদার দর্পণ' নাটকই মশাররফের প্রথম রচনা।

মশাররফ 'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনীর উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন সে সম্পর্কে একেবারে নীরব। প্রচ্ছদপটে তিনি নাটকের নাম লিখেছেন 'বসন্তকুমারী নাটক' এবং তার নীচে বাংলা অক্ষরে "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" এই সংস্কৃত শ্লোকটিও লিপিবদ্ধ আছে।

'বসন্তকুমারী নাটকে'র কাহিনীর সঙ্গে জি. সি. গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস' নাটকের কাহিনীর মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয় নাটকের কাহিনীতে রয়েছে যুবতী বিমাতা ও সতীন-পুত্রের মধ্যে অনুরাগ।[৮] অনুরূপ একটি ঘটনার

উল্লেখ শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের জীবনেও পাওয়া যায়।[৯] এ ধরনের কাহিনী বাংলার কোন কোন লোক-কাহিনীর মধ্যেও পাওয়া যায়।[১০] এ জাতীয় গল্প ইউরোপীয় সাহিত্যেও অজ্ঞাত নয়।[১১] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে রাধামাধব কর নামে জনৈক লেখক শেক্‌সপীয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট' অনুবাদ করেন 'বসন্ত-কুমারী' নাম দিয়ে।[১২] উমাচরণ চক্রবর্তী লিখিত 'বসন্তকুমারী' নামে আর একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে।[১৩] দেখা যাচ্ছে মশাররফ কেবল 'বসন্তকুমারী' নামটিই গ্রহণ করেছেন; কাহিনী বা চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য মশাররফের নাটকে বা উক্ত গ্রন্থগুলিতে লক্ষিত হয় না।

'বসন্তকুমারী নাটক' তিন অঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক। নাটকটির প্রথম সংস্করণে প্রত্যেক অঙ্কে চারটি ক'রে দৃশ্য আছে; কেবল শেষ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। নাটকের প্রারম্ভে রয়েছে 'প্রস্তাবনা'। মশাররফ 'দৃশ্য' শব্দের পরিবর্তে 'রঙ্গভূমি' ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তী নাটক 'জমিদার দর্পণে' 'দৃশ্য' বুঝাতে 'গর্ভাঙ্ক' ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে।

'প্রস্তাবনায়' নট এবং নটী প্রবেশ করবে। নট প্রস্তাব করবে মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বসন্তকুমারী নাটক' অভিনয় করবার জন্য। নটী সে প্রস্তাব নাচক ক'রে দেয় এই বলে—"ছি ছি, এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন…একে মুসলমান, তাতে আবার উত্তরে বাঙ্গাল।" উত্তরে নট বলল, "মনোরঞ্জন না করতে পারি, রহস্য ত হবে? সে-ও এক আমোদ।" শেষ পর্যন্ত নটী নটের প্রস্তাবে সম্মত হয়। বলা বাহুল্য এ ধরনের প্রস্তাবনা ইত্যাদি সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে মশাররফ গ্রহণ করেন।

নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই :

[**প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য** (প্রথম রঙ্গভূমি)]

প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ইন্দ্রপুরের রাজা বীরেন্দ্র সিংহ তার বিদূষক প্রিয়ম্বদের সঙ্গে রহস্যালাপ করছে। বিপত্নীক রাজা বীরেন্দ্র সিংহকে প্রিয়ম্বদ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে উপদেশ দেয়। বীরেন্দ্র সিংহের ইচ্ছা, তাঁর উপযুক্ত পুত্র যুবরাজ নরেন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করবার পূর্বে বিবাহ দেন। রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী বৈশম্পায়ন রাজাকে অবহিত করান, এবং মন্ত্রীও রাজপুত্রের বিবাহ সম্পর্কে রাজাকে উপদেশ দেন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

এদিকে প্রিয়ম্বদ রাজাকে বারংবার বিবাহের জন্য তাগিদ দিতে থাকে। প্রিয়ম্বদ এক রূপসী কুমারীর কথা ইঙ্গিতে বলেন। রাজা বৃদ্ধবয়সে কুমারীর পাণিগ্রহণে প্রথমে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু পরে সম্মত হন এবং চতুর্দশী রেবতীকে গোপনে বিবাহ করেন।

[তৃতীয় দৃশ্য]

রাজা বীরেন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহে রাজ্যে সমালোচনার ঢেউ বয়ে গেল। বিশেষতঃ নারীমহলে খুব উত্তেজনা দেখা গেল। প্রজারাও অসন্তুষ্ট, কেননা রাজা রাজকার্যে অমনোযোগী হয়ে পড়লেন, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করবে এমন সংবাদও পাওয়া গেল।

[চতুর্থ দৃশ্য]

কিন্তু এ গেল বাইরে ; ভিতরেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাজান্তঃপুরে রাজার দ্বিতীয়া স্ত্রী রেবতী প্রেমে পড়ল যুবরাজ নরেন্দ্রের। রেবতী বৃদ্ধ রাজার স্ত্রী-রূপে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। রেবতীর প্রেরিত মালতী দাসী নরেন্দ্র কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ফিরে এলেও রেবতী নিরুৎসাহ হয়নি। একদা রেবতী রাজা বীরেন্দ্রকে সকাতর অনুরোধ জানায় যে, সে নরেন্দ্রকে স্বীয় পুত্রবৎ স্নেহ করে এবং নরেন্দ্রকে তার কক্ষে একটুখানি দেখতে চায়। রাজা রানীর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য]

যুবরাজ নরেন্দ্র ভোজপুরের রাজকন্যা বসন্তকুমারীর নাম শুনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হন।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নরেন্দ্র তার বিমাতার কক্ষে উপস্থিত হয়। ঐ মুহূর্তে ভোজপুরের রাজার প্রেরিত দূত বসন্তকুমারীর একখানি চিত্রপট

এবং রাজা বিজয় সিংহের একখানা অনুরোধপত্র নিয়ে বীরেন্দ্র সিংহের কাছে হাজির হয়। পত্রে বিজয় সিংহ বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বর-সভায় বীরেন্দ্র সিংহ ও নরেন্দ্রকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে। এদিকে রেবতী চালাকি ক'রে ঐ চিত্রখানি হস্তগত করে। পরে রেবতী নরেন্দ্রকে একখানি প্রেমপত্রও লিখে বসে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা বীরেন্দ্র ঐ পত্রখানি দেখে ফেললেও স্ত্রী রুষ্ট হবে ভেবে পত্রখানি পাঠ করলেন না। রেবতী রাজাকে বলে যে, পত্রখানি তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

[তৃতীয় দৃশ্য]

(প্রথম সংস্করণে এই দৃশ্যটি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে এই দৃশ্যটি সংযোজিত হয়েছে)

ভোজপুরের রাজকন্যা বসন্তকুমারী স্বপ্নে নরেন্দ্রকে দর্শন করে এবং তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। দাসী মারফত রাজা বিজয় সিংহ কন্যার অসুস্থতার কথা শুনে তিনি কন্যার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে খোঁজ নিতে কন্যার কক্ষে আগমন করেন। রাজা বৈদ্য গণকঠাকুর মারফত কন্যার অসুস্থতার কারণ অনুসন্ধান করলেন। শেষে গণকঠাকুরের কথায় রাজা বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বর-সভা আহ্বানের জন্য আদেশ দিলেন।

[চতুর্থ দৃশ্য]

(প্রথম সংস্করণে এটি তৃতীয় রঙ্গভূমি)

বসন্তকুমারীর স্বয়ম্বর-সভার দিন সমাগত। বসন্তকুমারী উদ্বিগ্ন এই জন্য যে, স্বপ্নে যাঁকে তিনি দেখেছিলেন তাঁকে সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে কিনা। বসন্তকুমারী বিষণ্নচিত্তে তার কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় রাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা বসন্তকুমারীকে ঐ দিনের সভার উপযোগী মূল্যবান পোশাক পরিধান করার জন্য আদেশ করলেন। পিতার আদেশে বসন্তকুমারী যথাযোগ্য বসনবিভূষিতা হয়।

[পঞ্চম দৃশ্য]

বসন্তকুমারী স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করে এবং নরেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে তার গলায় মালা দিতেই সভাস্থ সকলে হাততালি দেয়। রাজা বিজয় সিংহ এসে কন্যাকে নরেন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন।

[তৃতীয় অঙ্ক ঃ প্রথম দৃশ্য]

দুই কারণে রেবতী বসন্তকুমারীর প্রতি বিরূপ হলো। প্রথমতঃ, রেবতী অপেক্ষা বসন্তকুমারী অনেক রূপবতী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই বসন্তকুমারীর জন্যই রেবতী নরেন্দ্রকে হারাতে বসল। তারপর যদি নরেন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হয় তবে তো আরো বিপদ। যখন রেবতীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সে আর এক ষড়যন্ত্র ক'রে বসল। রাজা বীরেন্দ্র সিংহ একদিন রেবতীর কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখেন যে, রেবতী ভূলুণ্ঠিতা; রাজাকে দেখা মাত্র রেবতী আর্তনাদ ক'রে উঠল। রেবতী স্বীয় জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত। রাজা বিমূঢ় হয়ে কারণ জানতে চাইলে রেবতী প্রথমে কিছু ব্যক্ত করল না। পরিশেষে রেবতী জানায় যে, নরেন্দ্র তার সতীত্বনাশের অপচেষ্টা করেছে। রাজা মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ ঘোষণা করলেন। রেবতীর প্রার্থনা, রাজার পবিত্র তরবারি যেন অধর্মাচারী নরেন্দ্রের শোণিতে কলুষিত না হয়। অগ্নিতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হোক।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

নরেন্দ্র ও বসন্তকুমারী তাদের কক্ষে আলাপে রত। অকস্মাৎ একটি পত্র বসন্তকুমারীর হাতে পড়ে। সেটি রেবতীর লেখা জেনে বসন্তকুমারী অবাক হয়। এদিকে নগরপাল রাজাজ্ঞা নিয়ে নরেন্দ্রের কক্ষে উপস্থিত হয় এবং নরেন্দ্রকে বন্দী করে। এর কারণ জানতে চাইলে নগরপাল বলে, এ রাজার আদেশ। এদিকে প্রায় মূর্ছিতা বসন্তকুমারী তার অলঙ্কারগুলো খুলে নগর-পালকে অনুরোধ জানায় যুবরাজকে যেন কষ্ট না দেওয়া হয়। নগরপালের পশ্চাতে বসন্তকুমারীও রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলো।

[তৃতীয় দৃশ্য]

নরেন্দ্রকে দেখা মাত্রই বীরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন এই মুহূর্তেই যেন নরাধম সম্মুখের জলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করে। নরেন্দ্র ধীরস্থীরভাবে জানতে চায়, কি তার অপরাধ। বীরেন্দ্র নিরুত্তর। অবশেষে মন্ত্রী উত্তর দিল যে, রানীর সতীত্বহানির অপরাধে যুবরাজের প্রাণদণ্ড

হয়েছে। নরেন্দ্র বিমূঢ় ও হতবাক। নরেন্দ্র পিতার পদস্পর্শ ক'রে অগ্নিতে প্রবেশ করার পূর্বে রেবতীর পত্রখানা পিতার হাতে দিলেন। বীরেন্দ্র পত্রখানা ছিন্ন করতে উদ্যত হলে মন্ত্রী নিষেধ করলেন। নরেন্দ্রের পশ্চাতে বসন্তকুমারীও স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলো। মন্ত্রীর অনুরোধে বীরেন্দ্র কি যেন মনে ক'রে পত্রখানা পাঠ করলেন। তখন রানীর দাসী মালতীর প্রতি রোষজর্জরিত লোচনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কার পত্র? একি সত্যি রেবতীর পত্র? মালতী সত্যি কথা বলাতে রাজা সব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি দ্বারা রেবতীকে হত্যা করলেন। স্ত্রীকে হত্যা ক'রে বীরেন্দ্র উন্মাদপ্রায় হয়ে অগ্নিতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

[নাটক এখানে শেষ হয়]

'বসন্তকুমারী নাটক' মশাররফের প্রথম নাট্য রচনা। প্রথম নাটক রচনায় মশাররফ যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের কলাকৌশল সম্পর্কে তার যথেষ্ট ধারণা ছিল। যদিও পাশ্চাত্য নাটক সম্পর্কে তাঁর কতটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই মূল সমস্যাটি উন্মোচিত হয়েছে। বীরেন্দ্রের মনে সংশয় ছিল, দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল; কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য মাত্র। বৃদ্ধবয়সে রাজা বিবাহ করবেন কি করবেন না এই দ্বন্দ্ব বীরেন্দ্রকে দীর্ঘক্ষণ যন্ত্রণা দেয়নি। তারপর নাটকের জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকল যখন বীরেন্দ্রের নব-পরিণীতা যুবতী স্ত্রী রেবতী রাজকুমার নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হলো, এবং তার প্রেম প্রত্যাখানের পরই রেবতী প্রতিশোধ নিল চরমভাবে। এই প্রতিশোধেরও চরম মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল।

নাটকটি আয়তনে ক্ষুদ্র, তবু অপরিহার্য ধরনের চরিত্রগুলিই এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে যথেষ্ট নাট্যিক ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রায় সবগুলি ঘটনাই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। তবে বসন্তকুমারীর স্বপ্নদর্শন, নরেন্দ্র কর্তৃক রেবতীর প্রেমপত্র প্রত্যাখ্যান, মঞ্চে দেখানো হয়নি।

এই নাটকের উপসংহারে চারটি মৃত্যু সংঘটিত হয়। অবশ্য শুধু এ জন্য 'বসন্তকুমারী নাটক'টিকে ট্রাজেডী বলা[১৪] যায় কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। তবে নাটকটিতে যে ট্রাজেডীর উপাদান বর্তমান সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নাই। রেবতী-চরিত্রে যে নাটকীয় উপাদান বর্তমান ছিল নাট্যকার সে সুযোগের

সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। রেবতীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে যথাযোগ্যভাবে বিকশিত করতে পারলে 'বসন্তকুমারী নাটকটি' হয়তো সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডীর কাছাকাছি একটি ট্রাজেডী হতে পারতো। মশাররফ হয়তো ট্রাজেডীই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাজেডী রচনার আদর্শ বা প্রেরণা তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তা জানা যাচ্ছে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মশাররফ সংস্কৃত নাটকের কিছু রীতিনীতি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে কোন ট্রাজেডীর অস্তিত্ব নাই।[১৫] তা হলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, মশাররফ সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বা মধুসূদন দত্তের নাটক থেকেই ট্রাজেডী রচনার প্রেরণা লাভ করেন। তদুপরি এমন কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যা থেকে প্রমাণ করা যায় যে, সেক্সপীয়ার কিংবা গ্রীক ট্রাজেডীর সঙ্গে মশাররফের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

'বসন্তকুমারী নাটক' একটি করুণ রসের নাটক। নাট্যকার স্থানে স্থানে হাস্যরস সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন। রাজার বিদূষক একটি হাস্যোজ্জ্বল চরিত্র, বিশুদ্ধ রসকৌতুক যোগানই তার ভূমিকা। যে মুহূর্তে তার ভূমিকা শেষ হয়েছে ঠিক সে মুহূর্তেই সে মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এরপর চরিত্র সৃষ্টির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে সবগুলি চরিত্রকে 'টাইপ' বলা যেতে পারে। এ নাটকে চরিত্র সৃষ্টি, চরিত্রের বিকাশ খুব বেশী ঘটেনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা একই রকম আচরণ করে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র একজন সৎ ও পিতৃভক্ত যুবক। বীরেন্দ্রও আগাগোড়া একজন নির্বোধ ব্যক্তি এবং রেবতীও প্রথম থেকেই ছলনাময়ী নারীরূপে নাটকে আবির্ভূতা হন।

প্রথমেই রেবতী চরিত্রের কথা ধরা যাক। রেবতী ছিল যুবতী। বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে তার পরিণয় একটি অসমবিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম থেকেই সে স্বামীকে প্রতারণা করছে। রাজা বীরেন্দ্রকে রেবতী মোটেই ভালবাসতে পারেনি; অথচ বীরেন্দ্রের সম্মুখে রেবতী দক্ষ অভিনেত্রীর মত পতিভক্তির অভিনয় করতো। আবার রাজার দৃষ্টির অন্তরালেই রেবতী অশ্লীল ভাষায় বীরেন্দ্রকে তিরস্কার করতো—বিদ্রূপ করতো। নরেন্দ্রের প্রতি রেবতীর প্রেম অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এ প্রেম যে সার্থক হবে না সে বোধও রেবতীর ছিল না। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রেবতী বিকৃতমনা নারীরূপে পরিণত হলো। প্রতিহিংসার নেশায় সে রাজার কাছে চরম অভিযোগ করে বসল। নরেন্দ্রের

মত একজন নির্দোষ যুবকের প্রাণনাশ হলো। নিরপরাধিনী আরও একটি নারীর জীবন বিনষ্ট হলো। শুধু নরেন্দ্রের মৃত্যু নয়, এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল রেবতী নিজেও ভোগ করল, নৃশংসভাবে সে-ও নিহত হলো রাজার তরবারির আঘাতে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মশাররফ রেবতীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। করতে পারলে নাটকটি হয়তো যথার্থ ট্র্যাজেডীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারতো।

নাটকে বীরেন্দ্রকে একজন শক্তিশালী ও সাহসী নৃপতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু নাটকের অভ্যন্তরে তাঁর সাহসিকতার এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজা বীরেন্দ্র ব্যক্তিত্ববিহীন একজন স্ত্রৈণপুরুষ, সর্বক্ষণ স্ত্রীকে বিশ্বাস করতো এবং তার মনোরঞ্জনই বীরেন্দ্রের প্রধান কর্তব্য ছিল। স্ত্রীর মন রক্ষার্থে রাজা রাজকার্যে অবহেলা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অপরিণামদর্শী রাজা তাঁর নিরপরাধ সন্তানকে হত্যা করে, ততোধিক নিরপরাধিনী পুত্রবধূকেও হত্যা করে। পরিণামে সে নিজেকেও হত্যা করেছে। বীরেন্দ্রের চরিত্রের উপযোগী কাজই শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র করলো।

নরেন্দ্র এবং বসন্তকুমারী দু'জনাই আদর্শ যুবক ও যুবতী তথা স্বামী-স্ত্রী। মানবিক কোন দোষ-ত্রুটি এদের নেই। কোন দ্বিধা-সংশয়ও যেন তাদের নেই। ফলে এই চরিত্র দু'টি যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়। তবে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ইউরোপীয় নাটকের অনুসরণে যে চরিত্র সৃষ্টি তা তৎকালীন বাংলা নাটকে একেবারেই অনুপস্থিত এবং সে ধরনের চরিত্র সৃষ্টি বিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটকে পাওয়া যাবে।[১৬] সে যাইহোক, মশাররফের প্রথম নাটক রচনা সার্থক বলা যায়। কেননা উনিশ শতকের শেষ পাদে রেবতীর মত একটি চরিত্র সৃষ্টি বাঙলা নাটকে বড় বেশী একটা দেখা যায় না।

জমিদার দর্পণ

মশাররফ রচিত দ্বিতীয় নাটক 'জমীদার দর্পণ' ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১৭] পরবর্তীকালে এই নাটকের কোন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি, অন্ততঃ লেখকের জীবদ্দশায় কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ মশাররফের মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পরে ঢাকা থেকে এই নাটকের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১৮]

এই নাটকের উপাখ্যানে তৎকালীন বাঙলার জমীদারদের জীবন চিত্রিত হয়েছে। নাটকের নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, এ নাটক জমীদারদের 'প্রতিচ্ছবি'। এই সমস্ত অর্থবান ব্যক্তিরা অসৎকার্যে নিজেদের অর্থ ও সময় ব্যয় করতো। বাঙলা সাহিত্যে অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায় একযুগ আগের টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মধুসূদন দত্তের লেখনীতে।[১৯] মধুসূদন বা টেকচাঁদ ঠাকুরের পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির অধিকাংশই ছিল অমুসলমান, খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান চরিত্রই তাঁরা অঙ্কিত করেছিলেন। যদিও যে সমাজে তারা বসবাস করতো সেটি ছিল মিশ্রিত সমাজ। অপরপক্ষে মশাররফ প্রধানতঃ মুসলমান সমাজের চিত্রই এ নাটকে অঙ্কিত করেছেন। নাটকের নামকরণে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে 'জমীদার দর্পণে'র সাদৃশ্য রয়েছে যথার্থ। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে 'জমীদার দর্পণে'র একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—'নীলদর্পণে' বিদেশী অত্যাচারী নীলকরদের সমালোচনা করা হয়েছে, আর 'জমীদার দর্পণে' এদেশী অত্যাচারী জমীদারদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। নাটকের ভূমিকায় (উপহার) লেখক বলেছেন, "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়স্বজন সকলেই জমীদার; সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন।" [পাঠকগণ সমীপে নিবেদন।] মশাররফ এই নাটকটি তার জ্ঞাতিভ্রাতা পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীকে উৎসর্গ করেন। মশাররফের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে[২০] এই নবাব মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে বিস্তারিত নানা কাহিনী পাওয়া যায়। উক্ত উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (উপহার) মশাররফ লিখেন, "আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি-বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্যন্ত অন্তরের সহিত ভালবাসিতেছেন। সামান্য উপহারস্বরূপ আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় 'জমীদার দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই প্রার্থনা।" উক্ত উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় তিনি আরও লেখেন যে, "অনেক শত্রু দর্পণখানি ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত হ'তেছে।" মশাররফ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু বলেননি। তাঁর শত্রু কে বা কারা ছিলেন সে সম্পর্কে মশাররফ কোন ইঙ্গিত দেননি। তবে তার মন্তব্য থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এ নাটক লেখার

ব্যাপারে কেউ কেউ তাকে বাধা দিয়েছিল।

এই নাটকের কাহিনীর উৎস সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা না গেলেও এটা অনুমান করা যায় যে, কোন সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করেই মশাররফ এই নাটকটি রচনা করেছেন। প্রস্তাবনায় সূত্রধরের উক্তি থেকে এবং লেখকের শত্রুর উল্লেখ থেকে এ অনুমান সহজেই করা যায়।

নাটকের শুরুতে রয়েছে 'প্রস্তাবনা' এবং শেষে রয়েছে 'উপসংহার'। এ নাটকে তিনটি অঙ্ক এবং প্রতি অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর মঞ্চে উপস্থিত হবে এবং দেশে জমীদারদের অত্যাচার সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করবে। যেহেতু দেশের শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ জমীদারদের হাতে প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ভার অর্পণ করেছে, সেজন্য জমীদারদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষক প্রজাদের ধনসম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমীদাররা দরিদ্র কৃষকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করে। বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে এ ধরনের জুলুম বিভিন্ন রকমে আত্মপ্রকাশ করে। উক্ত 'প্রস্তাবনা' অংশে একজন 'নট' উপস্থিত হবে এবং সূত্রধরের মতামতকে সমর্থন করবে। কিন্তু সে বিশেষ কোন এক জমীদারের নানা কুকীর্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে। সূত্রধর উক্ত জমীদারকে এক প্রকার জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে বলে যে, "আপনি শুনেন নাই—'জমীদার দর্পণ' নাটকে যে নক্সাটি আঁকা হয়েছে তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।" তারপর মঞ্চে জনৈকা 'নটী'র আবির্ভাব ঘটবে। নট ও নটী দু'জনে একটি সমবেত সঙ্গীত গাইবে। উক্ত সঙ্গীতে নাটকের বিষয়বস্তুটি অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়। তাদের প্রস্থানের পর নেপথ্যে একটি সঙ্গীত গীত হয়।

নাট্যকার 'দৃশ্য' শব্দের পরিবর্তে 'গর্ভাঙ্ক' ব্যবহার করেছেন।

নাটকের গল্পাংশ এইরূপ :

[প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য]

কোশলপুরের জমীদার হায়ওয়ান আলী সদাসর্বদা তার মোসাহেবদের সঙ্গে নানাবিধ অপকর্মের পরামর্শ করতো। গ্রামের দরিদ্র চাষী আবু মোল্লার সুন্দরী যুবতী-স্ত্রী নুরুন্নেহারের[২১] প্রতি জমীদারের কুনজর পড়ে। তাকে পাওয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে হায়ওয়ান আলী পেয়াদা পাঠিয়ে আবু মোল্লাকে বেঁধে

নিয়ে আসার পরামর্শ করে। এই কৌশলে যদি নুরুন্নেহারকে জমীদারের বাড়ীতে আনা যায়, এই হলো জমীদারের অভিপ্রায়।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

আবু মোল্লাকে ধরে আনার জন্য দু'জন পেয়াদা যায়। মোল্লা পেয়াদাকে কিছু উৎকোচও দেয়। তাতেও সে রেহাই পায় না।

[তৃতীয় দৃশ্য]

মোল্লাকে হায়ওয়ান আলীর সামনে ধরে নিয়ে এলে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমণি নামে জনৈকা বৈষ্ণবীকে নুরুন্নেহারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ প্রথম দৃশ্য]

নুরুন্নেহার তাহার স্বামীর বন্দী হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। পঞ্চাশ টাকা দিতে পারলেই তার স্বামীর মুক্তির সম্ভাবনা। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা দেওয়া নুরুন্নেহারের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এদিকে কৃষ্ণমণি প্রথমে নুরুন্নেহারের প্রতি নানাবিধ সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা-বাক্য শোনায়। পরে বলে যে, জমীদার হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহারের প্রেমে উন্মাদ। যদি নুরুন্নেহার গোপনে রাত্রিতে হায়ওয়ান আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে তার স্বামীর মুক্তি সম্ভবপর। কৃষ্ণমণির এমন অশোভন প্রস্তাব নুরুন্নেহার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে। কৃষ্ণমণি প্রস্থানের পূর্বে তাকে এহেন প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহারের প্রত্যাখ্যানের সংবাদে ক্রোধে অগ্নিসর্মা হয়ে উঠে এবং দু'জন পেয়াদা পাঠিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ নুরুন্নেহারকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে আসার জন্য।

[তৃতীয় দৃশ্য]

লম্পট জমিদার হায়ওয়ান আলীর শয়নকক্ষে নুরুন্নেহারকে ধরে নিয়ে আসা হলো। অন্তঃসত্ত্বা নুরুন্নেহারের উপর পাশবিক অত্যাচার করার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে নুরুন্নেহার ভারতের সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন করে। প্রসঙ্গক্রমে হায়ওয়ান আলীর জনৈক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে আলীকে এই কুকর্মের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করে, কেননা তার এই কুকর্ম তার পূর্বপুরুষের মুখে কলঙ্ক অবলেপন করেছে। নুরুন্নেহারের মৃতদেহটি চুপিসারে মোল্লার বাড়ীর কাছে এক বাগানের মধ্যে ফেলে রাখা হলো।

[তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য]

মোল্লা কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু বাগানে তার স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। পরে পুলিশে সংবাদ দিলে কনস্টেবলরা এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

বিলাসপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলার প্রাথমিক শুনানী হয়। মোল্লার উকিল আসামী আলীর পূর্বকৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করে তাকে গুরুতর দণ্ডের আবেদন জানালে মামলা দায়রা-জজের আদালতে স্থানান্তরিত হয়।

[তৃতীয় দৃশ্য]

জজ-আদালতে মামলা চলাকালে হায়ওয়ান আলী নিজে উপস্থিত থাকলো না। তার পক্ষে দুইজন সাক্ষী আলীর গুণাবলীর প্রশংসা করে এবং মৃতা নুরুন্নেহারের অসৎ চরিত্রের কথা উল্লেখ করে। জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত রিপোর্ট দেন। "আমার নাম এফ. বি. কানিংহাম, বয়স ৭২ বৎসর। আমি বেনসাফ জেলার জেনারেল সার্জন। আমি ধর্মশালা থানার বড় দারোগা কর্তৃক প্রেরিত আনুমানিক বিশ বৎসর বয়স্কা নুরুন্নেহার

নাম্নী জনৈকা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকের মৃতদেহের ময়না-তদন্ত করেছি। তার যৌন অঙ্গ ভিন্ন অন্য স্থানে বাহ্যিক আঘাতের কোন চিহ্ন নাই। ফুসফুসে অত্যধিক শ্লেষ্মা জমেছে। মনে হয় মস্তিষ্কের অধিক রক্তক্ষরণজনিত কারণে এর মৃত্যু ঘটেছে।"[২২]

আলী বেকসুর খালাস পায়।

নাটকের শেষ এখানেই।

উপসংহারে নট-নটী পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং ভারতের সম্রাজ্ঞীর নিকট ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন করে। আবু মোল্লাও পুনরায় মঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং জমীদার যে তার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ফেলেছে সে সংবাদ পরিবেশন করে। পরিশেষে নট ও নটী ঈশ্বরের নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে।

এই নাটকের কাহিনীতে নাটকীয় উপাদান বড় বেশী একটা নাই। এ কাহিনী উপন্যাসাকারেও প্রকাশ করা যেত। পাপের জয় ও দুর্বলের উপর অত্যাচার এই কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। এই নাটকের দ্বন্দ্ব হচ্ছে একান্তই বাহ্যিক, এবং সেক্ষেত্রেও এ নাটকের দু'টি শক্তির মধ্যে একপক্ষ অত্যন্ত প্রবল এবং অন্যপক্ষ অত্যন্ত দুর্বল। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এ নাটকে নাট্যিক ক্রিয়ার অভাব নাই। নুরুন্নেহারের উপর বলাৎকারের দৃশ্য বাদে অন্যান্য সব ঘটনাই মঞ্চে সংঘটিত হয়। মনে হয় নাট্যকারের ট্রাজেডী রচনার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু যেহেতু ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক নাট্যকলা সম্পর্কে মশাররফের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় তিনি ট্রাজেডী সৃষ্টিতে সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। 'জমীদার দর্পণ' নাটক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর নয়, কিন্তু এটি বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। কেননা এ নাটকটিতে বিগত শতাব্দীর সপ্তম বা অষ্টম দশকের বাংলাদেশের সমাজের একটি জীবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে।

চরিত্রচিত্রণ এ গ্রন্থের একটি দুর্বল বিষয়। নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই টাইপ বা 'বিশেষ ঢং'-এর; নাটকের অগ্রগতি বা বিকাশে এ চরিত্রগুলি বিকশিত বা সৃষ্ট হয়নি। যারা পাষণ্ড বা খল তারা ধনী, অর্থবান প্রতিপত্তিশালী আর অসৎ এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাই থেকে যায়। যারা দরিদ্র তারা সৎ এবং দুর্বল ও অত্যাচারিত; তাদেরও নাটকে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

হায়ওয়ান আলী নামটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এর অর্থ জন্তু বা হিংস্র জানোয়ার। অর্থাৎ তার স্বভাবটিও জানোয়ার সদৃশ। হায়ওয়ান

অর্থবান কিন্তু কুচক্রী জমীদার। সে কপট কেননা সে নামাজেও অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু তার লালসা বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য যে নারীকে তার পছন্দ, তাকে তার চাই-ই। তার উপর বলাৎকার করা তার পক্ষে কোনরূপ অসম্ভব নয়। তার মোসাহেবরাও জানোয়ার সদৃশ। তারাও হায়ওয়ান আলীর পাপকর্মের সঙ্গী এবং তার অর্থের উপর নির্ভর করতো।

সিরাজ হায়ওয়ান আলীর ভাই। সে যেন সমাজের বিবেক সদৃশ। সিরাজ নুরুন্নেহারের উপর অত্যাচারের মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু সে এমন কিছু করে নাই যাতে আবু মোল্লার উপর যে অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে তার কোন বিচার হয়। নাটকে তার আবির্ভাব মাত্র একবারের জন্য। এ যেন 'আলালের ঘরের দুলালের' নায়কের ধার্মিক ভ্রাতার মতই প্রভাব প্রতিপত্তিহীন। ডাক্তার কানিংহাম একটি কৌতুক চরিত্র। তার রিপোর্ট ইংরেজীতে—আবার ভুল ইংরেজীতে লেখা। মেডিক্যাল রিপোর্ট হিসাবে এটি অর্থহীন বা পাগলের প্রলাপোক্তি মনে হয়।

আবু মোল্লা বা নুরুন্নেহার এই দুই চরিত্রেও কোন দৃঢ়তা লক্ষিত হয় না। আবু মোল্লা দুর্বল ও দরিদ্র এবং অত্যাচারিত হওয়ার জন্যই যেন সে পৃথিবীতে এসেছে। নুরুন্নেহারও দরিদ্র অথচ রূপবতী এবং কামুক জমীদারের লালসার শিকার। তারা কেউ নিজেদের বাঁচাবার মত শক্তিশালী নয় এবং সেহেতু তারা কষ্ট করেছে ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এই সমস্ত কারণে তাদের যথেষ্ট সজীব মানুষ বলে বিবেচনা করা যায় না।

এরপর উল্লেখ করা যায়, অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কয়েকটি চরিত্রের কথা। এরা হলো কৃষ্ণমণি, হরিদাস, জিতু মোল্লা। এরা সবাই খল চরিত্রের এবং কপটতা, ভণ্ডামি ও স্বার্থসিদ্ধিই এদের জীবনের সর্বস্ব।

এ নাটকের ভাষা গদ্য হলেও কয়েকটি কবিতা এতে সংযোজিত হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে দশটি সঙ্গীত এই নাটকে সংযোজিত হয়েছে। সঙ্গীতগুলি নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি যেন শ্রোতাদের অনুভূতিকে জাগ্রত ক'রে নাটকে করুণ রসের সঞ্চারের জন্যই সংযোজিত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

[১] এ দু'টি নাটক ছাড়াও মশাররফ আরও দু'টি গীতিনাট্য এবং একাধিক প্রহসন রচনা করেছিলেন। সম্প্রতি শিকাগো থেকে 'এর উপায় কি?' শীর্ষক প্রহসনটির কপি পাওয়া গেছে। এটি একটি একাঙ্কিকা। মোট চারটি দৃশ্যে এটি সমাপ্ত। রাধাকান্ত নামে এক অর্থবান বিবাহিত যুবক নয়নতারা নাম্নী জনৈকা রূপোপজীবিনীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী মুক্তকেশী তার সখী রাইমণির সাহায্যে তার স্বামীকে পুনরায় ফিরে পায়। রাধাকান্তেরও চৈতন্যলাভ হয়। এ জাতীয় বিষয় নিয়ে সে যুগে আরও অনেক প্রহসন রচিত হয়।

[২] তারাচরণ শিকদার : ভদ্রার্জুন (১৮৫২)
জি. সি. গুপ্ত : কীর্তিবিলাস (দুষ্প্রাপ্য পুস্তক), ১৮৫২
রামনারায়ণ তর্করত্ন : কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৭)
মধুসূদন দত্ত : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ; পদ্মাবতী (১৮৬০) ; কৃষ্ণকুমারী (১৮৬৫) ; একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬৫) ; বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা (১৮৬৫)
দীনবন্ধু মিত্র : নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬০), সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে-পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৭২)
মনোমোহন বসু : রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭) ; প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯) ; সতী নাটক (১৮৬৯)।

[৩] P. Guhathakurata, *The Bengali Drama, its Origin and Development*, London, 1930. "revolted against the classical tradition of Sanskrit dramas, his revolt was more in spirit than in form." p. 75.

[৪] গদ্যে পদ্যে রচিত কিছু ক্ষুদ্র নাটিকা, প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায় মুন্সী নামদার গোলাম হোসেন এবং আজিমুদ্দিনের রচনায়। যদিও সাহিত্যিক মান বিচার করলে এগুলি একেবারেই তুচ্ছ, তথাপি ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলির একটা মূল্য রয়েছে। নামদারের রচনা 'কলির বউ হাড়জ্বালানী' শ্বাশুড়ী এবং পুত্রবধূর কলহ নিয়ে লেখা। 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা', বনের রাজত্ব নিয়ে পশুদের কলহ। এগুলি অত্যন্ত স্বল্প আয়তনের পুস্তক।

[৬] দ্বিতীয় সংস্করণ, বসন্তকুমারী নাটক প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে। গ্রন্থটি ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণের একখণ্ড রাজশাহী বরেন্দ্র মিয়জিয়ামে রক্ষিত আছে; এ সংবাদ সরবরাহ করেন শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী। দ্বিতীয় সংস্করণে সামান্য পরিবর্তন আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি দৃশ্য অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের বাংলা সন অনুযায়ী তারিখ হচ্ছে ১৫ মাঘ, ১২৭৯।

[৬] প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে এই লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

[৭] 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরি সেতু' নামক একটি পুস্তক 'বসন্তকুমারী নাটকে'র মাসখানেক আগে ছাপা হয়। প্রকাশকাল ১৫ই পৌষ, ১২৭৯; প্রকাশক শ্রী আজিজদ্দীন মহম্মদ পারনন্দ আলী। তা হলে মশাররফের প্রকাশিত দ্বিতীয় পুস্তক হয় 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরি সেতু', প্রথম পুস্তক 'রত্নবতী'। এমনও হতে পারে 'বসন্তকুমারী নাটক'টি আগে লেখা হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল পরে।

[৮] সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪২।

[৯] সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, 'বঙ্গীয় সমাজ', কলিকাতা, ১৮৯৯, পৃঃ ৪৩৬।

[১০] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৪। এ প্রসঙ্গে বাংলার লোক-কাহিনী 'বিজয়-বসন্ত' বা 'শীত-বসন্ত' উল্লেখযোগ্য। বিমাতা কর্তৃক সতীনপুত্রের লাঞ্ছনা, বাংলার লোক-কাহিনীর জনপ্রিয় বিষয়।

[১১] 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৭ (মুনীর চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ, পৃঃ ২৯-৩৯)। ফরাসী নাট্যকার Racine-এর Phaydre নাটকে অনুরূপ একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তবে Racine কর্তৃক মশাররফ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না। কেননা মশাররফ ফরাসী ভাষা জানতেন না এবং Phaydre-এর ইংরেজী অনুবাদও পড়েছিলেন বলে মনে হয় না।

[১২] আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১।

[১৩] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে (লণ্ডন) উক্ত গ্রন্থের একটি খণ্ড আছে।

[১৪] ট্রাজেডীর ধরনটি পশ্চিম থেকে এসেছে। গ্রীক ট্রাজেডীতে মানুষ দৈবশক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়েছে। আর সেক্‌সপীয়ার রচিত ট্রাজেডী-

গুলির বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। শুধু মৃত্যুই ট্রাজেডীর লক্ষণ নয়। মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সংঘাত, যে দ্বন্দ্ব তা-ই মানুষের জীবনকে ট্রাজেডীতে পরিণত করতে পারে। সেক্‌সপীয়ারের নাটকে ট্রাজেডীর এই স্বরূপ। ইবসেন বা তৎপরবর্তী যুগে মৃত্যু আদৌ ট্রাজেডীর কোন লক্ষণই নয়। জীবনের মধ্যে যে বেদনা, যে অতলস্পর্শী যন্ত্রণা, তাই মানুষের জীবনকে ট্র্যাজেডীতে পরিণত করতে পারে।

[১৫] "The Sanskrit drama is a mixed composition in which the joy is mingled with sorrow, in which the jester usually plays a prominent part, while the hero and heroine are often in depths of despair. But it has never sad ending." A. A. MacDonell, *A History of Sanskrit Literature*, London, 1899, p. 343.

[১৬] বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম এ ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চরিত্র সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শাজাহান' (১৯০৯) নাটকে। এখানে মোগল সম্রাট শাহজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

[১৭] গ্রন্থের প্রকাশকাল চৈত্র, ১২৭৯ বাংলা সন।

[১৮] 'জমিদার দর্পণ', সম্পাদনা আশরাফ সিদ্দিকী, ঢাকা, ১৯৫৫।

[১৯] (ক) টেকচাঁদ ঠাকুর, 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭)।

(খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতুম প্যাঁচার নক্‌সা', ১৮৬০। অবশ্য সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'হুতুম প্যাঁচার' লেখক হলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(গ) মধুসূদন দত্ত, 'একেই কি বলে সভ্যতা', ১৮৬০, ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)।

[২০] 'আমার জীবনী', সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৮০-১৯৮।

[২১] মূল পুস্তকে (১ম সংস্করণ) 'নুরুন্নেহা' মুদ্রিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি মুদ্রণ-প্রমাদ।

[২২] "My name is F. B. Cunnigham ; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the post-mortem examination of the body of Norren-Nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the

Officer-in-charge of Dharmasala Police Station. No marks of external violence except on the genital, profuse discharge of blood from the said part ; the lungs highly congested on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed all other organs found healthy. In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain." তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ।

পঞ্চম অধ্যায়

পরবর্তী গদ্য রচনা

(ক) 'বিষাদ সিন্ধু'

মশাররফ রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটি তিন খণ্ডে (পর্ব) পৃথক পৃথকভাবেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড 'মহররম' পর্ব ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ; দ্বিতীয় খণ্ড 'উদ্ধার পর্ব' ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তৃতীয় খণ্ড 'এজিদ বধ পর্ব' ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

পুস্তকটির ভূমিকায় মশাররফ বলেছেন যে, আরবী ও ফার্সী পুস্তক থেকে এ গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত আরবী ফার্সী গ্রন্থের কোন নামের তালিকা দেননি। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি এজিদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যুই এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য।

'মহররম পর্বে' মোট ২৭টি অধ্যায়। প্রথমটি অবশ্যই উপক্রমণিকা। 'উদ্ধার পর্বে' রয়েছে ৩০টি অধ্যায় এবং 'এজিদ বধ পর্বে' রয়েছে মাত্র ৫টি অধ্যায়। পুস্তকের নাম 'বিষাদ সিন্ধু'র সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে লেখক অধ্যায়গুলির নাম দিয়েছেন 'প্রবাহ'।

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণ লেখক উৎসর্গ করেছিলেন করিমন্নেসাকে। এ করিমন্নেসা ছিলেন দেলদুয়ারের (টাঙ্গাইল) জমীদার। এবং মশাররফ দেলদুয়ারের জমিদারের ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

করিমন্নেসাকে লেখক যে উৎসর্গ-পত্রটি লিখেছিলেন তা পরবর্তী কোন সংস্করণে আর পুনুর্মুদ্রিত হয়নি।[২] উৎসর্গ-পত্রটি এরূপ :

পূজনীয়া—
শ্রীমতী করিমন্নেসা খাতুন
সমীপে

মাত।

যদিও আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান নহি, কিন্তু সোদরোপম আবদুল করিম ও আবদুল হালিম অপেক্ষা আমার প্রতি কোন অংশেই কোনদিন আপনার স্নেহ-মমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখি নাই। সন্তানের উপার্জিত অর্থ অনেক মাতাই আশা করিয়া থাকেন। যদিও মা, আপনার সে আশা নাই, জীবনে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ, তথাচ আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি তাহা আজ আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম। দুঃখী সন্তানের প্রদত্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। 'বিষাদ সিন্ধু' আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে।

চির আজ্ঞাবহ দাস
মীর মোশাররফ হোসেন।

'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় একটি দৈববাণী ঘোষিত হয় যা হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে তথা তাঁর শিষ্য মাবিয়াকে বিচলিত করেছিল। স্বর্গীয় দূত (ফিরিশ্‌তা) জিব্রাইল হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে বলে যান যে, তার প্রিয় শিষ্য মাবিয়ার পুত্র কর্তৃক তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হত হবে। এই দৈব ঘোষণা শুনে হজরত বিষণ্ন হয়ে যান। মাবিয়া যখন কারণানুসন্ধান ক'রে দৈববাণীটি জানতে পারেন, তিনিও তখন বিব্রত বোধ করেন। মাবিয়া তখন পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তিনি যদিও প্রতিজ্ঞা করেন যে, দার-পরিগ্রহ করবেন না, কিন্তু দৈবচক্রে তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এবং মাবিয়ার সন্তান এজিদই পরবর্তীকালে হজরতের দৌহিত্রদ্বয়কে হত্যা করে। মাবিয়া দামেস্কের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং এজিদও সেখানে প্রতিপালিত হতে থাকে। আর এদিকে হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর কিছুকাল পরে হজরত আলীও মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং হজরত আলীর প্রথম সন্তান হাসান মদিনার শাসক পদে নিযুক্ত হন।

পরবর্তী সংস্করণে এই অধ্যায়টি একটু অন্যভাবে রচিত হয়েছিল। কোন এক ঈদের দিনে হযরত মোহাম্মদের কাছে তাঁর দুই দৌহিত্র নূতন পোশাকের

আবদার করে। হাসান সবুজ রঙের পোশাক এবং হোসেন লাল রঙের পোশাক পছন্দ করে। ঠিক ঐ মুহূর্তেই জিব্রাইল উপস্থিত হয়ে দৈববাণী করে যে, হাসান বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করবে এবং হজরতের এক শিষ্যের সন্তানই হোসেনকে হত্যা করবে। এবং এই লাল রং ও সবুজ রঙের তাৎপর্যটি জিব্রাইলের দৈববাণীর ফলেই বোধগম্য হয়। এই পর্বের অবশিষ্ট অধ্যায়-গুলিতে হোসেনের মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের কাহিনীর কিছু পরিবর্ধন লেখক করেছিলেন। যেমন অষ্টম সংস্করণ থেকে দেখা যায়, মোসলেমের দুই পুত্রের কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। পুস্তকের শেষে একটি উপসংহার আছে, যেখানে বলা হয়েছে, পাপীরা পরিণামে শাস্তি পাবে এবং দৈবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না।

'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী মশাররফের লেখনীতে নিম্নরূপ :

দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদ জয়নাব নাম্নী জনৈকা বিবাহিতা মহিলার প্রেমাসক্ত হয়। এজিদ জয়নাবকে না পেলে আত্মবিসর্জন করবে—পিতাকে এমন হুমকিও দেখায়। এজিদের মাতা তার পুত্রের পক্ষ নিয়ে মন্ত্রী মারওয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে জয়নাবের স্বামীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রী-পরিত্যাগে বাধ্য ক'রে। জয়নাবকে বিবাহের অভিপ্রায়ে এজিদ এক দূতকে প্রেরণ করে। কিন্তু জয়নাব হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র হাসানকে পতিত্বে বরণ করেন। এ সংবাদ পেয়ে এজিদ দারুণ ক্রুদ্ধ হয় এবং হাসানকে নির্মূল করতে দৃঢ়সংকল্প হয়। মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করে। এজিদ রাজদণ্ড হাতে নিয়ে হাসানকে বশ্যতা স্বীকার করতে দাবী জানায় এবং সমগ্র দেশে তার নামে শুক্রবারের নামাজান্তে খোতবা পাঠ করা হোক, এই আদেশ জারী করে। হাসানের শিষ্যগণ এজিদের এ নির্দেশ অত্যন্ত অপমানজনক মনে করেন। এজিদের আদেশনামা তার প্রেরিত দূতের সম্মুখেই ছিন্ন করে ফেলা হয়। এ সংবাদ পেয়ে এজিদ মদিনা আক্রমণ করে কিন্তু হাসানের শিষ্যগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এজিদের সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। সম্মুখ যুদ্ধে এজিদ সাফল্য লাভ করতে পারবে না ভেবে অন্য কৌশলে হাসানকে বিনষ্ট করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।

এজিদের মন্ত্রী মারওয়ান মদিনায় মায়মুনা নাম্নী এক বৃদ্ধা নারীর সহায়তায় হাসানের পারিবারিক জীবনের মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। হাসান জয়নাবকে বিবাহ করার পর থেকেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদার সঙ্গে

তাঁর ভুল বুঝাবুঝি চলছিল। জায়েদাকে মায়মুনা নানা প্রকার প্রলোভন—এমনকি দামেস্কের রাজরানী হওয়ারও প্রলোভন দেখিয়ে হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করে। প্রথমে জায়েদা এমন ভয়াবহ প্রস্তাবে অসম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হন এবং জায়েদার বিষপানে হাসানের মৃত্যু ঘটে। সবার অলক্ষ্যে জায়েদা এজিদের রাজদরবারে পুরস্কারের আশায় গিয়ে মৃত্যু-দণ্ড লাভ করে। হাসানের মৃত্যুর পর মারওয়ানের পরবর্তী কাজ হলো কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে হত্যা করা। হোসেন তখন হজরত মোহাম্মদের পবিত্র সমাধি মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। গোপনে মারওয়ান ঐ সমাধি মন্দিরে গিয়ে হোসেনকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেয়, কেননা এজিদের সেনাবাহিনী শীঘ্রই ঐ স্থান আক্রমণ করবে। হোসেন নিজেও বিশ্বাস করতো যে, তাঁর মৃত্যু ঘটবে কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোসেন হজরতের সমাধিস্থল পরিত্যাগ করে। কুফার শাসনকর্তার আমন্ত্রণে হোসেন কুফা অভি-মুখে রওয়ানা হন। পূর্বাহ্ণে হোসেন মোসলেম নামে একজন দূতকেও কুফায় প্রেরণ করেন। কুফায় যাওয়ার পথে ভুলক্রমে হোসেন এবং তাঁর অনুচরবর্গ কারবালার দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে এজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক হোসেন ও তাঁর পরিবার ও সঙ্গীরা বাধাপ্রাপ্ত হন। এজিদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে অবশ্য হোসেন-বাহিনী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হোসেনের সঙ্গীরা পরাজিত হন। এদিকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই হোসেনকন্যা সখিনাকে হাসানপুত্র কাসেম বিবাহ করে। কাসেমও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে। সবশেষে হোসেন নিজেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং সীমার কর্তৃক নিহত হন। হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে সীমার উর্ধ্বশ্বাসে দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়।

মহররম পর্ব এখানেই শেষ।

উদ্ধার পর্ব বা দ্বিতীয় খণ্ডে হোসেন-পরিবারের অন্যান্য লোকজন কিভাবে রক্ষা পায় এবং হানিফা কর্তৃক কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হলো তারই বর্ণনা পাওয়া যায়।

পথিমধ্যে সীমার হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে আজর নামে এক অমুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং আজর পরিবারের সবাইকে হত্যা ক'রে হোসেনের কর্তিত মস্তক নিয়ে সে দামেস্কে ফিরে আসে।

এজিদ এই খণ্ডিত মস্তক নিয়ে হোসেনের স্ত্রী জয়নাব, ছেলে জয়নাল আবেদীন ও কনিষ্ঠা কন্যাকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। এমন সময় সবার

সম্মুখে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। হোসেনের খণ্ডিত মস্তক মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি দৃশ্যে লেখক সমস্ত নবীদের এনে উপস্থিত করেন।

এজিদ জয়নাল আবেদীনকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জয়নাল আবেদীন বশ্যতা স্বীকার না করাতে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হানিফা ছিলেন আম্বাজের অধিপতি। তিনি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হন। মদিনাবাসীদের তিনি এজিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হানিফার বীরত্বের সামনে কেউ দাঁড়াতে সাহস করল না। একে একে এজিদের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা মৃত্যুবরণ করতে থাকলো। সীমার, ওতবে অলীদ, মারওয়ান এরাও হানিফার হাতে মৃত্যুবরণ করে। হানিফা দামেস্ক আক্রমণ করলে জয়নাল আবেদীন বন্দীখানা থেকে মুক্ত হয়ে হানিফার সঙ্গে মিলিত হয়। হানিফা এবং জয়নাল দু'জনা তখন এজিদকে জীবন্ত বন্দী করার জন্য তার রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসব হয়। হানিফার ভয়ে এজিদ পলায়ন করে। এই পর্যন্ত উদ্ধার খণ্ডের কাহিনী।

তৃতীয় খণ্ড হচ্ছে 'এজিদ বধ পর্ব'। এখানে বন্দীশালায় বন্দীদের দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। হানিফা দামেস্ক শহরে প্রবেশ করলে সব প্রহরীরা পলায়ন করে। এই অবসরে সবাই বের হয়ে পড়ে। হোসেন-পরিবারের লোকজনদেরও উদ্ধার করা হলো। হানিফা এজিদের সন্ধানে তার রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে। কিন্তু এজিদ ভূ-গর্ভস্থ এক গৃহে আশ্রয় নেয়। হানিফা তাকে আর খুঁজে পায় না। এক দৈববাণীতে হানিফাকে বলা হয়, এজিদ তার বধ্য নয়। এবং হানিফা বহু নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকে ঐখানে দুই পাহাড়ের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। এজিদও ঐ মাটির নীচে এক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জলবে।

তারপর উপসংহারে লেখকের মন্তব্য যে, পাপীরা পরিণামে শাস্তি পাবে।

'বিষাদ সিন্ধু'র ঐতিহাসিক পটভূমিকা

'বিষাদ সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রগুলো সবই ঐতিহাসিক। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র হোসেনের হত্যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই গ্রন্থে কিছু উপকাহিনী

আছে, যেগুলো যথার্থ ঐতিহাসিক নয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন যে, তিনি এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলো আরবী এবং ফারসী পুস্তক থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মশাররফ সে-সব গ্রন্থগুলির নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। ঐ ভূমিকার শেষে মশাররফ উল্লেখ করেছেন যে, মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদে রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার মাননীয় হাফিজ খলিলর রহমান আবু যায়গম সাবের সাহেব তাকে সাহায্য করেছেন।[৩]

কারবালা প্রান্তরে হোসেনের মৃত্যুর পর কালক্রমে পারস্যে, আরবদেশে, ইরাকে, লেবাননে, সিরিয়ায় এমনকি ভারতবর্ষেও অনেক কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়। পারস্য, ইরাক, সিরিয়া এবং আরবের বিশেষ করে শিয়া কবিগণ এজিদের সঙ্গে হাসান-হোসেনের সংঘর্ষের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে কয়েকজন পারস্যদেশীয় কবি এই বিষয়টি নিয়ে কাব্য রচনা করেন।[৪] অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ভারতে উর্দু সাহিত্যেও হাসান-হোসেনের মৃত্যুকাহিনী নিয়ে শোক-কাব্য বা মর্সিয়া রচিত হয়।[৫] এমনকি আরবী সাহিত্যেও ফারাজাদকের মত কবি এই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন।[৬]

এমন ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে, মশাররফ 'বিষাদ সিন্ধু' রচনায় এই সমস্ত সাহিত্য গ্রন্থগুলি অনুসরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ তিনি আদৌ দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। প্রসিদ্ধ আরবী ঐতিহাসিক তাবারী, ইয়াকুবী, মাসুদী, এদের রচনায় হাসান ও হোসেনের জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিট্টি, মুইর, আমীর আলী প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে হাসান ও হোসেনের সঙ্গে এজিদের সংঘর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায় এখানে তা-ই লিপিবদ্ধ করা হলো।

মু'য়াবিয়া বা মাবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তখন হজরত আলী ছিলেন খলিফা এবং তাঁর রাজধানী ছিল কুফায়। ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে দামেস্কে মাবিয়া নিজেকে মুসলিম জগতের খলিফা বা প্রধান বলে ঘোষণা করেন।[৭] হজরত আলী নিহত হওয়ার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে ইরাকের অধিবাসীরা কুফায় মুসলিম জগতের খলিফা বলে ঘোষণা করেন।[৮] কিন্তু হাসান অত্যন্ত দুর্বলপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং অন্যদিকে মাবিয়া ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং শক্তিশালী পুরুষ। শেষ পর্যন্ত মাবিয়ার কাছে হাসান নতি-স্বীকার করেন এবং সিংহাসন ত্যাগ ক'রে মদিনায় আশ্রয় নেন।[৯] মাবিয়া

হাসানকে একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন। কিছুকাল পরে হাসান সম্ভবতঃ বিষপ্রয়োগের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সম্ভবতঃ পারিবারিক কোন ষড়যন্ত্রের ফলেই এটা হতে পারে।[১০] আবার এমন বিবরণও পাওয়া যায়, যাতে ক্ষয়-রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল বলে সন্দেহ করা হয়।[১১] মাবিয়ার শাসনকালে হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনও মদিনায় বাস করতেন। মাবিয়া তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তার পুত্র এজিদকে তার উত্তরাধিকারী খলিফা বলে ঘোষণা করেন। তখন হোসেন এটা মেনে নিতে পারলেন না। কেননা, খলিফার পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় না। খলিফা পদ সব সময় জন-গণের ইচ্ছায় নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হতো। এজিদ ৬৮০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে খলিফা বলে নিজেকে ঘোষণা করে এবং পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করে। এই সময় হোসেনের ইরাকী সমর্থকরা হোসেনকে কুফায় আগমনের জন্য আবেদন করে।[১২] হোসেনও ইরাকীদের আবেদনে সাড়া দেন। তবে ইরাকীদের আন্তরি-কতা ও আনুগত্য পরীক্ষা করবার জন্য হোসেন তার এক জ্ঞাতিভ্রাতা মোসলেমকে কুফায় পাঠান। মোসলেম যখন কুফায় পৌঁছল, তখন শত সহস্র শিয়া-মুসলমান হোসেনের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা প্রকাশ করেন। মোসলেম তখন হোসেনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং তাঁকে এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানের জন্য আবেদন করেন। এদিকে ইরাকের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লা জেয়াদ মোসলেমকে বন্দী ক'রে হত্যা করে। হোসেন এ খবর জানতে পারলেন না। হোসেন প্রায় শ'খানেক বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের লোকজন নিয়ে কুফার দিকে রওয়ানা হলেন। এজিদ এ সংবাদ পেয়েই হোসেনকে নিরস্ত্র করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইরাকের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেয়।[১৩] এ নির্দেশ পেয়েই ওবায়দুল্লা জেয়াদ ইরাকগামী সমস্ত পথের স্থানে স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল রাস্তায় টহল দিতে থাকে।[১৪] হিজরী ৬১, ১০ই মহররম উমর নামে এজিদের এক সৈন্যাধ্যক্ষ কারবালা প্রান্তরে হোসেন ও তাঁর সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে, হোসেন ও সঙ্গীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করায় উমর হোসেন ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র হোসেন নিহত হলেন এবং তাঁর খণ্ডিত মস্তক দামেস্কে এজিদের নিকট প্রেরিত হলো। শেষে অবশ্য হোসেনের খণ্ডিত মস্তক তাঁর পুত্র ও ভগ্নীর কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়[১৫] এবং কারবালায় তাঁর দেহ ও খণ্ডিত মস্তক সমাধিস্থ করা হয়।[১৬]

হোসেনের হত্যা সম্পর্কিত এই সমস্ত তথ্যই ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। হোসেনকে যে সৈনিকটি হত্যা করে তার নাম হচ্ছে শামীর।[১৭] 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে তাকে 'সীমার' বলা হয়েছে। হোসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শিয়া সম্প্রদায়[১৮] হোসেনকে শহীদ বা ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে এবং প্রতি বছরই মহররম মাসের প্রথম দশদিন 'শোকদিবস' পালন করতে থাকে। হোসেনের মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক কাব্য-নাটকও রচিত হয়েছিল এবং অভিনয়ের মাধ্যমে হোসেনের মৃত্যু দেখানো এবং শোকপ্রকাশ এখনও পর্যন্ত পারস্য, লেবানন, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য স্থানে সম্মিলিতভাবে শোকপ্রকাশ করা হয়। ইংরেজী ভাষায়ও এই বিষয় নিয়ে কাব্য-নাট্য লেখা হয়েছিল।[১৯] এই সমস্ত নাটকে হোসেনের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটি এত করুণভাবে অভিনীত হতো যে, যে-কোন ব্যক্তি এ দৃশ্যে উত্তেজিত হয়ে যেতো।

হাসান ও হোসেনের মৃত্যু ছাড়াও 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে কোন কোন চরিত্রের উল্লেখ ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। হাসানের এক পুত্র কাসেম হোসেনের এক কন্যাকে বিবাহ করে।[২০] এই কন্যার নাম বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়, যেমন—ফাতেমা, সুকায়না, সকিনা।[২১] হোসেনের মৃত্যুকালে তাঁর এক পুত্র জীবিত ছিল, তার নাম ছিল জয়নাল আবেদীন।[২২] হজরত আলীর এক পুত্র হানাফিয়ার ('বিষাদ সিন্ধু'র হানিফা) নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।[২৩] হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ওবায়দুল্লা জেয়াদের প্রাণের বিনিময়ে, এমন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।[২৪] তবে জেয়াদের প্রতিশোধকারীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়,—কেউ বলেন, মুখতার প্রতিশোধ নিয়েছিল, কেউ বলেন হানিফা। এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, যাতে দেখা যায় যে, মাবিয়া মারওয়ানকে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।[২৫] এ সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রধান চরিত্রসমূহ—যেমন হাসান, হোসেন, জয়নাল আবেদীন, হানিফা, সীমার এরা সবাই ঐতিহাসিক চরিত্র। তবে সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ এ-ও হতে পারে যে, মশাররফ তার গ্রন্থের উপাদানগুলি কাব্য-সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত রচনার উদ্দেশ্য ছিল হাসান-হোসেনের মৃত্যুশোক উদ্‌যাপন এবং সাধারণ মানুষের চিত্তকে, হৃদয়কে আলোড়িত করা। পারস্য সাহিত্য থেকে উর্দু সাহিত্যে এ সমস্ত বিষয় প্রবেশ করে। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়টি উর্দু ও পারস্য সাহিত্যের মারফত এসেছে।

বাঙলা সাহিত্যে এ বিষয় নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন শেখ ফয়জুল্লা এবং মোহাম্মদ খান। ডক্টর এনামুল হক ও সুকুমার সেনের মতে ষোড়শ শতকে 'জয়নালের চৌতিশা' রচনা করেন শেখ ফয়জুল্লা।[৬] সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল, তা সবই কাব্যগ্রন্থ। এবং এগুলির সাধারণ নাম ছিল 'জঙ্গনামা' (বা যুদ্ধের বিবরণ)।

বাঙলা গদ্যে কারবালার কাহিনী নিয়ে মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগেব কাব্যে সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান পুরুষ হলেন, হায়াত মামুদ, গরীবুল্লা এবং সৈয়দ হামজা। মশাররফের কাহিনীতে হায়াত মামুদ ও গরীবুল্লার কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বসূরী গরীবুল্লার রচনা থেকে উপকরণ নিলেও 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের কাহিনী-নির্বাচন, নির্মাণ ও চরিত্র সৃষ্টি মীর মশাররফের একান্ত নিজস্ব। এই সমস্ত কারণেই মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগের 'জঙ্গনামা' লেখকদের মধ্যে মশাররফ আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

'বিষাদ সিন্ধু'র গঠনকৌশল

'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।[২৭] ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পাত্রপাত্রীদের উপস্থিত করা হয়। ব্যক্তি-হিসাবে এই সমস্ত চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ নাই, কিন্তু এদের জীবন সম্পর্কে বর্ণিত সমগ্র ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশ্রিত থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে G. M. Trevelyan-এর উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য ঃ

> "Historical fiction is not a history, but it springs from history and reacts upon it. Historical novels, even the greatest of them cannot do the specific work of history, they are not dealing except occasionally with the real fact of the past. They attempt instead to create in all the profusion and wealth of nature, typical cases imitated from, but not identical with recorded facts. In one sense this is to make the past like ; but it is not to make the facts live and therefore it is not history. Historical fiction has

done much to make history popular and give it value, for *it has stimulated the historical imagination.*"[২৮]

'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের মূল বর্ণিতব্য বিষয়টি হচ্ছে হোসেনের মৃত্যুর জন্য দায়ী সমস্ত ঘটনাবলী। এ উপাখ্যানটির একটি পরিকল্পনা বা কাহিনী (plot) রয়েছে,[২৯] এবং হোসেনের মৃত্যুর ফলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তারও বর্ণনা রয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলির সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন অপ্রধান চরিত্রগুলির কোন উল্লেখ বা সন্ধান ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেহেতু ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সুতরাং এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। এ গ্রন্থে উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ এবং মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, হিংসা-বিদ্বেষ সবই চিত্রিত হয়েছে। আবার ইতিহাসের পটভূমিকায় সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড সবই আছে। একদিকে ইতিহাসের চরিত্র, অন্যদিকে ইতিহাসের লক্ষণ, এ সমস্ত মিলিয়ে একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য এতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলো ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। এমনকি বাস্তব জীবনেও সেগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে—যেমন, কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা, এগুলির কোনটির উৎপত্তি হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাসে, আবার কোনটির উৎপত্তি ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে, আস্থায়।

গ্রন্থটির সূচনা হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গ্রন্থের উপসংহার হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও এতে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, এজিদের চোখের সামনে থেকে হোসেনের খণ্ডিত শির অদৃশ্য হওয়া, কারবালা প্রান্তরের বৃক্ষ থেকে রক্তক্ষরিত হওয়া, হোসেনের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হোসেনের পিতামাতার মর্ত্যে আগমন, এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে হানিফার বন্দী হওয়া ইত্যাদি। কোন উপন্যাসে—যেখানে বাস্তব জীবনের চিত্রই অঙ্কিত হয়ে থাকে—এ ধরনের ঘটনা থাকলে তাকে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস বলা মুস্কিল। কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু' জাতীয় উপন্যাসে এ ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনা পাঠকদের অবিশ্বাস উৎপাদন করে না। 'বিষাদ সিন্ধু'র ঘটনাস্থান ও ঘটনা-কাল সপ্তম শতাব্দীর আরবদেশ। 'বিষাদ সিন্ধু'র বিচারকালে সেই বিশেষ যুগের ও মানুষের বিশ্বাসের কথাটি মনে রাখতে হবে।

কাজেই হজরত মোহাম্মদের বংশধরেরা যদি দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী হন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বিধাতার স্থিরীকৃত পথ থেকে কেউ বিচ্যুৎ হতে পারে না। কখনও কখনও মনে হয়, হাসান হোসেন যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, কেননা তারা দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তারা কেউ নিজেদের কৃতকর্মের ফলের জন্য নিজেদের দায়ী বলে মনে করে না। অপরপক্ষে এজিদ, জায়েদা, মায়মুনা, এবং মাবওয়ান—এরা পাষণ্ড হলেও এদের অনেকটা রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয়। কেননা এরা মনে করে যে, তাদের বর্তমান ক্রিয়াকর্মের ফলেই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রভাবান্বিত হবে। এজিদ হজরত মোহাম্মদের বংশধরদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অনবরত সংগ্রাম করতে থাকে, কিন্তু সর্বক্ষণই এজিদ আপন বাহুবল ও কলাকৌশলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু হাসান এবং হোসেন মৃত্যুকে বরণ করে বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে। কেননা তারা বিশ্বাস করে, বিধাতার অভিপ্রায়ই তাই—এবং তাই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কোন এক সমালোচক বলেছেন যে, মনে হয় লেখক মশাররফ নিজেই যেন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী, এবং সময়ে সময়ে এসব ঘটনা তিনি আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারেননি, ফলে এই গ্রন্থের উৎকর্ষতা অনেক ক্ষুণ্ণ হয়েছে।[৩০] তবে এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না যে, মশাররফ অতিপ্রাকৃতে কতটা বিশ্বাসী ছিলেন।[৩১] এবং তাঁর লেখা থেকে অবশ্য এমন ধারণাও করা যায় না যে, তিনি নিজে শিয়া ছিলেন বা সুন্নী[৩২] ছিলেন। এ সমস্ত বিষয় বাদ দিয়ে যদি আমরা 'বিষাদ সিন্ধুকে একটি প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলে মনে করি, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। মশাররফ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি যে পরিবেশে মানুষ হন সেটি ছিল সে-যুগের পূর্ববর্তী সময়ের রীতি-নীতি ও বিশ্বাস দ্বারা লালিত। সুতরাং তাঁর রচনায় যদি আধুনিক যুগের স্পর্শ ও মধ্যযুগের গন্ধ পাওয়া যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আধুনিক একজন ঔপন্যাসিকের মতই মশাররফ এজিদ ও জায়েদার চরিত্র অঙ্কন করেছেন, এবং এই চরিত্র দু'টির বিকাশ দেখিয়েছেন।

মহাকাব্যের সঙ্গে 'বিষাদ সিন্ধু'র তুলনা করা চলে। এতে রয়েছে মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকা। একটি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের কাহিনী নয়—এ হচ্ছে প্রভুত্ব নিয়ে দুই নৃপতির মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল বহু লোকের জীবন, বহু লোকের ভাগ্য। এ গ্রন্থে প্রায় শ'খানেক পাত্রপাত্রী আছে; এর মধ্যে রয়েছে অনেক কাহিনী শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। হিংসা-

বিদ্বেষজর্জরিত মানুষের কামনা, বাসনা, প্রভুত্বের জন্য ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুরতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—এ সব কিছুই ঘটেছিল একটি নারীকে কেন্দ্র ক'রে। ঠিক এমন ঘটনা গ্রীক সাহিত্যের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যে ঘটেছিল একটি নারীকে কেন্দ্র ক'রে।

এতক্ষণ 'বিষাদ সিন্ধু'র গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা গেল ; এবার চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

চরিত্রগুলোকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে হজরত মোহাম্মদের বংশধরগণ, আর একদিকে রয়েছে অন্যান্য চরিত্র-সমূহ। হজরত মোহাম্মদের বংশধরগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ ব্যক্তি এবং তারা বিধাতাকে, নিয়তিকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে। নৈতিকতার বিচারে 'অন্যান্য' চরিত্রগুলো অত্যন্ত অসৎ হলেও তারা মানবিক গুণে মণ্ডিত। হজরত মোহাম্মদের বংশধরগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু ঐতিহাসিকরা তাঁদের যেভাবে চিত্রিত করেছেন, মশাররফ তাঁদের সেভাবে চিত্রিত করেননি। অন্যান্য চরিত্রগুলোর কেউ কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, তবে সবাই নয়। ইতিহাস এ সমস্ত চরিত্রের অন্তর্জীবনের কোন বিস্তৃত বিবরণ দেয়নি। ইতিহাসের অন্ধকার পটভূমিকা থেকে মশাররফ এদের উদ্ধার ক'রে রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছেন। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও মশাররফের লেখনীতে এ সমস্ত চরিত্রগুলো এক নব সৃষ্টি।

'বিষাদ সিন্ধু'র সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে এজিদ—দামেস্ক-অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র সন্তান ও ভবিষ্যৎ সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী।[৩৩] ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছিল এজিদ পিতামাতার প্রশ্রয়ে। এজিদ ছিল নিষ্ঠুর, জেদী এবং অসম্ভব ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি। কোন বাধাকেই সে স্বীকার করত না। অবশ্য এজিদ যুক্তিবাদকে অস্বীকার করত না, তবে একবার মনস্থির করে ফেললে তার পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করা যেত না। 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম দুই খণ্ডে দেখা যায়, এজিদ কী ভাবে হাসান হোসেন এবং তাঁদের পরিবারকে ধ্বংস করবার জন্য কঠিন ব্রত নিয়েছিল। আবদুল জব্বারের স্ত্রী জয়নাবকে পাবার এক দুর্নিবার কামনা এজিদের। এই কামনার বশবর্তী হয়েই এজিদ সেই জব্বার ও জয়নাবের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ,—জয়নাব এজিদকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করল না। সে হাসানকে পতিত্বে বরণ করে নিল। ঠিক ঐ মুহূর্ত থেকেই এজিদ প্রতিহিংসার

সঙ্কল্প করছে। এই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এজিদ হজরত মোহাম্মদের বংশধর ইমাম হাসান ও হোসেনকে অস্বীকার করে বসলো। প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে এজিদ কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে চায়নি। এমনকি তার পিতার প্রতিও এজিদ অনুগত ছিল না। যারা তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তাদেরকে এজিদ হয় বন্দী করেছিল না হয় হত্যা করেছিল। মাবিয়ার মন্ত্রী হামানের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল এজিদ। কেননা হামান এজিদের কার্যকলাপ সমর্থন করেননি। প্রথমদিকে এজিদ চাতুরি ও বুদ্ধির সাহায্যে জয়লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এজিদ নরহত্যায়ও কুণ্ঠিত হয়নি। একের পর এক ব্যর্থতা এসে এজিদকে হতাশ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ সংলাপের মাধ্যমে তার সেই ব্যর্থতার কথা প্রতিফলিত হতো। "ধিক প্রণয়ে। ধিক রমনীর রূপে। শত ধিক প্রেমাভিলাষী পুরুষে। সহস্র ধিক পরস্ত্রী অপহারক রাজায়।"[৩২] কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এজিদের মনে মুহূর্তের জন্য যে সংশয় বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতো, তা মুহূর্তেই তিরোহিত হয়ে যেতো। পরবর্তীকালে এজিদ ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ হানিফার উন্মুক্ত কৃপাণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এজিদ গুহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত এজিদ-চরিত্র আর ইতিহাসে বর্ণিত এজিদের সঙ্গে অনেকটা সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। "এজিদ নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক। তার প্রকৃতিতে কোন দয়ামায়া বা ন্যায়নীতি বোধ ছিল না। হীনকাজে তার আনন্দ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরাও ছিল ক্ষুদ্র এবং নীচ ও কুচক্রী।"[৩৩] পরিশেষে দেখা যায়, গ্রন্থকার এজিদ সম্পর্কে চরম রায় দিয়ে ফেলেছেন—এজিদ যে গুহায় আত্মগোপন করেছিল সেখানে অগ্নিশিখায় সে দগ্ধীভূত হতে থাকবে এবং সে অগ্নি যেন নরকাগ্নিসম ভয়াবহ। 'বিষাদ সিন্ধু'র তৃতীয় পর্বের চতুর্থ প্রবাহে বলা হয়েছে, "এজিদ কাহারও বধ্য নহে। রোজ-কেয়ামত (শেষদিন) পর্যন্ত এজিদ এই কুপে, এই জলন্ত হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবে, পুড়িতে থাকিবে, অথচ প্রাণ-বিয়োগ হইবে না।"

এই গ্রন্থের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে জায়েদা চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। দক্ষ শিল্পীর মত মশাররফ এই নারীর হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন—উদ্ঘাটিত করেছেন তার হৃদয়ের সমস্ত নীচতা, দীনতা, জিঘাংসা, লোভ, মাৎসর্য্য ও ঈর্ষাকে। যে হৃদয়ে কামনার সরীসৃপ মৃত্যুর সংকেত নিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে চলেছে ধীরে

ধীরে, সে বিচিত্র হৃদয়ের আবরণকে উন্মোচিত করেছেন মশাররফ তাঁর অমর লেখনীতে।

জায়েদা রূপবতী সতীসাধ্বী যুবতী—হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী।[৩৬] হাসানের প্রথমা স্ত্রী হাসনে বানুকে জায়েদা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো এবং প্রতিদানে হাসনে বানুও জায়েদাকে কনিষ্ঠা ভগ্নিবৎ স্নেহ করতেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে হাসান জয়নাবকে বিবাহ করে, সেইক্ষণ থেকেই আবহাওয়া অন্য রকম হয়ে গেল। জায়েদার ধারণা ছিল, সে-ই স্বামীর প্রিয়তমা স্ত্রী, কিন্তু হাসান জয়নাবকে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বধারণা সব ভেঙ্গে গেল। তার ধারণা, হাসান জয়নাবকেই বেশী ভালবাসেন। এ সময়ে এজিদ কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচর কুটিলা মায়মুনা এল দুরভিসন্ধি নিয়ে। মায়মুনার উস্কানিতে জয়নাবের ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হলো। কোন এক মুহূর্তে মায়মুনার কাছে জায়েদা তার স্বামীর ভাবান্তরের কথা বলেছিল। মায়মুনা প্রতিজ্ঞা করেছিল, ইন্দ্রজালের সাহায্যে সে হাসানের মনকে জায়েদার বশীভূত করে দিতে পারবে। অবশ্য পরে জায়েদা বুঝতে পেরে বলেছিল যে, স্বামীর মন ইন্দ্রজালের দ্বারা বশীভূত করা যায় না। এ সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল মায়মুনা। জায়েদাকে উত্তেজিত ক'রে মায়মুনা উপদেশ দিল: এভাবে তার জীবনকে স্বামী-প্রেমহীন পরিবেশে ধ্বংস না ক'রে দামেস্ক-যুবরাজ এজিদের অঙ্কশায়িনী হবার জন্য। এজিদ ধনবান সুপুরুষ রাজপুত্র। এজিদ জায়েদার জন্য উন্মত্তপ্রায়। জায়েদা তখন ঈর্ষায় অন্ধ—দৃষ্টি তার আচ্ছন্ন, সে বুঝতে পারল না যে, প্রস্তাবটি কত অসমীচীন, কত অযৌক্তিক এবং কত হাস্যকর। তার পরের ইতিহাস অতি করুণ এবং ঘটনা দ্রুতসঞ্চারমান। মায়মুনা হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যার পরামর্শ দিল। এ প্রস্তাবে জায়েদা প্রথম শিউরে উঠল। ভীষণ ভয়ে জায়েদা বলে বসল, "শেষের কার্যটি জায়েদার প্রাণ থাকিতে হইবে না।...আমার স্বামীপ্রেম আর আমি--আমার প্রাণের প্রাণ কলিজার টুকরা আর আমি।"[৩৭] প্রেম আর ঈর্ষার সংঘর্ষ দেখা দিল জায়েদার হৃদয়ে। আর সেই সংঘর্ষে, সেই দ্বন্দ্বে জায়েদার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল। বিনিদ্র রজনী যাপন করে জায়েদা। আবার তার মনে ভেসে ওঠে দাম্পত্য জীবনের ছবি। সেখানে তো হাসানের পাশে হাসানের হৃদয়ে জায়েদা নাই—আছে জয়নাব। মায়মুনার উক্তি ও পরামর্শই তার গ্রহণীয় বলে মনে হল। রাত্রির অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে মায়মুনার সঙ্গে মিলিত হলো জায়েদা। হলাহলের মোড়ক হাতে নিয়েই জায়েদার হৃদয় কেঁপে

উঠল। দুই দুইবার বিষপ্রয়োগ করেও হাসানের মৃত্যু ঘটাতে পারল না জায়েদা। এরপর জায়েদা আবার নিরাশ হয়ে মায়মুনাকে বলে, "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই।...আমি কেন জয়নাবের সুখের তরী ডুবাইতে আসিয়াছি?..."[৩৮] কিন্তু মায়মুনাও শেষবারের মত জায়েদাকে উত্তেজিত করে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এক রজনীতে জায়েদা প্রবেশ করল হাসানের শয্যা-গৃহে। সোরাহীর জলে বিষমিশ্রিত ক'রে ফিরে আসতে আসতে ঘুমন্ত হাসানের নিষ্পাপ পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তারপর ফিরে গেল তার ঘরে—হাসানের মৃত্যু-সংবাদ শুনবার প্রতীক্ষায়। এবার সত্যি জায়েদা সফল হলো তার ষড়যন্ত্রে। তার ইচ্ছা পূর্ণ হলো। হাসানের মৃত্যুর পর একবার সে ভাবল পালিয়ে যাবে। কিন্তু পারল না। কোথায় সে আত্মগোপন করবে—কোন স্থান পেল না। এ প্রসঙ্গে জায়েদার তুলনা চলে সেক্‌সপীয়ারের ম্যাকবেথের নাটকের লেডী ম্যাকবেথের সঙ্গে—"Here is the smell of blood still: all the perfume of Arabia will not sweetten this little hand." (Macbeth, Act V, Sc. I.)

জায়েদা সুখী হতে চেয়েছিল—জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল ঐশ্বর্যে, প্রেমে। কিন্তু পরিণামে ব্যর্থতা এসে তার সমস্ত স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে উঠে। নরেকর সমস্ত বিভীষিকা যেন তাকে চারিদিক থেকে এসে ঘিরে ধরেছে। এজিদের রাজপ্রাসাদে জায়েদা এসে পৌঁছলে শুধু তার ন্যায্য পাওনাকে পেতে—মৃত্যুকে বরণ করে নিতে। মশাররফ যে নিপুণতার সঙ্গে জায়েদা-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তাতে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। এই চরিত্র-চিত্রণে পারদর্শিতার জন্যই 'বিষাদ সিন্ধু'কে উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

এরপর সংক্ষেপে আরও কয়েকটি চরিত্রের কথা বলা যেতে পারে। মারওয়ান মাবিয়ার জীবিতকালেই এজিদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ মন্ত্রণাদাতা ছিল। প্রথম থেকেই আমরা অসম্ভব কৌশলী কূটনীতিজ্ঞ মারওয়ানের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হই। মারওয়ানই কৌশল ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে জব্বার ও জয়নাবের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায়। জয়নাবকে লাভের আশায় মারওয়ান এজিদকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে। এজিদের শত্রু হাসানকে সংহার করবার জন্য মায়মুনাকে খুঁজে বের করাও তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। মারওয়ান পাষণ্ডচরিত্র হলেও এক-আধবার সে সদগুণের পরিচয়ও দিয়েছে। মৃত হোসেনের শোকসন্তপ্ত

পরিবারবর্গের প্রতি সে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছে। বিচক্ষণতাও তার কম ছিল না—সে বারংবার পরামর্শ দিয়েছে এজিদকে জয়নাল আবেদীনকে হত্যা না করতে। তারই উপদেশে হানিফার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে এজিদ। মারওয়ান প্রভুভক্ত ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে সে প্রভুর কার্যকে মনে মনে সমর্থন করতো না। শেষ পর্যন্ত সে এজিদের মান রক্ষার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। হানিফার হস্তে মৃত্যু ঘটে তার। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তার কৃত সমস্ত অপকর্ম ও অন্যায়ের জন্য অনুতাপও করেছিল।

মায়মুনাও একটি পাষণ্ড নারী-চরিত্র। সে থাকত সুযোগের সন্ধানে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তার সৃষ্টি। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে সে তিরোহিত হয়ে যাবে। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে, বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গলের দুর্বলা দাসীর সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। অর্থের জন্য কি জঘন্য পাপ মায়মুনা করেছিল, সেটা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সে হৃদয়ঙ্গম করে।

অনুরূপ একটি চরিত্র হচ্ছে সীমার। সে সাহসী বীর বটে, কিন্তু লোভী। অর্থই তার জীবনের মূলমন্ত্র। এজন্য সে সর্ববিধ আদর্শকে, নীতিকে বিসর্জন দিতে পারে। নৃশংসতাই তার জীবনের মূলমন্ত্র। হোসেনকে হত্যা করেই সে ক্ষান্ত ছিল না—আজরের প্রাণও বিনাশ করেছে সে শুধু অর্থলোভে। হানিফার হস্তে তার মৃত্যু ঘটল বটে, কিন্তু কৃতকর্মের জন্য তার কোন অনুশোচনা ছিল না। এই সমস্ত চরিত্রের কোন বিকাশও লেখক দেখাননি।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধরদের সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা চলে যে, এরা ত্রুটি-বিচ্যুতিবিহীন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি। এরা জনগণের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। হাসান ও হোসেন হজরতের দৌহিত্র। সুতরাং সকল মুসলমানের নিকটই তাঁরা শ্রদ্ধার্হ। হাসান তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা করে দিয়ে নিজের হৃদয়ের ঔদার্য ও মহত্বকে প্রকাশ করে যান। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে উপদেশ দিয়ে যান, জায়েদার উপর কোন প্রতিশোধ যেন না নেয় হোসেন।

হোসেন হজরত আলীর উপযুক্ত পুত্র। তিনি একজন যোদ্ধা, বীর ও সাহসী পুরুষ। মদিনা থেকে এজিদের সেনাকে একবার বিতাড়িত করেছিলেন হোসেন। কারবালার প্রান্তরে অসমসাহসের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেন। কিন্তু দৈবকে সর্বক্ষণ বিশ্বাস করতেন হোসেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন বিনা প্রতিবাদে ; কেননা বিধাতার তা-ই অভিপ্রায়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর হন্তা সীমারকে ক্ষমা করেন হোসেন।

হানিফাও হজরত আলীর সন্তান এবং একজন সাহসী পুরুষ। হোসেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হানিফা। এজিদ ও মারওয়ান তাঁর নামে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কিন্তু হানিফা এজিদ-বধে অকৃতকার্য হন। কেননা বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে, হানিফা এজিদকে নিধন করেন।

সর্বশেষে জয়নাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। 'বিষাদ সিন্ধু'র সমস্ত ঘটনাই ঘটবে জয়নাবকে কেন্দ্র করে। এজিদ ও হাসান হোসেনের সংঘর্ষের মূল কারণ জয়নাব। জয়নাব সতীসাধ্বী স্ত্রী। প্রথম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে দ্বিতীয়বার পরিণীতা হন হাসানের সঙ্গে। ভাগ্যের পরিহাসে হাসানের মৃত্যুর পর সে এজিদের কারাগারে বন্দিনী হন। কারাগারে বন্দিনী থাকাকালে তার মনে হতো কারবালার সমস্ত রক্তপাতের জন্য সেই যেন দায়ী। এজিদকে স্বামীত্বে বরণ করে নিলেই তো আর এ সমস্ত ঘটনা ঘটত না। মাইকেলের মেঘনাদ-বধ কাব্যের সীতা-চরিত্রের সঙ্গে জয়নাবের তুলনা করা চলে।

তথ্য নির্দেশ

[১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে, ২৯ নম্বর পুস্তিকায় 'বিষাদ সিন্ধু'র তৃতীয় খণ্ড 'এজিদ বধ' পর্বের প্রকাশকাল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ দিয়েছেন। কিন্তু পৃথক পুস্তক হিসাবে এই তৃতীয় খণ্ডের কোন খণ্ড পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (লণ্ডন) প্রথম সংস্করণের প্রথম দুই খণ্ড একত্রে বাঁধাই করা রক্ষিত আছে।

[২] পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই উৎসর্গ-পত্রটি কেন মুদ্রিত হয়নি, আপাতঃ-দৃষ্টিতে এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনিবের সঙ্গে মশাররফের কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়েছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না। তবে 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে মশাররফ যে মহিলা-জমিদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন তার সঙ্গে তার মনিবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[৩] প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এ মন্তব্যটি ছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণসমূহে ভূমিকার এই শেষাংশটুকু বর্জন করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড

পুস্তক লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে।

[৪] মুহতেশামের 'হফ্‌তবন্দ' হচ্ছে মর্সিয়া বা শোক-গীতি। কানীর মর্সিয়াও উল্লেখযোগ্য। E. G. Browne, *A History of Persian Literature*, Cambridge, 1924, vol. 4, p. 173-177, p. 177-186.

[৫] আনিস (১৮০২-৭৪) এবং দবির (১৮০৩-৭৫) উর্দু সাহিত্যের দু'জন বিখ্যাত কবি—মর্সিয়া লিখেছিলেন। Rambabu Saksena, *A History of Urdu Literature*, p. 126, 131.

[৬] ফারাজদাক বা হাস্সান বিন গালিব, এই বিষয় নিয়ে লেখেন। দ্রষ্টব্য, R. A. Nicholson, *A Literary History of Arabs*, 2nd ed., p. 243.

[৭] 'তাবারী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪, 'তুলনীয় মাস্উদী', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪, P. K. Hitti-র *History of the Arabs*, p. 189-এ উদ্ধৃত।

[৮] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (Ed., A. Houtsma and others)

[৯] (ক) প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪, (খ) 'ইবনে হাজার', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩, 'দিনওয়ারী' ২৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Hitti-র *History of the Arabs*, পৃঃ ১৯০-এ উদ্ধৃত।

[১০] 'ইয়াকুবী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬, Hitti-র *History of the Arabs*-এর ১৯০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

[১১] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[১২] প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[১৩] প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ১১৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[১৪] প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[১৫] 'ইবনে হাজার', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭, Hitti-তে উদ্ধৃত।

[১৬] P. K. Hitti, *History of the Arabs*, ১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[১৭] (ক) এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ১ম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
(খ) R. A. Nicholson, *A Literary History of Arabs*, London, 1930, ১৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
(গ) W. Muir, *The Caliphate*, ৩০৯ পৃঃ (পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

[১৮] شيعة শব্দের অর্থ—অনুসারী, দল, সম্প্রদায় (*A Dictionary of Modern*

Written Arabic, Hans Wehr, ed. by J. M. Cown, 1961, p. 498)। এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হচ্ছে এভাবে—হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর হজরত আলীই ন্যায়তঃ খলিফা হবেন। অন্য তিনজন খলিফা—আবুবকর, উমর, ও ওসমানকে তারা যথার্থ খলিফা বলে স্বীকার করেন না। (এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, চতুর্থ খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

[১৯] ইংরেজীতে লেখা প্রথম পুস্তক হচ্ছে Lewis Pelly রচিত *Miracle Play*, লণ্ডন থেকে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

[২০] W. Muir, *The Caliphate*, ৩১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২১] প্রকৃত নামটি সুকায়না হতে পারে। কোন কোন ঐতিহাসিক সুকায়নার সঙ্গে আবদুল্লার—কাসেম নয়—বিবাহের কথা অস্বীকার করেন। সুকায়না দীর্ঘজীবি মহিলা ছিলেন এবং বলা হয়েছে যে, তিনি একাধিকবার বিবাহ করেছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, ৫০৮ ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২২] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮ দ্রষ্টব্য ও W. Muir, ৩১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২৩] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ৩য় খণ্ড, ৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২৪] 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে ওবায়দুল্লা জেয়াদের নাম আবদুল্লা জেয়াদ হয়ে গেছে। ওবায়দুল্লা জেয়াদ কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। Hitti, ১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Nicholson, ১৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২৫] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ৩য় খণ্ড, ৩০৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[২৬] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *Muslim Bengali Literature*, ৭৩, ১২৭, ১৩৯, ১৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ডক্টর সুকুমার সেন, 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য', ৪৫-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রধান প্রধান কয়েকজন লেখকের রচনার উল্লেখ করা হলো ঃ

'জয়নালের চৌতিশা', শেখ ফয়জুল্লা
'মাকতুল হোসেন', মোহাম্মদ খান
'জঙ্গনামা', নসরুল্লা খান
'আমীর জঙ্গনামা', মনসুর
'জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব', হায়াত মামুদ
'জঙ্গনামা', ফকীর গরীবুল্লা
'জঙ্গনামা', সৈয়দ হামজা
'শহীদে কারবালা', সাদ আলী

'শহীদে কারবালা', আবদুল ওহাব
'ইমামের জঙ্গনামা', রাধারমন গোপ (অমুসলিম লেখক)
'হানিফা ও কায়রা পরী', শাবিরিদ খান
'কারবালা', আবদুল হাকিম।

[২৭] "A Novel is rendered historical by the introduction of dates, personages or events to which identification can be readily given." Jonathan Nield, *A Guide to the Best Historical Novels and Tales*, 5th ed., Int. XVIII.

[২৮] G. M. Trevelyan in Sidgwick Memorical Lecture, Cambridge, 1921, Jonathan Nield-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। ["ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাস থেকেই এর জন্ম এবং……]

[২৯] 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান), ১ম সংস্করণ ৭৪ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, "এটি Organic Plot-এর উপন্যাস নয়। ইতিহাস, উপন্যাস এবং নাটকের সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক শংকর সৃষ্টি।…সমালোচনার মাপকাঠিতে কোন বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি নয়।"

[৩০] কাজী আবদুল ওদুদ, 'শাশ্বত বঙ্গ', ১৯৫১, পৃঃ ১২৪।

[৩১] মশাররফ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনীর' ৩৭৭, ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, তিনি যাদুবিদ্যা জানতেন এবং তন্ত্রমন্ত্রের ভক্ত ছিলেন।

[৩২] সুন্নী—যারা হজরত মোহাম্মদের পর চারজন খলিফাকেই স্বীকার করেন তারাই সুন্নী। অপরপক্ষে শিয়ারা শুধু হজরত আলীকেই ন্যায্য খলিফা বলে মানেন।

[৩৩] ইসলামে রাজতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না। মাবিয়া প্রথম ইসলামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর এজিদ খলিফা পদে বরিত হয়।

[৩৪] 'বিষাদ সিন্ধু', ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৪-৫।

[৩৫] (ক) Amir Ali, *A Short History of the Saracens*, London, 1916, ৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(খ) 'ইবনে খালদুন', 'মুকাদ্দামা, ইংরেজী অনুবাদ F. Rosenthal, ৪৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(গ) এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, চতুর্থ খণ্ড, ১১৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) R. A. Nicholson, প্রাগুক্ত, ১৯৬-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৩৬] ঐতিহাসিক বা অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হাসানের একাধিক স্ত্রী ছিল। সুতরাং জায়েদা নামে (বা ভিন্ন নামেও) তাঁর কোন স্ত্রী থাকতে পারে। তাঁকে 'মিতলাক'ও (বৃহৎ স্ত্রী-পরিত্যাগকারী) বলা হয়েছে। কেননা তিনি অনেকবার বিবাহ করেছিলেন এবং অনেক স্ত্রীকে পরিত্যাগও করেছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৩৭] 'বিষাদ সিন্ধু', ১ম পর্ব, ত্রয়োদশ প্রবাহ।

[৩৮] 'বিষাদ সিন্ধু', ১ম পর্ব, ষোড়শ প্রবাহ।

(খ) 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র প্রথম খণ্ড ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদপটে লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু মশাররফের নাম গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন মীর মাহতাব আলী।[১] প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ প্রথম তরঙ্গ নামে পুস্তকটির যে খণ্ড প্রকাশিত হয় তারপর আর দ্বিতীয় কোন খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থকার নিজেকে 'উদাসীন পথিক' নামে ভূমিকায় পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত ভূমিকায় (মুখবন্ধ) তিনি বলেছেন যে, তিনি অনেক গোপন কাহিনী উদ্ঘাটন করবেন, যদিও তিনি জানেন যে, সত্য প্রকাশ করা অনেক সময় বিপজ্জনক। তিনি 'মুখবন্ধে' নিম্নরূপ উক্তি করেছেন—"মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমনকি জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতি স্থান নাই ; সহায় নাই, সম্পত্তি নাই,......।"

এই পুস্তকে মশাররফের পিতামাতার জীবনের কিছু ঘটনার বর্ণনা আছে এবং জনৈক ইউরোপীয় নীলকুঠির মালিকের সঙ্গে মশাররফের পিতার বন্ধুত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থে দুইটি কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি হচ্ছে নীলকুঠিয়াল টমাস কেনীর (টি. আই. কেনী), অপরটি হচ্ছে মীর সাহেব, অর্থাৎ মশাররফের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের কাহিনী। কেনীর কাহিনীর সঙ্গে মীর সাহেবের কাহিনী একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। যদিও গ্রন্থে বর্ণিত সব ঘটনা একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হতে পারেনি। এক পরিচ্ছেদের ঘটনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়নি। যাহোক, মশাররফ পুস্তকের প্রধান চরিত্র কেনী সাহেবের পুরো কাহিনী বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে মোট ৪২টি অধ্যায় আছে[২] এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৭। প্রত্যেক পরিচ্ছেদকে লেখক 'তরঙ্গ' নামে অভিহিত করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়ের পরিচয়জ্ঞাপক শীর্ষনামও আছে : নীলকুঠি (প্রথম তরঙ্গ), মীর সাহেব কে ? (দ্বিতীয় তরঙ্গ), প্যারীসুন্দরী (তৃতীয় তরঙ্গ) ইত্যাদি।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী শালঘর মধুয়া গ্রামের নীলকুঠির মালিক কেনী সাহেবের সঙ্গে পাঠকদের সাক্ষাৎকার হবে। তিনি প্রতিদিনের

কার্যক্রম অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে নীলচাষ পরিদর্শনে বের হন। নীলচাষ পরিদর্শনে বের হলেও তার একটি গোপন মতলব ছিল। তারই এক ভৃত্যের এক সুন্দরী স্ত্রী ময়নার প্রতি তার লোভ ছিল। লেখকের চাতুরী লক্ষ্যণীয়। হঠাৎ এক গাছে ময়না পাখী দেখে কেনী বন্দুক উঁচিয়ে তার সঙ্গীদের বললেন, তার ঐ ময়না পাখীটি চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মশাররফ তাঁর পিতার সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। জেলার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মীর সাহেব সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। মীর সাহেবের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাতা শাহ গোলাম আজম তাঁর সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। কেনী সাহেবের সঙ্গে মশাররফের পিতা মীর সাহেবের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। কেনীর সঙ্গে সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরীর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে মীর সাহেব অনেক লাঠিয়াল দিয়ে কেনী সাহেবকে সহায়তা করেন। প্যারীসুন্দরীর প্রজারা একদিন কেনীর কুঠি আক্রমণ করে। কেনী-পত্নী চালাকি করে উপর থেকে অনেকগুলি পয়সা ছুঁড়ে দিলে লাঠিয়ালরা মারামারি বাদ দিয়ে পয়সা কুড়িয়ে পালিয়ে যায়। পরে কেনী সাহেবের স্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক মিথ্যা বিবরণ পাঠিয়ে দেয় যে, ডাকাতরা তার বাড়ী লুণ্ঠন করেছে। এবং তিনি মীর সাহেবকেও এ-ব্যাপারটি জানিয়ে রাখেন।

গ্রন্থকার শাহ গোলাম আজমের কাহিনীর অবতারণা করেন সপ্তম পরিচ্ছেদে। এই গোলাম আজম মীর সাহেবের পিতা মীর ইব্রাহিম হোসেনের 'উইলখানা' অপহরণ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইব্রাহিম হোসেনের জ্যেষ্ঠপুত্রের কন্যা-জামাতা ছিলেন এই গোলাম আজম। মীর সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিন গোলাম আজম মীর সাহেবের হাতবাক্স অপহরণ করে। এদিকে কেনী-পত্নীর সংবাদে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেনীর কুঠিতে এসে উপস্থিত হন। কেনী সাহেব তখন বাইরে ছিলেন, তিনি এসেই প্যারী-সুন্দরীর প্রজাদের ধরে নিয়ে আসার জন্য তার লাঠিয়ালদের আদেশ দেন।

মীর সাহেব তার ভগ্নীর বাড়ীতে চলে যাওয়ার আগে তার সমুদয় সম্পত্তির দলিলপত্র শাহ গোলাম আজমের কাছে হস্তান্তর করেন। এদিকে কেনীর সঙ্গে প্যারীসুন্দরীর সংঘর্ষ ঘনীভূত হতে থাকে। বহুদিন কেনী-পত্নী দেশছাড়া বলে হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। কেনী এই সুযোগে জকিকে সংবাদ দেয়। জকি হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠে। জনশ্রুতি এই যে, জকির

সুন্দরী স্ত্রীর বদৌলতেই জকির এই অর্থসৌভাগ্য। কিন্তু তার স্ত্রী এ পাপপূর্ণ জীবন বেশী দিন সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতিনী হয়।

শাহ গোলাম আজমও এদিকে মীর সাহেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। মীর সাহেব তার ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাতার এমন আচরণে মর্মাহত হয়ে বাড়ীঘর পরিত্যাগ করে চলে যান।

কেনী সাহেব জোর ক'রে গ্রামের অনেক চাষীকে নীলচাষে বাধ্য করায়। যারা নীলচাষে অসম্মত হয় তাদেরকে গুদামে আটকিয়ে রাখে। কেনীর স্ত্রী কিছুকাল পরে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসে। ফিরে এসে তার গৃহের আবহাওয়ায় কেমন যেন পরিবর্তন লক্ষ্য করে। জকির দ্বিতীয়া স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে কলহ ক'রে পিতৃগৃহে চলে যায়। কেনীর জন্য জকির পারিবারিক বিপর্যয়— এই মনে ক'রে সে কেনীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জকি ধরা পড়ে এবং তাকে পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দেওয়া হয়।

কেনীর সঙ্গে পাংশার আর এক জমিদার 'ভৈরব বাবু'র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ভৈরব বাবু কৌশলে কেনী সাহেবকে জব্দ করে।

মীর সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোলাম আজম মীর ইব্রাহীম হোসেনের 'উইল' বদলিয়ে ফেলে সব জায়গা জমি দখল করে নেয়। পরে মীর সাহেব আবার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রী দৌলতন্নেসা হলেন মশাররফের জননী। মীর সাহেব তার শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক সম্পত্তি লাভ করেন।

এদিকে সমগ্র দেশে নীলচাষ নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ আরম্ভ হয়। প্রজারা একজোটে নীলচাষে বাধা দেয়। কেনী সাহেবের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রজাদের আবেদনে তৎকালীন বাংলার গভর্নর নীলচাষ সংক্রান্ত গোলযোগ উপশমের প্রতিশ্রুতি দেন।

মীর সাহেবের স্ত্রী দৌলতন্নেসারও মৃত্যু হয় এক ষড়যন্ত্রের ফলে। মীর সাহেবের এক প্রিয় নর্তকী ছিল। তারই গোপন চক্রান্তের ফলে দৌলতন্নেসার জীবনাবসান ঘটে।

এদিকে কেনী সাহেবও দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেনীর সব সম্পত্তি নীলাম হয়ে যায়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র প্রথম স্তর এখানেই শেষ হয়। গ্রন্থকার অবশ্য বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি।

গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা

গ্রন্থখানি মীর মশাররফের পিতার জীবনীমূলক হলেও অন্যান্য অনেক কয়টি চরিত্রই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উপস্থিত। যেমন, কেনী সাহেবের নাম নীলচাষ সংক্রান্ত তদন্ত-কমিশনের রিপোর্টে পাওয়া যায়।[৩] আর প্যারীসুন্দরী ও ভৈরব বাবুর নামও ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[৪] এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনা হচ্ছে নীলচাষ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে।[৫] গ্রন্থে শালঘর মধুয়ার নীলকুঠির মালিক টমাস কেনীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর সময়কাল হচ্ছে ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।[৬] গ্রন্থে মশাররফের নিজের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই উল্লেখ নাই।

নীলতদন্ত কমিশনের রিপোর্টে শালঘর মধুয়ার নীলকুঠির নাম পাওয়া যায় – যদিও ঐ কুঠির অধ্যক্ষ হিসাবে হ্যাম্পটন সাহেবের নাম দৃষ্ট হয়।[৭] উক্ত কমিশনের রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে, লুণ্ঠন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কেনীর বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলার বিচারক ইডেন সাহেব নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

> "পুলিশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে এক গুরুতর অন্যায় সংঘটিত হয়েছে— চৌত্রিশ জন রাইয়তের বাড়ী-ঘর সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়েছে। মজার ব্যাপার এই যে, কোন ইউরোপীয় নাগরিকের শাস্তি হয়নি।"[৮]

তৎকালীন একটি বাংলা সাময়িকপত্র 'শোক-প্রকাশে' কেনীর নাম এবং তার নায়েব দেওয়ান শম্ভুনাথের নাম পাওয়া যায়।[৯] অন্যান্য সরকারী নথিপত্রে[১০] দেখা যায় যে, কেনীর কর্মচারীদের উপর কৃষকেরা অত্যাচার করছে, এমন অভিযোগ কেনী সাহেব করেছেন। উক্ত নথিপত্রে আরও দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগের কমিশনার বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে এ কথা লিখেছেন যে, চাষীরা কেনীর কর্মচারীদের নানা রকম হয়রানি করছে।[১১]

তৎকালীন সাময়িক পত্রগুলিতেও নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বর্ণনা প্রকাশিত হতো। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে ঃ "Mr. Kenny's people impudently did something like this, and the result was that about 27 villages of his immediately severed themselves from the factory."[১২] ঠিক অনুরূপ আর একটি বিবরণ 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায় দৃষ্ট হয়।[১৩]

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে, কেনী একটি ঐতিহাসিক চরিত্র এবং শালঘর মধুয়ায় তার একটি নীলকুঠি ছিল। প্রকৃত ঘটনাগুলির প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বৎসর পরে মশাররফ এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। যখন নীলচাষ সংক্রান্ত গোলযোগ সংঘটিত হয় তখন মশাররফ চৌদ্দ বা পনর বৎসর বয়সের কিশোর মাত্র। তিনি স্মৃতি বা লোকশ্রুতি থেকে এসব কাহিনী সংগ্রহ ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ-ও সম্ভব যে, অন্য কোন নীলকুঠিয়াল যে সমস্ত অপকর্ম করেছিল সেগুলি কেনী সাহেবের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সি. ই. বাকল্যাণ্ড রচিত Bengal under the Lieutenant Governors গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, কিভাবে কৃষকেরা এই সমস্ত নীলকর সাহেবদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন ব্রিটিশ সদস্যের লেখা এ গ্রন্থখানিকে আমরা অতি সহজেই প্রামাণ্য পুস্তক বলে বিবেচনা করতে পারি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই ছিল যে, সেকালের জনসাধারণ তথা আইন বা শাসনব্যবস্থা এই সমস্ত কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থ হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থের একটি বিবরণের কিয়দংশ এ নীলচাষের করুণ কাহিনীর এক একটি দিককে উন্মোচন করবে :

> "It appeared after due inquiry that on the whole the petitioners had not always received the redress from the law, and that practical protection from the police, to which they were entitled. Some of the cases, though many months old, had not been disposed of, and one case in which a raiyat after having been wounded in affray in which factory-people were aggressors, was carried off from factory to factory and undoubtedly died in durance from the effects of wounds."[১৪]

নীলতদন্ত কমিশনের রিপোর্টে নীলকরদের দ্বারা নারীহরণ,[১৫] গুদামঘরে চাষীদের কয়েদ রাখা,[১৬] লাঠিয়াল পোষা,[১৭] এসব অপরাধ সংঘটনের উল্লেখ আছে। কেনীর জীবনকাহিনী সম্পর্কে যে বর্ণনা মশাররফ তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন ইতিহাসে তার সমর্থন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গ্রন্থে[১৮] ভৈরব বাবু ও প্যারীসুন্দরীর সঙ্গে কেনীর সংঘর্ষের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

নীলতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কৃষকেরা মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা বাধ্যতামূলকভাবে আর নীলচাষ করবে না। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নীলকর সাহেবরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু শালঘর মধুয়ার কেনী সাহেব এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি কলের লাঙল আমদানি করলেন, এমনকি বাঙ্গালা দেশের বাইরে থেকে কুলি-মজুর আমদানি শুরু করেন। কেনীর বাঙ্গালী কর্মচারীরা কেনীর চাকরী ছেড়ে দেয় এবং কেনীর নতুন কর্মচারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়। এ প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে সমস্ত নীলকর জমিদার ছিলেন, তাদের প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। বাকল্যাণ্ড সাহেবের গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। কেনী সাহেবের নীলকুঠি কখন বন্ধ হয়ে যায় তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কেননা মশাররফ তাঁর গ্রন্থে কোন ঘটনারই সঠিক তারিখ দেননি। কলিকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় এমন উল্লেখ আছে যে, কেনী ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে[১১] কুষ্টিয়া স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কেনী ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের পরেই মৃত্যুবরণ করেন। মশাররফ অবশ্য তাঁর গ্রন্থে কেনীর কুঠি ধ্বংসের বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময়ের জনৈক ঐতিহাসিক তাঁর গ্রন্থে কেনীর নীলকুঠির বর্ণনা দিয়েছেন। এমন হতে পারে যে, কেনীর একাধিক কুঠি ছিল। কেনী একজন অবৈতনিক (অনারারী) ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সে-যুগে অনেক ইউরোপীয় নীলকরদের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত করা হতো।

মশাররফ তাঁর গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের ভ্রমণের একটি বর্ণনা দিয়েছন—"মহামতী লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য, নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্তের জন্য 'সোনামুখী' আশ্রয়ে মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন। বর্ষাকাল। কালীগঙ্গা জলে পরিপূর্ণ। · বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয় তরী বক্ষে করিয়া প্রজার দুরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘর মধুয়ার কুঠি পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে।…কালীগঙ্গার দুইধারে সহস্রাধিক প্রজা স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে, সহস্রমুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্মাবতার, আমরা মারা গেলাম। আমরা একেবারে সারা হইলাম।"

অনুরূপ বর্ণনা Bengal under the Lieutenant Governors গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়ঃ

"In the month of August (1859) Sir John Peter Grant while on tour by water through a part of the Bengal districts received the petitions from numerous raiyats of Nadia district complaining that in indigo cases they did not obtain due protection and redress from the Magistrates that raiyats obnoxious to the factory were frequently kidnapped and that other acts of great violence were committed with impunity in open day." [0]

স্যার জন পিটার গ্রান্টের স্বলিখিত রোজনামচা থেকেও উদ্ধৃতি দেয়া যায় ঃ

Numerours crowds of raiyat appeared at various places whose whole prayer was for an order of government that they shoud not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same. 2 rivers from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for some 60 or 70 miles ; both banks were literrally lined with crowds of villagers ; claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves ; the males who stood at and between the riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side···all were most respectful and orderly, but also very plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women and children has no deep meaning."[২]

গ্রন্থের অন্য দু'টি প্রধান চরিত্র মশাররফের জনক-জননী,—মীর মোয়াজ্জম হোসেন এবং দৌলতন্নেসা বেগম। গ্রন্থে মশাররফ তাঁর পিতাকে 'মীর সাহেব' নামেই অভিহিত করেছেন। কেননা জনসাধারণের মধ্যে তিনি ঐ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থে মশাররফ তাঁর পিতাকে "মুসলমান সমাজের সমুজ্জ্বল রত্ন" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কেও

অতি উচ্চধারণা পোষণ করতেন। যদিও তিনি পিতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর পিতার নৃত্য-সঙ্গীত মজলিসের প্রতি যে অসম্ভব দুর্বলতা ছিল তা-ও প্রকাশ করেছেন। সংসারের প্রতি তাঁর পিতার লক্ষ্য ছিল না সে কথা মশাররফ বহুবার উল্লেখ করেছেন। তদুপরি নীলকর কুঠিয়াল কেনী সাহেবের সঙ্গে মশাররফের পিতার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কেও গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। মশাররফ তাঁর জননী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন, "সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য।...মুসলমান রমণীর মধ্যে অনেক খুঁজিলাম পাইলাম না।...পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমণীকেই দৌলতন্নেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে ?" তাঁর পিতার রক্ষিতা নর্তকী কর্তৃক তাঁর জননীকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়-যন্ত্রের কাহিনী অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থের অপর একটি খল-চরিত্র হচ্ছে শাহ গোলাম আজম ; মশাররফের লেখনী ভিন্ন অন্যত্র তার কোন অস্তিত্ব নাই। গোলাম আজম মীর সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাতা। তারই ষড়যন্ত্রে মীর সাহেব তাঁর পৈত্রিক নিবাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

উপরের এ সমস্ত আলোচনা থেকে একটি মন্তব্য বিনা দ্বিধায় করা চলে যে, বাংলায় নীলচাষের ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থকে বিবেচনা করা যায়।

তথ্য নির্দেশ

১ 'বিষাদ সিন্ধু'র (১ম সংস্করণ) ভিতরের মলাটে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনখানা পাওয়া যায়: "নূতন পুস্তক—মনের কথা। নাম, নিবাস, স্থান এবং ঘটনা সমুদায় সত্য, বিন্দুমাত্রও কল্পিত নহে। এরূপ সত্য ঘটনার পুস্তক বঙ্গভাষায় আর আছে কিনা সন্দেহ। দুইশত গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই মীর মশাররফ হোসেনের 'মনের কথা' প্রকাশ করিব। সুদ্ধ একখানি পত্র লিখিয়া আমার নিকট মনের কথা জানাইলেই অর্ধমূল্যে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। মুদ্রাঙ্কন-কার্য শেষ হইলে মূল্য নির্ধারিত করিয়া বঙ্গবাসীতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন দিব।

আইনউদ্দীন বিশ্বাস, কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া।" ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণ রক্ষিত আছে।

২ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১ম সংস্করণ) গ্রন্থে পঞ্চদশ তরঙ্গের পর ষোড়শ তরঙ্গ হওয়া উচিৎ। কিন্তু সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য তা 'একাদশ তরঙ্গ' নামে মুদ্রিত হয়। ফলে উক্ত গ্রন্থে ৩৭টি অধ্যায় আছে বলে ভ্রম হতে পারে। সুতরাং একাদশ তরঙ্গের স্থলে (পৃঃ ৭৮) 'ষোড়শ তরঙ্গ' হবে। মূল পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রাপ্তব্য।

৩ *Report of the Indigo Commission*, 1860, Appendix 21, Case No. 18. এখানে কেনীর উল্লেখ আছে। আর আছে "Papers Relating to the disputes between the Indigo planters and ryots of Lower Bengal" 1861 শীর্ষক নথিতে, পৃঃ ১৩, পৃঃ ৭।

৪ 'পাবনা জেলার ইতিহাস', রাধারমণ সাহা, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭, ৭৭, গ্রন্থে প্যারীসুন্দরী ও ভৈরব বাবুর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

৫ নীলচাষ সংক্রান্ত আলোচনা এ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৬ মশাররফের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' থেকে তাঁর পিতার বিবাহের তারিখ ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ হিসাব করা হয়েছে এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় তাঁর পিতার বিবাহের এক বছর আগের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে একটি ইংরেজী দৈনিকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের কোন সংখ্যায় কেনীর উল্লেখ আছে।

৭ *Report of the Indigo Commission* (1860), Calcutta, Appendix 1.

৮ প্রাগুক্ত, Appendix 21, Case No. 18.

৯ সোম প্রকাশ, কলিকাতা, নভেম্বর ৫, ১৮৬০, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ৪৯, পৃঃ ৫৮৫।

১০ Papers Relating to the disputes between the Indigo planters and ryots of Lower Bengal, 1861, p. 13, (ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডনে রক্ষিত)।

১১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

১২ *The Hindoo Patriot*, Calcutta, July 5, 1860.

১৩ 'সম্বাদ প্রভাকর', কলিকাতা, ১০ মে, ১৮৬৫।

১৪ C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Calcutta, 1901, vol. I, p. 185.

১৫ *Report of the Indigo Commission*, Appendix 12, Abduction of Haromani, পৃঃ ২৪।

১৬ প্রাগুক্ত, Evidence, p. 96.

১৭ প্রাগুক্ত, Appendix 18.

১৮ রাধারমণ সাহা, 'পাবনা জেলার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯১৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

১৯ *The Englishman*, Calcutta, May 4, 1865.

২০ *Buckland*, পৃঃ ১৮৬।

২১ *Buckland*, পৃঃ ১৯২। Minutes of 17th September, 1860.

(গ) গাজী মিয়াঁর বস্তানী

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' প্রথম খণ্ড ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১] এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটি পুস্তকাকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। মীর মশাররফ রচিত আত্মজীবনী, 'আমার জীবনী'তে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় সম্পূর্ণাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। 'আমার জীবনী' বার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি খণ্ডের শেষ কয় পাতায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' দ্বিতীয় খণ্ড থেকে খানিকটা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। কেননা তাঁর আত্মজীবনীও অসম্পূর্ণ ছিল এবং আত্মজীবনীর পর 'বিবি কুলসুম' রচনা করেন মশাররফ হোসেন। এবং এর কিছুকাল পরেই মশাররফ হোসেন মৃত্যু-মুখে পতিত হন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) বলা হয়েছে, "বস্তানীর প্রায় দশ আনা অংশ প্রকাশ হইল। ছয় আনা পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল। যদি কোন মহানুভব মহাজনের মনে ধরে আর সেই সর্বসিদ্ধি-দাতা জয়জগদীশের কৃপা হয়, তবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশের আশা করা যায়।"

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে রচয়িতা হিসাবে মশাররফ হোসেনের নাম ছিল না। তবে পরবর্তী পুস্তক 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মশাররফ হোসেনই গাজী মিয়াঁ। অধিকন্তু এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী হলেন 'উদাসীন পথিক', এটিও অবশ্য মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম। কেননা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থটি তিনি 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন।

প্রথম খণ্ড 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মোট ২০টি অধ্যায় বা 'নথি' এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা হচ্ছে ৪০০। দ্বিতীয় খণ্ডে ৪টি অধ্যায় বা 'নথি' থাকার কথা ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয়নি বা কোথাও পাওয়া যায়নি।

'বস্তানী' হচ্ছে বাংলাদেশের তিনটি মহিলা-জমিদারের চিত্র। এঁরা সকলেই বিধবা। এঁরা হলেন—পয়জারন্নেসা, সোনাবিবি এবং মনিবিবি। ঘটনা-স্থলের নাম হচ্ছে 'অরাজকপুর'। আর পুস্তকের অন্য চরিত্রগুলির নামকরণের মধ্যেও একটা তাৎপর্য রয়েছে। চরিত্রগুলির মূল বৈশিষ্ট্য যেন এই নামের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'ভেড়াকান্ত', 'দাগাদারী', 'জয়ঢাক', 'সবলোট চৌধুরী', 'মাথা পাগলা রায়', 'ঘরভাঙ্গা', 'লাল আলু', 'জ্বালাতন্নেসা',

'চাঁদবদনী', 'পয়জারন্নেসা', 'শিকলি কাটা টিয়ে' ইত্যাদি হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রের নাম। স্থানের নামগুলিও অর্থপূর্ণ। 'অরাজকপুর', 'যমদ্বার', 'নচ্ছারপুর', 'হাতপাতা', 'নেংটিচোরা' ইত্যাদি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের নাম।

এ গ্রন্থে দুটো কাহিনী—একটি পয়জারন্নেসা আর 'হাকিম সাহেব' বা ভোলানাথ বাবুকে নিয়ে। আর একটি হচ্ছে সোনাবিবি আর মনিবিবিকে নিয়ে। সোনাবিবির পুত্র জয়ঢাক হচ্ছে মনিবিবির জামাতা। এই জয়ঢাকই বিরোধের মূল।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল:

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি, অরাজকপুরের জমিদার পয়জারন্নেসার সঙ্গে হাকিম ভোলানাথ বাবুর খুব ঘনিষ্ঠতা। ভোলানাথ বাবু প্রায়ই বেগম পয়জারন্নেসার গৃহে যাতায়াত করেন। এবং ঋতুরাজ বাবু যিনি দ্বিতীয় হাকিম তিনিও বেগম সাহেবার সঙ্গে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

যমদ্বার গ্রামের আর এক দুশ্চরিত্র জমিদার সবলোট চৌধুরীর জীবনে মাত্র দু'টি আকর্ষণ আছে; এক হচ্ছে নারী, দুই হচ্ছে অর্থ। তাঁর আমলারা গভীর রাত্রিতে তাঁর জন্য নারী সংগ্রহের অভিযানে বের হতো। যমদ্বারের অপর দুই মহিলা-জমিদার সোনাবিবি এবং মনিবিবির মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে সবলোট চৌধুরী বেশ কিছু উপার্জন করে নিল। বিধবা সোনাবিবির নাবালক পুত্র জয়ঢাক মনিবিবির এক কন্যাকে বিয়ে করে। মনিবিবির ইচ্ছা, জামাতার পিতার সম্পত্তি দখল করা। কিন্তু নাবালকত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সোনাবিবি উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, এই ছিল আদালতের হুকুম। মনিবিবির প্ররোচণায় জয়ঢাক তার আপন মায়ের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করে এই মর্মে যে, আদালত যেন তার মাকে তার মৃত পিতার সম্পত্তি তদারকের দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি দেয়। জয়ঢাক তার শাশুড়ীর বাড়ীতেই পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে থাকে। মনিবিবির লোকেরা সোনাবিবিকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। অবস্থা এমন হয় যে, সোনাবিবি এক রকম অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। সবলোট দুই মহিলা-জমিদারকে আশ্বাস দেন, তিনি তাঁদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেবেন। এবং এই অজুহাতে উভয়ের কাছ থেকে কিছু অর্থও আদায় করেন। কুঞ্জ-নিকেতন হচ্ছে বেগম পয়জারন্নেসার প্রাসাদোপম বাড়ীর নাম। পয়জারন্নেসার

স্বামী বিরাট ভূসম্পত্তি রেখে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। বেগম সাহেবার দুই ভাই এই সুযোগে কিছু অর্থ উপায়ের সুযোগ পায়। এই দুই ভাই বেগম সাহেবাকে কোলকাতা নিয়ে যায়, তাঁকে সমাজের অভিজাত মহলে মেলামেশা করবার সুযোগ করে দেয়। অল্পদিনের মধ্যে এক গ্রাম্যবধূ শহুরে চালাক-চতুরা সপ্রতিভ মহিলায় রূপান্তরিত হয়। কোলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে এলেন বেগম সাহেবা। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে বেগম সাহেবার খুব মাখামাখি আরম্ভ হয়। ভোলানাথ বাবু বেগম সাহেবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেননা তিনি পর্দাপ্রথার শৃঙ্খল ভেঙে বাইরে আসতে পেরেছেন ; মুসলমান সমাজের এ এক গৌরবের ব্যাপার এবং মফঃস্বলে এমন একজন সংস্কৃতিপরায়ণা মহিলার দেখা পাওয়া সত্যি সৌভাগ্যের কথা। বেগম সাহেবার অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যার জন্য তিনি 'হাকিম সাহেবে'র সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাঁকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতেন। বেগম সাহেবার আরও অনেক স্তাবক ছিল। 'শিকলি কাটা টিয়ে' নামে আর এক উকিলও গোপনে বেগম সাহেবার বাড়ীতেই থাকতেন। 'শিকলি কাটা টিয়ে' হাকিম সাহেবের প্রতি বেগমের আসক্তি টের পেয়ে খুবই ঈর্ষান্বিত হন।

এদিকে সোনাবিবি ও মনিবিবির দ্বন্দ্বের কথায় ফিরে আসা যাক। সোনাবিবির এক দুধ-ভাই দাগাদারীকে মনিবিবির কর্মচারীরা অপমান ও মারধোর করবে বলে ঠিক করে। কেননা তাদের ধারণা দাগাদারীর প্রতি সোনাবিবি অধিক স্নেহপরায়ণ। এক মিথ্যা অভিযোগে দাগাদারী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়। এতে সোনাবিবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। সোনাবিবি পুলিশকে জানান যে, সে তার স্বগৃহে অন্তরীণ। পুলিশ সোনাবিবিকে অরাজকপুরের হাকিমের কাছে আবেদনের উপদেশ দেয়। সোনাবিবি পুলিশকে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদানে খুশী করেন।

এদিকে 'শিকলি কাটা টিয়ে'র হঠাৎ অন্তর্ধানে বেগম সাহেবা হতভম্ব হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে ঋতুরাজ বাবু বেগম সাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ঋতুরাজ বাবু বলেন যে, কে এক 'ভেড়াকান্ত' ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, বেগম সাহেবাও ভেড়াকান্তের প্রতি রুষ্ট। যদিও মীর মশাররফ এই বেগম সাহেবার অসন্তোষের কোন যথাযথ বর্ণনা করেননি। বেগম সাহেবা সে সময় সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমন সময় মৌলভী সাহেব—যিনি একজন সাব-ডেপুটি—দেখা করতে আসেন।

মৌলভী সাহেব চলে যাওয়ার পরই উকিলবাবু এসে উপস্থিত। তিনি সদর দরজায় ঘোড়া হ'তে পড়ে যাওয়ায় বেশ একটা সোরগোল পড়ে যায়। এই ফাঁকে ঋতুরাজ বাবু, যিনি অনেকক্ষণ যাবৎ বেগম সাহেবার বাসায় ছিলেন, গোপনে প্রস্থান করেন। ঋতুরাজ বাবু চান না যে, উকিল বাবু তাঁকে বেগম সাহেবার বাসায় দেখেন।

দাগাদারী জেল হাজত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরছিল। পথে ভেরাকান্তের সঙ্গে দেখা। ভেড়াকান্ত তাকে সাবধান করে করে দেয় এই বলে যে, মনিবিবির লোকেরা তার পেছনে আছে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র লেখক ভেড়াকান্তের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ভেড়াকান্ত একজন সৎ ব্যক্তি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এজন্য যে, 'ভেড়াকান্ত' আসলে লেখক স্বয়ংই। মনিবিবি ছাড়া ভেড়াকান্তের আর একজন শত্রু ছিল— সে হলো জ্বালাতন্নেসা। তিনিও আর একজন জমিদার এবং বেগম সাহেবার বান্ধবী। এই জ্বালাতন্নেসার অনুরোধেই বেগম সাহেবা চক্রান্ত ক'রে হাকিম সাহেব ও ভেড়াকান্তের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। একমাত্র সোনাবিবিই ছিল ভেড়াকান্তের হিতাকাঙ্ক্ষিণী। সোনাবিবি দাগাদারীর জন্য উৎকণ্ঠিত। দাগাদারী হাজত থেকে মুক্তি পাওয়ায় সোনাবিবি খুব খুশী। সোনাবিবি কিছুতেই তাঁর সম্পত্তি পুত্র জয়ঢাকের হাতে ছেড়ে দিবেন না বলে ঠিক করলেন।

অষ্টম অধ্যায়ে লেখক ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে উচ্চপ্রশংসা করেছেন। তিনি দেশীয় বিচারকদের (হাকিম) অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ বলে বর্ণনা করেছেন। এ অধ্যায়ে সোনাবিবির লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর চাকর-বাকরেরা তাঁর কথা শুনত না। মনিবিবির লোকদের চক্রান্তেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটে। এ সময় ভেড়াকান্ত সোনাবিবির সাহায্যে এগিয়ে আসে। ভেড়াকান্ত জেলা-জজের কাছে আবেদন করেন যে, সোনাবিবি যেন অবাধে চলাফেরা করতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা আসা-যাওয়া করতে পারেন। জজ পুলিশকে এই মর্মে আদেশ দেয় যে, সোনাবিবির চলাফেরায় কেউ বাধা দিলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এবং সোনাবিবি যেখানে যেতে চান পুলিশ তাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দেবে। মনিবিবির লোকেরা এতে হতাশ হয়। কিন্তু তারা গোপনে হাকিম সাহেবের কাছ থেকে এক হুকুমনামা জারী করে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সোনাবিবি তাঁর নাবালক পুত্র জয়ঢাকের সম্পত্তির কোন অংশ ভোগ-দখল করতে পারবে না। সোনাবিবি তাঁর স্থাবর

সম্পত্তির সব নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখন পুলিশ হাকিম সাহেবের হুকুমনামা নিয়ে উপস্থিত। পুলিশের সম্মুখেই সোনাবিবির লোকেরা আর মনিবিবির লোকেরা হাতাহাতি করে। জয়ঢাক এসে তার মায়ের দেহ অনুসন্ধান করে। কেননা সে শুনেছিল, তার মা সোনার অলংকার সব সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সোনাবিবি তাঁর একমাত্র পুত্রের এহেন দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং কপর্দকবিহীন অবস্থায় সবকিছু ফেলে যমদ্বার ত্যাগ ক'রে অরাজকপুরে চলে যান। তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ও সহায় ছিল দাগাদারী।

হাকিম সাহেব আর দারোগা-পুলিশেরা যমদ্বারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করছিল। হাকিম সাহেব ভাবছিলেন, এই গোলযোগের পশ্চাতে আসল লোকটি কে? তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। হাকিম সাহেবের ধারণা, সোনা-বিবি আর মনিবিবির বিরোধের মূলে আছে ভেড়াকান্ত। তাঁর অনুমান যে, ভেড়াকান্ত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লিখেছে। হাকিম সাহেব আর ঋতুরাজ বাবু ঠিক করলেন যে, ভেড়াকান্তকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। তাঁরা বেগম সাহেবার দৈহিক রূপের বর্ণনায় সময় অতিবাহিত করছিলেন, এমন সময় বড়বাবুও (সম্ভবতঃ হাকিম সাহেবের প্রধান কেরানী) এসে এই কদর্য আলোচনায় যোগ দিলেন। তারপর মৌলভী সাহেব এলেন। ঋতুরাজ বাবু হঠাৎ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এক বিরূপ মন্তব্য করে বসেন।

মনিবিবির অনেক আমলা ছিল। তাদের কারো নাম 'মাথা পাগলা রায়', 'ঘরভাঙ্গা সান্ন্যাল'। 'মাথা পাগলা' ভেড়াকান্তকে মারতে বদ্ধপরিকর। তারপর 'ঘরভাঙ্গা' প্রস্তাব করলো যে, একটা জাল দলিল ক'রে ফেলা যাক। তাতে লেখা থাকবে যে, সোনাবিবি স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্রকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন। রেজিস্ট্রার সাহেবকে কিছু ভাল রকমের ঘুষ দিলেই এমন একটি দলিল রেজিস্ট্রী করে নেওয়া যায়। 'মাথা পাগলা' প্রস্তাব করলো যে, জোরেই সব সম্পত্তি দখল করে নেওয়া যায়। তার আর একটি প্রস্তাব হলো যে, 'লাল আলুকে'ও হত্যা করতে হবে। লাল আলু মনিবিবির একজন প্রাক্তন কর্মচারী এবং বর্তমানে তাঁর পাণিপ্রার্থী। এখানে লেখক 'ভিখারিণী' নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এই ভিখারিণী ভবিষ্যৎ গণনায় পটু। মনিবিবি তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে কিনা তা জানবার জন্য অধীর আগ্রহে ভিখারিণীর ভবিষ্যৎ গণনার জন্য প্রতীক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে মনিবিবি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তা ছিলেন।

এদিকে সোনাবিবি অরাজকপুরে আছেন। তাঁর অনেক হিতৈষী তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করে। এখানে আমরা গাজী মিয়ঁার দেখা পাই। যে সমস্ত উকিল পয়সা উপার্জনের লোভে দু'পক্ষকে মামলা মোকদ্দমা করতে প্ররোচিত করে, তাদের তিনি জঘন্য ভাষায় নিন্দা করেছেন। তারপর পর্দার অবরোধে যে সমস্ত মুসলমান মহিলা চিরজীবন বন্দিনী হয়ে আছেন, যারা লেখাপড়ার আলোক থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, তাদের জন্য গাজী মিয়ঁা আক্ষেপ করেছেন। সোনাবিবিকে দাগাদারী ভাল একজন শহুরে ব্যারিস্টার আনিয়ে মামলার তদবির করতে উপদেশ দেন। একদিন 'লাল আলু' আসে সোনাবিবির কাছে। 'লাল আলু' আদালতে মামলা দায়ের করেন যে, মনিবিবি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী এবং মনিবিবির সম্পত্তির সে-ই মালিক। সোনাবিবি জানতে চাইলেন, এই আবেদনের আসল উদ্দেশ্যটা কি? ভেড়াকান্তও এই সময় সোনা-বিবির বাড়ীতে হাজির ছিলেন। তার বক্তব্য এই যে, আসলে 'লাল আলু'র মতলব হচ্ছে মনিবিবিকে ব্ল্যাকমেল ক'রে কিছু টাকা আদায় করা। স্বামী বর্তমান থাকাকালেই 'লাল আলু'র অবৈধ প্রণয় ছিল। 'লাল আলু' আর ভেড়াকান্ত চলে যাওয়ার পর দাগাদারী সোনাবিবিকে বলে যে, 'হাকিম সাহেবে'র সঙ্গে যেহেতু বেগম সাহেবার খুব দহরম মহরম, অতএব সোনা-বিবি যেন বেগম সাহেবার সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করেন। দাগাদারীর এই উপদেশ সোনাবিবির খুব পছন্দ হ'ল না। সোনাবিবি বললেন, দাগাদারী নিজেই যেন বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করে।

বেগম সাহেবা তাঁর প্রণয়ী উকিলবাবু বা আকালের বধূর সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। বেগম সাহেবা অনুরোধ করলেন যে, উকিলবাবু যেন দশ হাজার টাকা পেলেও ভেড়াকান্তের মামলায় সাহায্য না করেন। এই সময় বাংলাদেশের বাইরে থেকে কয়েকজন সঙ্গীত অনুরাগী বেগম সাহেবা কর্তৃক আয়োজিত সংকীর্তন-সভায় যোগদান করেন। উকিলবাবু পর্দার আড়াল থেকে সংকীর্তনের গান শোনেন। এখানে লেখক কঠোর ভাষায় বেগম সাহেবার এই বেহায়াপনা ও অনৈসলামিক আচার-ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। গাজী মিয়ঁার জবানীতে লেখক বলেন যে, বেগম সাহেবার মুসলমান সমাজ পরিত্যাগ করা উচিত। এই পর্যায়ে গাজী মিয়ঁা বেগম সাহেবাকে বেগম ঠাকুরাণী নামে অভিহিত করেন। সঙ্গীত-আসর শেষ হওয়ার পরপরই হাকিম সাহেব, ঋতুরাজ বাবু, বক্কেশ্বর বাবু, এক নূতন

বাবু, জেল-ডাক্তার প্রমুখ বেগম সাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বেগম সাহেবার প্রণয়ী উকিলবাবু আড়াল থেকে এদের সবার কথাবার্তা শোনেন এবং শেষে বিরক্ত হয়ে চলে যান।

মনিবিবির কন্যারা ভিখারিণীর আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁর অবিবাহিতা কন্যারা ভাল স্বামীর প্রার্থনা জানায় এবং মনিবিবি স্বয়ং প্রার্থনা করেন যে, আলুর সঙ্গে তাঁর বিরোধের অবসান হোক। ভিখারিণী একদিন লাল আলু, ঘরভাঙ্গা ও অন্যদের আলোচনা গোপনে জানতে পারে। আসলে 'লাল আলু' কিছু টাকা চায়। লাল আলুকে ভিখারিণী একদিন ধরে বসল, সে বার হাজার টাকা কেন দাবী করছে তা ভিখারিণী জানতে চায়। প্রকৃতপক্ষে 'লাল আলু' পাবে মাত্র চার হাজার টাকা। ভিখারিণীর এই কথায় লাল আলু ভয় পায় এবং তার দরখাস্ত প্রত্যাহার করে।

এদিকে সোনাবিবি আর মনিবিবির দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। একদিন মনি-বিবি ও সোনাবিবির কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের জন্য যাবার পথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সোনাবিবির কর্মচারীরা উপস্থিত পুলিশ দলকে মেরে চলে যায়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন চলছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে। অরাজকপুরের কয়েকজন মুসলমান একদিন ঋতুরাজ বাবুকে নামাজের সময় গান-বাজনার আয়োজন না করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু ঋতুরাজ বাবু একদিন সন্ধ্যায় গানের আসর বসায়, তখন একদল লোক ঋতুরাজ বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে। বেগম সাহেবাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উপরও আক্রমণ হয়। ঋতুরাজ বাবু এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং মুসলমান সমাজের উপর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তাঁর ধারণা, ভেড়াকান্ত এ সবের পেছনে আছে।

এর মধ্যে যে পুলিশ কর্মচারীকে সোনাবিবির লোকেরা প্রহার করেছিল তিনি ঋতুরাজ বাবুর বাড়ীতে এসে সব বলে দেন। হাকিম সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এতে খুব উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হন। পুলিশ কর্ম-চারিটিরও ধারণা যে, ভেড়াকান্ত পুলিশকে প্রহার করার ব্যাপারে জড়িত।

অরাজকপুরের হাকিমের এজলাসে দাগাদারীর মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। 'হাকিম সাহেব' দাগাদারীর মামলা মুলতবী রাখেন এবং তাকে হাজতে

৭—

রাখবার হুকুম দেন। এ সংবাদে সোনাবিবি মর্মাহত হন এবং গোপনে জেল হাজতে দাগাদারীর জন্য খাবার পাঠান।

সোনাবিবির প্রতি বেগম সাহেবার মনোভাব কেমন ছিল তা এখানে লেখক বর্ণনা করছেন। বেগম সাহেবার ইচ্ছা ছিল দাগাদারীকে সোনাবিবির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। দাগাদারী এক সময় বেগম সাহেবার প্রিয়-ভাজন ছিল। একদিন বেগম সাহেবা সোনাবিবির বাড়ীতে গিয়ে হাজির। বেগম সাহেবা বললেন যে, দাগাদারীর মুক্তির জন্য সোনাবিবির চেষ্টা করা উচিত। সোনাবিবি বেগম সাহেবার এই শ্লেষ বুঝতে পারেন এবং বলেন যে, তাঁর বন্ধু হাকিম সাহেবের সহায়তায় বেগম সাহেবা নিজেই দাগাদারীকে মুক্ত করতে পারবেন। সোনাবিবি ও বেগম সাহেবা যখন আলাপ করছিলেন, তখন ভেড়াকান্ত আড়াল থেকে সব শুনছিল। বেগম সাহেবা চলে গেলে ভেড়াকান্ত ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ভেড়াকান্ত বলল যে, বেগম সাহেবা এসেছিলেন অন্য মতলবে। দাগাদারীর প্রতি সোনাবিবির বিশেষ কোন আকর্ষণ আছে কিনা তা জানতেই বেগম সাহেবা এসেছিলেন।

মনিবিবি সম্পর্কে ভেড়াকান্ত বলল যে, 'লাল আলু' অধুনা মনিবিবির বাড়ীতে বেশ সুখে আছে। মনিবিবি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন এবং 'লাল আলু' তাঁর সেবায় রত। অসুখের সময় তাঁর মেয়েরা তাঁকে দেখাশুনা করতো না। এর মধ্যে ভিখারিণী মনিবিবির বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিখারিণী বলে যায় যে, মনিবিবির ব্যাধি চিকিৎসার বাইরে। পাপের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে মরতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই মনিবিবি মৃত্যু-বরণ করেন। 'লাল আলু'ও মনিবিবির বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

একই পরিচ্ছেদে লেখক বেগম সাহেবার গল্পও বর্ণনা করেন। গভীর রাত্রিতে পুরুষের ছদ্মবেশে বেগম সাহেবা উকিলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কেননা, পরদিন ভেড়াকান্তের মামলার শুনানী হবার কথা। বেগম সাহেবা উকিলবাবুকে ভেড়াকান্তের মামলার ওকালতি না করতে অনুরোধ করেন। এই সুযোগে উকিলবাবু বেগম সাহেবার কাছে এক হাজার টাকা চেয়ে বসেন। বেগম সাহেবা তখই এক অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন। ফলে পরদিন আর ভেড়াকান্তের মামলার শুনানী হলো না।

ভিখারিণী সোনাবিবির বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সোনাবিবি তখন পর্যন্ত আশা করছিলেন যে তাঁর পুত্র জয়ঢাক তাঁর কাছে ফিরে আসবে। সোনাবিবি

এক সন্ন্যাসী গুরুজীকে নিযুক্ত করেন এই উদ্দেশ্যে। গুরুজী একটি ছোট মূর্তি তৈরী করে তাতে তীর মারতে থাকেন। চল্লিশ দিনের মধ্যে জয়ঢাক ফিরে না এলে সে মারা যাবে। জয়ঢাক এসব খবর পেয়ে জিলা জজের কাছে আবেদন করে। জজ সাহেব এসব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দেন।

দাগাদারী তখন পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছে। দাগাদারীর স্ত্রী সোনাবিবির কাছে তার স্বামীর মুক্তির ব্যাপারে এসে কোন সাহায্য পায় না। এদিকে ভেড়াকান্তের মামলার শুনানীও হয় না। অনেকদিন পরে ভেড়াকান্তের মামলার শুনানী হলো। পুলিশকে প্রহারের ব্যাপারে দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করায় ভেড়াকান্তের দু'বছর কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হলো। এ সংবাদে ভেড়াকান্তের গৃহে ক্রন্দনরোল উঠে। সোনাবিবি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন বটে, কিন্তু ভেড়াকান্ত মুক্তি পেলেন না। এমনকি বেগম সাহেবা পর্যন্ত ভেড়াকান্তের শাস্তিতে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি দাগাদারীর মুক্তির জন্য অধিকতর উদগ্রীব ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে হাকিম সাহেবকে অনুরোধ জানালেন।

শেষ পর্যন্ত নচ্ছারপুর জিলার জজের আদেশবলে ভেড়াকান্ত মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাকে হাজার টাকা জরিমানা দিতে হলো। ভেড়াকান্ত গৃহে আত্মগোপন ক'রে রইলেন। কেননা হাকিম সাহেব তাকে শায়েস্তা করতে চান। এদিকে দাগাদারীও মুক্তি পেল। দাগাদারী বেগম সাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। বেগম সাহেবার কতকগুলি পত্র ভেড়াকান্তের হস্তগত হয়েছিল, সেগুলি উদ্ধার করার জন্য দাগাদারীকে বলা হলো। দাগাদারী ভেড়াকান্তের স্ত্রীর কাছ থেকে সে চিঠিগুলি উদ্ধার করতে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

কিছুদিন পরে খামখেয়ালীগঞ্জে মহকুমা হাকিমের দরবারে সোনাবিবি আর দাগাদারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মচারী প্রহারের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোনাবিবি, দাগাদারী এবং ভেড়াকান্ত অব্যাহতি লাভ করে।

এদিকে দাগাদারী ভাবছিল যে, যদি জয়ঢাক এবং সোনাবিবি আপোষ ক'রে ফেলে তবে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। সুতরাং সোনাবিবির কাছ থেকে মাসিক একশো টাকা ভাতার বন্দোবস্ত করবার জন্য সে উঠে-পড়ে লেগে যায়। সোনাবিবি এতে খুব অসন্তুষ্ট হন। তারপর আদালতের এক হুকুম অনুযায়ী তাঁর স্বামীর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার থেকে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। গুরুজীও এদিকে অন্তর্হিত হন। কাজেই তাঁর পুত্র

জয়ঢাকের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। ক্ষোভে দুঃখে সোনা-বিবি দেশ ছেড়ে মক্কার পথে তীর্থে রওয়ানা হলেন। দাগাদারী বেগম সাহেবার কাছে গেল কিন্তু বেগম সাহেবা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন না। বেগম সাহেবা খুব চিন্তিত ও বিমর্ষ ; কেননা ঋতুরাজ বাবুর বদলী হবার আদেশ এসেছে। তিনি শীঘ্রই অরাজকপুর ছেড়ে চলে যাবেন।

প্রথম খণ্ড 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী' এখানেই শেষ। দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক হিসাবে মুদ্রিত হয়নি। 'আমার জীবনী'র সঙ্গে একই পুস্তকে দ্বিতীয় খণ্ড 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'র অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়। সেটুকুর সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া গেল। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

গাজী মিয়ঁা 'শশধর' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদকের প্রশংসা করেন। এই পত্রিকায় অরাজকপুরের হাকিম সাহেব আর বেগম সাহেবার কুকীর্তির কথা প্রকাশিত হয়। হাকিম সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পাদককে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু আবার ভেড়াকান্তের মামলার কথা মনে করে তিনি এ ব্যাপারে নিরস্ত হন। তবে চক্রান্ত ক'রে জনৈক কালীকৃষ্ণ বাবুকে পাঠিয়ে দেন রাজধানীতে। কালীকৃষ্ণ বাবু চালাকী ক'রে 'শশধর' সম্পাদককে হাকিম সাহেবের এলাকা অরাজকপুরে নিয়ে আসে এবং তাঁর নামে গ্রেফতারী পরো-য়ানা জারী করেন হাকিম সাহেব। থানায় তাঁকে আটক করা হয় এবং দু'শো টাকা জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এই শর্তে যে, যখনই তলব করা হয় তখনই যেন অরাজকপুরের হাকিমের এজলাসে তিনি হাজির হন। এদিকে বেগম সাহেবার লোকজন সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ভুলক্রমে বেগম সাহেবার নিযুক্ত গুণ্ডারা অন্য এক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে এবং সম্পাদক মহাশয় নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে অরাজকপুরের হাকিম সাহেব অন্যত্র বদলী হয়ে গেলেন। ঋতুরাজ বাবুরও বদলির আদেশ এসেছে। তিনি ছুটি নিয়ে বসে আছেন। বেগম সাহেবার মন-মেজাজ বিশেষ ভাল যাচ্ছে না ; তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। বিগত কয়েক বছরের ক্রমাগত অপব্যয়ের দরুন তাঁর নিদারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হলো। এমনকি তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা কেউ তাঁকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে না। তাঁর দাসদাসীরা চলে যেতে লাগল একে একে। তাঁর গচ্ছিত অলঙ্কার, স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রয় করা আরম্ভ হলো। ঋণের দায়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। এমনকি তাঁর

এক কালের প্রণয়ী উকিলবাবু 'আকালের বঁধূ' বেগম সাহেবার বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা ক'রে বসল। বেগম সাহেবা চট্টগ্রামে তাঁর বন্ধু 'ডাক্তার বাবু'র কাছে যাবেন স্থির করলেন। প্রথমে তিনি সুনামগঞ্জে তাঁর ভাই হটুর কাছে গেলেন। কিন্তু টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর ভাই কোন সাহায্যই করল না। চট্টগ্রাম পৌঁছে ডাক্তারবাবুর কাছে বেগম সাহেবা লোক পাঠালেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু বেগম সাহেবাকে চিনতেই পারলেন না এবং বাড়ীতে বেগমকে ঢুকতেই দিলেন না। এরপর বেগম সাহেবা স্থির করলেন, মেদিনীপুরে যাবেন। কিন্তু এদিকে তাঁর ভৃত্য ও নৌকার মাঝিরা তাদের বেতন না পেলে কোথাও যাবে না, বলে বসলো। বেগম সাহেবা বললেন, "মেদিনীপুরে 'শিকলী কাটা টিয়ে' থাকে, সেখানে গেলেই অর্থ পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে তাঁর কাছে এক কপর্দকও নেই। সুতরাং মেদিনীপুরে যেতেই হবে।" নৌকার মাঝিরা গোপনে স্থির করলো, তারা তাদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করবে। রাত্রিতে মাঝিরা ঘুমন্ত থাকাকালে বেগম সাহেবা চুপে চুপে নৌকা থেকে নামলেন এবং মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটা শুরু করলেন।

বেগম সাহেবা কী করবেন ভেবে পান না। অন্ধকার রাত্রি। চাঁদের ক্ষীণ আলোতে পথ হাঁটতে হাঁটতে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন মনে করেন। একবার ভাবেন, জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু আবার কী ভেবে নিরস্ত হন। হঠাৎ দূরে একটা আলো দেখে তার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেন। হাঁটতে হাঁটতে বেগম সাহেবা এসে পৌঁছলেন এক সঙ্গীত আসরের কাছে। এখানে এক সহৃদয়া মহিলা তাঁকে দেখে অবাক হয়ে যান এবং তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। বেগম সাহেবা সেই মহিলাকে তাঁর জীবনের কাহিনী বিধৃত করেন। বেগম সাহেবা বললেন যে, তিনি মেদিনীপুর যেতে চান। বেগমকে নিয়ে সেই মহিলাটি মেদিনীপুর পৌঁছেন। মেদিনীপুরে মহিলার এক পুত্র চাকুরী করেন। বেগম তাঁর পূর্বপ্রণয়ী 'শিকলি কাটা টিয়ে'র বাড়ীতে ঢুকতে যেয়ে অপমানিত হন। 'শিকলি কাটা টিয়ে' বিবাহিত এবং তার স্ত্রী বেগম সাহেবার নিন্দাবাদ ক'রে দরজা থেকেই বের ক'রে দেয়। বেগম সাহেবা ভগ্ন-মনোরথ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সেই মহিলাটি আবার তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। তিনিই প্রস্তাব করলেন, তাঁরা সবাই দার্জিলিং যাবেন। সেখানে সেই মহিলার পুত্র বদলী হয়ে যাবেন।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' দ্বিতীয় খণ্ড এই পর্যন্তই মুদ্রিত হয়েছিল 'আমার জীবনী'তে। এখানে দ্বাবিংশ নথি পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল। যদিও লেখক বলেছিলেন, ২৪ নথিতে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' শেষ হবে। তবে যাই হোক, এখানে গল্প মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে বলা যায়।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র গঠনকৌশল

'বস্তানী' বহু শাখা-প্রশাখায়িত দীর্ঘ একটি উপন্যাস। এটিকে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস বলা যায় না। বরং এটিকে শিথিলবদ্ধ উপন্যাস বলা যেতে পারে। পুস্তকের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে জয়ঢাকের সম্পত্তি দখল নিয়ে সোনাবিবি ও মনিবিবির সংঘর্ষ। আর রয়েছে বেগম সাহেবা পয়জারন্নেসার কীর্তিকলাপ।

এই দুইটি প্রধান কাহিনীকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে তাঁদের তিনজনের ভৌগোলিক অবস্থানের ঐক্যের জন্যে। তাঁরা সবাই এক অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু এই দু'কাহিনীর পরিণতি দুই দিকে। বেগম সাহেবার কার্যকলাপের সঙ্গে সোনাবিবি ও মনিবিবির সংঘর্ষের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। এ পুস্তকে প্রায় পঞ্চাশজন পাত্রপাত্রী আছেন। এর মধ্যে বহু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে, যারা মূল ঘটনার পরিণতিতে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক। এরা অনেকে দৃশ্যপটে উপস্থিত হয় বিনা কারণেই। এ ধরনের চরিত্রচিত্রণ শুধু সামাজিক নক্‌সা জাতীয় পুস্তকেই দেখা যায়। কিন্তু এই পুস্তকে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের আগমন-নির্গমন উপন্যাসটিকে অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ ক'রে ফেলেছে। লেখক স্বয়ং 'ভেড়াকান্ত'রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। গ্রন্থে তাঁর ভূমিকা যে কী, তা-ও ঠিক বুঝা যায় না। তিনি শুধু দর্শক মাত্র—ঘটনার সাক্ষী নয়, অথবা তিনি মূল কাহিনীর ক্রিয়াকলাপে তেমন কোন অংশও গ্রহণ করেন না। এই ভেড়াকান্ত ছাড়াও আর এক ব্যক্তি আছেন, তিনিও লেখকেরই মুখপাত্র। তিনি 'গাজী মিয়াঁ'। এ গ্রন্থে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। তিনি শুধু মন্তব্য করে যান। গ্রন্থের চরিত্রসমূহের সমাজবিরোধী, নীতিবিরোধী কার্যকলাপ ও অনুষ্ঠানের পরই 'গাজী মিয়াঁ' তাঁর বাণী দেন। অবশ্য 'গাজী মিয়াঁ'র মন্তব্যসমূহ কোন কোন সময়ে চমকপ্রদ, কোন সময়ে অত্যন্ত তির্যক, কখনো অত্যন্ত সরস। তিনি অভিজাত মুসলমান সমাজকে ব্যঙ্গ করেন। পশ্চিমের রীতি-নীতি গ্রহণ করাকে তিনি বিদ্রূপ করেন। অবরোধ-প্রথা অবহেলা

করাকে তিনি ব্যঙ্গ করেন। নর-নারীর সম্মিলিত সঙ্গীত আসরের তিনি নিন্দা করেন। নর-নারীর অবাধ মেলামেশাকেও তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। কখনও বা তাঁর মন্তব্য সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গ্রন্থের প্রকাশ ইতিপূর্বে হয়েছিল। এ ধরনের উপন্যাসে লেখক বা নায়ক মাঝে মাঝে মন্তব্য করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মশাররফ হোসেন এ ব্যাপারে যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর নিকট ঋণী সে-কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এ রীতি এসেছিল ইংরেজী সাহিত্য থেকে—বিশেষ করে হেনরী ফিল্‌ডিং এবং চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস থেকে।

এ গ্রন্থের চরিত্রগুলো সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র হচ্ছে তিনজন মুসলমান মহিলা-জমিদার। এঁরা সবাই বিধবা। আর এক প্রধান চরিত্র হচ্ছেন ভোলানাথ বা হাকিম সাহেব। গুরুত্বপূর্ণ না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ আরও কয়েকটি চরিত্র হচ্ছে: ভেড়াকান্ত, দাগাদারী ও জয়ঢাক। আর এ গ্রন্থে এত অপ্রধান চরিত্র আছে যে, তাদের কোন ভূমিকাই নেই বলা চলে। শুধু কাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি ও কাহিনীকে বর্ণবহুল করা ছাড়া আর এদের কোন কাজ নেই।

প্রথমে ধরা যাক পয়জারন্নেসা বা বেগম সাহেবা বা বেগম ঠাকুরাণীর কথা। পয়জারন্নেসাকে লেখক বেগম সাহেবা অর্থাৎ কোন নবাবের স্ত্রী বলে বর্ণনা করেছেন—যদিও তাঁর স্বামী বা পিতা কেউ নবাব ছিলেন না। কালক্রমে তাঁর আসল নামটি বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং সমগ্র পুস্তকে তাঁকে বেগম সাহেবা বলে অভিহিত করা হবে। অরাজকপুরের তিনি ছিলেন বিধবা-জমিদার। কাহিনীর সূত্রপাতে তিনি ছিলেন ধনবতী মহিলা। তিনি বিলাসিতা ও আড়ম্বর পছন্দ করেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে উঠা-বসা করেন এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ও করেন। তিনি মুসলমানের কন্যা, কিন্তু তিনি অবরোধ-প্রথা মানেন না এবং ইসলামে প্রচলিত নিয়ম-কানুনকেও তিনি অবহেলা করেন। বিপরীতপক্ষে তিনি সঙ্গীত ও নৃত্যে খুব উৎসাহী এবং পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও সঙ্গীতে-সঙ্কীর্তনে অংশ গ্রহণ করতে খুব আগ্রহী। একই সঙ্গে তিনি দুই ব্যক্তির প্রণয়ী। তাঁর গৃহে গোপনে তাঁর প্রণয়ীরা অবস্থান করেন। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে প্রায়শঃই তাঁর সাক্ষাৎ

হয় এবং তাদের আতিথেয়তা করাকে বেগম সাহেবা খুব মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন। তাদের তিনি মদ্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। এ থেকে বেগম সাহেবার একটি মনোভাব খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—সেটি হলো, আতিথেয়তা করাকে তিনি খুব পছন্দ করেন এবং অর্থ ও মর্যাদার দিক থেকে সমাজের উচ্চশিখরে তিনি অবস্থান করতে চান।

খুব অল্প বয়সেই তিনি স্বামীহারা হন। তাঁর দুই ভ্রাতা ভগ্নীর ঐশ্বর্যের অপব্যয় করেন, এবং তাঁকে কোলকাতার উচ্চসমাজে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে একজন গ্রাম্য-মহিলা পয়জারন্নেসা শহুরে মহিলায় পরিণত হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে এল। তাঁর প্রণয়ীরা একে একে তাঁকে ত্যাগ করলেন। তাঁর অর্থও নিঃশেষিত হয়ে এল – তাঁর যৌবন গেল অতীতের বস্তু হয়ে, সেদিন থেকেই তাঁর লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সূত্রপাত। যে সব কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম ছিল, তাঁরা সবাই অরাজকপুর থেকে বদলী হয়ে চলে গেলেন। তাঁর ভৃত্যেরা পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। শেষে তিনি অনুতপ্ত হন। কেননা তিনি ভেড়াকান্তের মত নির্দোষ ব্যক্তিকে কারা লাঞ্ছনায় ভুগিয়েছেন। তিনি আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা' ঘটেনি। বন্ধুবিহীন, সহায়হীন বেগম সাহেবা বা বেগম ঠাকুরাণী আশ্রয় গ্রহণ করেন এক হৃদয়বতী মহিলার গৃহে। তাঁর জীবনের এই পরিণতি লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

লেখক যদিও কোন রকম চরম মন্তব্য করেননি, তবুও তিনি যে সমস্ত মন্তব্য গাজী মিয়াঁর মুখ দিয়ে করেছেন তাতে এ কথাই পরিষ্কার হয় যে, প্রচলিত নীতিবোধকে বিসর্জন দিলে শুধু যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও অবমাননাই বরণ করতে হয়। মুসলমান মহিলারা হিন্দু বা খ্রীস্টান মহিলাদের অনুকরণে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হলে পরিণামে ক্ষতিই হয়। কেননা, 'গাজী মিয়াঁ'র মতে মুসলমান মহিলার যথার্থ স্থানই হচ্ছে অন্তঃপুর।

মনিবিবি যমদ্বারের আর এক মহিলা-জমিদার। স্বামী বর্তমান থাকতেই তিনি তাঁর এক কর্মচারীর প্রতি আসক্তা হন। প্রথম থেকেই দেখা যাবে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতি বিরূপ। যদিও এই বিরূপতার কোন কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হয়নি। রুগ্ন স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। অত্যন্ত লোভী এবং নীতিজ্ঞানহীনা এই মহিলা তাঁর জামাতার ধন-সম্পত্তি গ্রাস করার পরিকল্পনা করেন। এবং তাঁর কন্যার শ্বশ্রু-মাতা

সোনাবিবির প্রতিও বিরূপ। কেননা সোনাবিবির সম্পত্তি তাঁর পুত্রের শাশুড়ী গ্রাস ক'রে নেবে এটা সোনাবিবি চাননি।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে মনিবিবি লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর পূর্বে যেন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেন এই মহিলা। লেখক মনিবিবির এহেন জীবনাচরণকে সমর্থন করেননি। সে-কথা মনিবিবির মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

সোনাবিবি যমদ্বারের আরেক জমিদার। প্রথম জীবনে তিনি সতী-সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর জীবিত অবস্থায় তিনি অন্তঃপুরেই আবদ্ধ ছিলেন, তিনি স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেননি। শুধু কোরানের কয়েকটি শ্লোক তিনি মুখস্থ করেছিলেন দৈনন্দিন প্রার্থনায় ব্যবহারের জন্য। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অন্তঃ-পুর থেকে বেরিয়ে দৃঢ়হস্তে স্বামীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতেন। স্নেহশীলা এই রমণী পুত্রের প্রতি বিরূপ হন পুত্র ও তার শাশুড়ীর দুর্ব্যবহারে। দুগ্ধভ্রাতা দাগাদারীকেও তিনি স্নেহ করতেন। কিন্তু পরিশেষে দাগাদারীর হীন মনোভাব ও বলপূর্বক দলিল সই করিয়ে অর্থলাভের চেষ্টায় সোনা-বিবি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং বন্ধুত্ব, স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদিতে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। পুত্রকে ফিরে পাবার জন্য আকুলতার অন্ত নেই। এমনকি তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যখন তাঁর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল তখন তিনি মক্কাতীর্থে যাত্রা করলেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করার জন্য।

দাগাদারীকে প্রথম পাওয়া যাবে সোনাবিবির দক্ষিণ হস্ত হিসাবে। প্রকৃতিতে সে ছিল ধূর্ত, আত্মসুখপরায়ণ, পরবর্তীকালে প্রতিহিংসাপরায়ণ। সোনাবিবির সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখা বা তাঁকে সমর্থন করার পিছনে তার স্বার্থ জড়িত ছিল। সোনাবিবির কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তির আশা ছিল তার। যখন সে ব্যর্থ হলো তখন সে সোনাবিবিকে পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলো না। তারপর সে বেগম সাহেবাকে সমর্থন করতে লাগলো এবং সোনাবিবির সঙ্গে ভেড়াকান্তের মনান্তর ঘটিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। তার ধারণা, ভেড়াকান্তকে সোনাবিবি অত্যধিক প্রশ্রয় দেন। দাগাদারী বেগম সাহেবাকে নানা স্তুতিবাক্যে ভুলাতে চেষ্টা করে। যদি তার কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পাওয়া যায় এবং এজন্য সোনাবিবির নিন্দাবাদও করে অনেক। এমনকি ভেড়াকান্ত ও সোনাবিবিকে জড়িয়ে এক মুখরোচক গল্প তৈরী করে।

দাগাদারী নিজেকে একজন মহৎ লেখক মনে করতো। তার ধারণা, তার মত এমন লেখক তৎকালীন বঙ্গদেশে দুর্লভ। বেগম সাহেবা অবশ্য দাগাদারীর এ সমস্ত ভণ্ডামীর তাৎপর্য সম্পূর্ণই বুঝতে পারেন। শেষ পর্যন্ত দাগাদারী দু'কূল হারালো।

'হাকিম সাহেব' বস্তানীর একজন উল্লেখ্য চরিত্র। তিনি অরাজকপুরের হাকিম ও শাসনকর্তা। সেই পদের বদৌলতে তিনি অরাজকপুরের প্রধান ব্যক্তি। তাঁর অবশ্য একটি নাম ছিল—ভোলানাথ। কিন্তু লেখক তাঁকে 'হাকিম সাহেব' বলেই বরাবর সম্বোধন করেন। প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন অসৎ, লোভী এবং সঙ্কীর্ণমনা। বেগম সাহেবার সাহচর্য পাওয়ার লোভে তিনি প্রকাশ্যে বেগমের প্রশংসা করতেন এবং আড়ালে বেগমের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। বেগম সাহেবার তুষ্টিলাভের জন্য তিনি দাগাদারীকে এবং ভেড়াকান্তকে কারাযন্ত্রণায় ভুগিয়েছেন। হাকিম ছিলেন অমুসলমান। বেগম সাহেবার সঙ্গে সৌহার্দ্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের প্রতি তার কথায় ও কাজে অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেতো।

ভেড়াকান্ত চরিত্রটি মশাররফ হোসেনের নিজেরই প্রতিচ্ছবি। এ কথা তিনি 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন। ভেড়াকান্ত চরিত্রের মধ্য দিয়ে মশাররফ তাঁর স্বীয় মন্তব্যগুলি প্রকাশ করেছেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র অংশবিশেষেও ভেড়াকান্তের সঙ্গে মশাররফ হোসেনের একাগ্রতা অনুভব করা যায়। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'র ভূমিকায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র অনেক ঘটনা তাঁর জীবন থেকে আহরিত।

মশাররফ হোসেন দেলদুয়ারে (টাঙ্গাইল) করিমন্নেসার জমিদারীতে ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিছুকাল পরে, সম্ভবতঃ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করেন। কোন লেখায় বা রচনায় তিনি কেন টাঙ্গাইল পরিত্যাগ করেন তার কারণ বর্ণনা করেননি। তবে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বেশ কিছুটা অর্থকষ্টে পতিত হন এবং সেহেতু তিনি ভাগ্যান্বেষণে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এমনকি তিনি বগুড়ায় গিয়েছিলেন "অন্নজলের আকর্ষণে"। অসম্ভব নয় যে, তিনি কোন কারণে তাঁর মনিবের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং চাকুরীস্থল পরিত্যাগ করে চলে যান।

মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের একটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন একটি সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি সেই পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ রচনা করতেন। কোন এক সংখ্যায় মশাররফ হোসেন স্থানীয় মুসলমান জমিদারদের অংশীদারদের মধ্যে যে সমস্ত আভ্যন্তরীণ কলহ হতো তার বিবরণ প্রকাশ করেন। সে কলহের তিনি নিন্দা করেন এবং টাঙ্গাইলের সরকারী কর্মচারীদের সমালেচনা ক'রে কিছু প্রাচীরপত্র টাঙ্গাইলের রাস্তায় টানিয়ে দেন। এর ফলে তাঁকে টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির হতে হয়।[২] অবশ্য তিনি যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ঘটনাবলী এবং যে কারণে এ সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মশাররফ হোসেন এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনায় প্রেরণালাভ করেন এমন অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর মনের পুঞ্জীভূত আক্রোশের উপশমের জন্য তিনি মহিলা-জমিদারদের এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বিদ্রূপ ক'রে এই গ্রন্থ রচনা করেন। যে সময় মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন শিবচন্দ্র নাগ।[৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিব এবং ভোলানাথ একই অর্থজ্ঞাপক। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র পয়জারন্নেসা বেগম সাহেবার সঙ্গে মশাররফ হোসেনের মনিব করিমন্নেসার সাদৃশ্য অনুমান করা যায়।

তা হলে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে কোন সাহিত্যিক প্রেরণা ছিল না--অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে মশাররফ হোসেন এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি যে সমস্ত চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন তার পেছনে সমাজে যারা উচ্চপদে বা ক্ষমতায় আসীন, যাদের হাতে দরিদ্র-সাধারণ ব্যক্তি নির্যাতিত হয়েছে তাদের তীব্র নিন্দা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা যায়। অধিকাংশ চরিত্রই নয় সৎ, না হয় অসৎ এই দু' শ্রেণীতে পড়ে। হাকিম সাহেব, বেগম সাহেবা, মনিবিবি এরা নীতিজ্ঞানহীন অসৎ ব্যক্তি। তাদের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে—ছলে বলে কৌশলে অর্থ এবং ক্ষমতালাভ। অন্য এক প্রান্তে আছে ভেড়াকান্ত। ভেড়াকান্ত অপরের মঙ্গলের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত, ব্যগ্র এবং তার চরিত্রের একনিষ্ঠতার জন্য সে বারংবার নির্যাতিত হয়েছে। এই প্রান্তের মধ্যবর্তী রয়েছেন সোনাবিবি। মনে হয়, তারা নির্যাতিত হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন। তারা অসৎ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। এরা দুর্বল, অথচ পাঠকও

যেন এদের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে পারছে না। এমনকি ভেড়াকান্তের কথাও পুরোপুরি বিবৃত হয়নি। এ গ্রন্থের যে সমস্ত প্রধান চরিত্র রয়েছে তাদের তুলনায় একে অপ্রধান মনে হয়।

লেখক ভেড়াকান্তকে সৎ ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তার সদগুণের পরিচয় পায় না। সোনাবিবি যখন মনিবিবির চক্রান্তে পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে, তখন ভেড়াকান্ত পুলিশকে উৎকোচ প্রদান করতে উপদেশ দিতে দ্বিধাবোধ করে না। সর্বোপরি, বেগম সাহেবা ভেড়াকান্তের প্রতি কী হেতু বিরূপ সে-কথা গ্রন্থের কোথাও বলা হয়নি। তবু এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, বেগম সাহেবার বন্ধু আলাতন্নেসার প্ররোচণায় ভেড়াকান্তকে বেগম সাহেবা বিষদৃষ্টিতে দেখেন এবং জব্দ করতে চান। অথচ আলাতন্নেসা কেন ভেড়াকান্তকে শত্রু মনে করতেন সে-কথার উল্লেখ কোথাও নেই।

ভেড়াকান্ত নামটি কোন মুসলমানের নয়, অথচ গ্রন্থে প্রকাশিত নীতি ও স্ত্রীধর্ম সম্পর্কে ভেড়াকান্তের মন্তব্য থেকে এ কথা বলা যায় যে, ভেড়াকান্ত একজন গোঁড়া মুসলমান।

এ গ্রন্থের গুণ ও ত্রুটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। গ্রন্থটির গঠন-রীতি বহুদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এর কাঠামোটি খুব শিথিল এবং এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় কাহিনীর উত্তরণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এসব চরিত্রের অনেকগুলি বর্জন করলেও কোন ক্ষতি হতো না। অনেক বক্তৃতা, অনেক উক্তি এবং মন্তব্য এবং স্থানে স্থানে বর্ণনা এত দীর্ঘ যে, তা' অনেক সময় বিরক্তি উৎপাদন করে এবং বৈচিত্র্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, প্রয়োজনীয় মুল কাহিনীতে সংহতির অভাব রয়েছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মতই রসপূর্ণ; কিন্তু বঙ্কিমের রচনার সঙ্গে তার তুলনা ঠিক চলে না। তবে গ্রন্থের পরিকল্পনায়, বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের গঠনে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' সঙ্গে মিল রয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে বাক্-সংযম লক্ষ্য করা যায়, তা' 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'তে দুর্লক্ষনীয়। অবশ্য তাঁর রচনায় সমাজের একটি চিত্র পাওয়া যায় সে-কথা সত্য। এ গ্রন্থে গাজী মিয়ঁা বা লেখক নীতি-কথা প্রচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে

ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে, যেমন—'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। এ সমস্ত গ্রন্থে প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কিন্তু 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে যে সমাজের কথা আছে সেটি হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র সমাজ।

মীর মশাররফের রচনায় তৎকালীন বঙ্গ সমাজের একটি যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থা, সে যুগের স্ত্রীশিক্ষা কতদূর প্রচলিত ছিল, সে যুগে মুসলমান জমিদারদের জীবনপ্রণালী, সে যুগের সংস্কার, বিশ্বাস, সে সমাজে নারীদের কি স্থান, হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদা, মুসলমান সমাজে নারীর মর্যাদা, মুসলমান নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক, সে যুগে প্রচলিত আইন ও আইন রক্ষকের দুর্নীতি, এ সমস্ত বিষয়ের উপর মশাররফ হোসেন তাঁর 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন।

তথ্য নির্দেশ

[১] পুস্তকের ভূমিকায় তারিখ দেওয়া আছে ১৫ আশ্বিন, ১৩০৬ সন। এই তারিখ থেকে ইংরেজী তারিখ পাওয়া যায় ১লা অক্টোবর, ১৮৯৯। Calcutta Gazette (31, October, 1900)-এ পুস্তকের প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০০। প্রথম সংস্করণের একটি খণ্ড লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

[২] ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানীর ভূমিকা', ১৯৬১, ঢাকা।

[৩] কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', পৃঃ ২১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাষা ও রচনারীতি

(১)

মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র গদ্য রচনাকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

(১) আত্মজীবনীমূলক রচনা,
(২) ইতিহাস বিষয়ক রচনা,
(৩) ইতিহাসাশ্রিত রচনা,
(৪) সাহিত্যিক রচনা।

প্রথম ভাগে পড়ে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুম'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা হচ্ছে ঃ 'এসলামের জয়'।

তৃতীয় পর্যায়ের রচনা হলো ঃ 'বিষাদ সিন্ধু' (তিন পর্ব), 'তহমিনা'।

চতুর্থ পর্যায়েয় রচনা ঃ 'রত্নবতী', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'নিয়তি কি অবনতি'।

এ চার পর্যায় ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ। যেমন—'গো জীবন'।

মীর মশাররফ হোসেনের নাটক রচনার ক্ষেত্রেও অবদান অসামান্য। তার দু'খানা নাটক—'বসন্তকুমারী' ও 'জমীদার দর্পণ' এবং প্রহসন 'এর উপায় কি' বাংলা গদ্যে বিশিষ্ট সংযোজন।

(২)

বাংলা গদ্যকে ভাষাগত দিক থেকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে ঃ সাধু ভাষা[১] (বা বিশুদ্ধ ভাষা) অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর

গ্রন্থকারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি সাহিত্যিক ভাষা। এই সাধু ভাষাকে দু'দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এক, তার শব্দসম্পদের দিক থেকে; দুই, তার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে। বাংলা ভাষার (অথবা যে কোন নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা) শব্দভাণ্ডারে চার রকমের শব্দাবলী রয়েছে: (১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) দেশী ও (৪) বিদেশী।

তৎসম শব্দ হচ্ছে যেগুলির রূপ অবিকল সংস্কৃত ভাষার। যেমন—কুসুম, সুন্দর, মন্দ, চিন্তা।[২] যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা যায়। যেমন সংস্কৃত 'অবিধবা' থেকে 'এয়ো' শব্দের উৎপত্তি। কতকগুলি শব্দের আকৃতি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত অবস্থায় নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা বা বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—কৃষ্ণ থেকে কেষ্ট। এ শব্দগুলিকে অবশ্য কেউ কেউ অর্ধতৎসম শব্দ বলে অভিহিত করে থাকেন। দেশী শব্দ হচ্ছে সেগুলো, যে শব্দগুলি মূল আর্যভাষায় পাওয়া যায় না, আর বিদেশী শব্দ আরবী-ফার্সী বা ইংরেজী ভাষা থেকে ঋণ করা শব্দ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, কতকগুলি শব্দের লিখিত রূপ তৎসম হলেও তারা উচ্চারণের তারতম্যের জন্য তদ্ভব হয়ে যায়। যেমন—পদ্ম (সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্‌ম), বাংলায় 'পদ্দ'-রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে।[৩] সুনীতীকুমার চট্রোপাধ্যায়ের দেওয়া তালিকা থেকে বাংলা ভাষায় শব্দের আনুপাতিক হার:

তৎসম শব্দ	৪৪%
তদ্ভব, অর্ধ তৎসম	৫১.৪৫%
দেশী এবং অন্যান্য	
বিদেশী (ফার্সী ইত্যাদি)	৩.৩০%
(ইংরেজী ইত্যাদি)	১.২৫%
	১০০.০০

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কৃত থেকে গৃহীত। যাহোক, তদ্ভব শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে জাত হলেও এগুলিকে বাংলা শব্দ বলেই গণ্য করা উচিত। দেখা যাচ্ছে, প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগে এটা বিশেষভাবেই দৃষ্ট হয়।

ব্যাকরণগত দিক থেকে বাংলা সাধু ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন কোন নিয়ম অনুসরণ করতো। যেমন– সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ গঠন। সংস্কৃত প্রত্যয়াদির যোগ, যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার। বাংলা সাধু ভাষার বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার।

দ্বিতীয় রীতিকে চলিত ভাষার রীতি বলা যায়। এ ভাষার রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প তৎসম শব্দ ব্যবহার, ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার, সমাসের প্রয়োগ হ্রাস এবং যুক্ত ক্রিয়া-পদের বাহুল্য বর্জন।

যাহোক, বাংলা গদ্য-রীতি যে দু'ভাগে বিভক্ত, এটি তার একটি মোটামুটি বিভাগ মাত্র। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উনিশ শতকের সাধু ভাষা বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষা থেকে পৃথক—আবার বঙ্কিমের ভাষা থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষাও অনেক পৃথক। 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষাও সাধুরীতির। কিন্তু এতে তৎসম শব্দ ও যুক্ত ক্রিয়াপদের বাহুল্য বর্জন ও প্রচুর তদ্ভব শব্দের ব্যবহার একে মোটামুটি চলিত ভাষায় বা মৌখিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। বাংলা-গদ্যের ধারাবাহিক ইতিহাসটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সাধু ভাষা ক্রমশঃ সরলীকৃত হয়ে আসছে অর্থাৎ প্রায় মুখের ভাষার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার রাজসিংহ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় ভাষার রীতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, আজকাল লেখকেরা দু' সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একদল বলেন যে, বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করা উচিত। অপর দল বলে, যা প্রচলিত তাই ব্যবহার করতে হবে, সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিরোধী হলেও তা করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত সমর্থন করেন। একদা যে তিনি সম্বোধন পদে ভগবান প্রভো, পিতঃ ব্যবহার করতেন, সম্প্রতি তিনি তা প্রত্যাহার করেছেন। কেননা এগুলো বাংলা ভাষায় আদৌ ব্যবহৃত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের রচনার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষ কারণে। বিদ্যাসাগরের যুগে এদের আবির্ভাব। কিন্তু বিদ্যাসাগরীয় ভঙ্গিকে অনুসরণ না ক'রে এরা প্রচলিত ভাষার কাছাকাছি একটি রীতিতে

'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা',[৪] রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তী-কালে প্যারীচাঁদ নিজেও এই রীতি অনুসরণ করেননি। তার কারণ হচ্ছে, চলিত ভাষার যথার্থ রূপটি এরা কেউ আয়ত্ত করতে পারেননি। সে জন্যে দেখা যাবে প্যারীচাঁদ একই বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকেও সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণদোষ ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও 'মৃণালিনী' এবং অন্যান্য গ্রন্থে অনুরূপ দোষ বর্জন করতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন বা প্যারীচাঁদ চলিত ভাষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে-যুগের প্রধান লেখকেরা সাহিত্যিক রচনায় সাধু ভাষার প্রয়োগ করতেন এবং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মশাররফ সাধু রীতিতে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত করেন।

(৩)

'রত্নবতী'তে মশাররফ সর্বত্রই সাধু ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এমনকি সংলাপেও তিনি সাধুরীতির প্রয়োগ করেছেন। ক্রিয়াপদ বা সর্বনামেও কোন কথ্যরূপ ব্যবহার করেননি।

'রত্নবতী'র ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তৎসম-শব্দের প্রচুর ব্যবহার। যেমন ধরা যাক, 'রত্নবতী'র পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠাটি, এ পৃষ্ঠায় মোট শব্দসংখ্যা হচ্ছে ১০৯। এর মধ্যে ১১টি সমাসবদ্ধ পদ, ৫১টি তৎসম শব্দ এবং ৫টি যুক্ত ক্রিয়াপদ রয়েছে। এই পুস্তকের সর্বত্র সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তিনি কোথাও ক্রিয়ার সাধুরূপ ও চলিত রূপের মিশ্রণদোষ ঘটাননি। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী তিনি অবশ্য সম্বোধনের বিভক্তি প্রয়োগ করেছেন। যেমন—'বৎসে', 'বন্ধো', 'প্রভো' ইত্যাদি। বাংলায় সাধারণতঃ কর্তৃকারকের বিভক্তিই সম্বোধন পদে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে বিভক্তি যোগও 'রত্নবতী'র ভাষার বৈশিষ্ট্য, যেমন—'চতুরা সহচরী' (ইচ্ছানুবর্তিনী কিঙ্করী)। আবার কোথাও ব্যাকরণগত লিঙ্গের ব্যবহার আছে। যেমন—'আশাবলবতী', 'জীবনমৃত্যুকারিণী লজ্জা' ইত্যাদি। 'রত্নবতী'র ভাষা সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে, এই পুস্তকে একটিও আরবী-ফার্সী শব্দ নাই। ঐ সময়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কোন আরবী-ফার্সী শব্দ এই পুস্তকে মশাররফ ব্যবহার করেনি।

এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এই পুস্তকের বিষয়বস্তুটি হিন্দুসমাজ বা জীবনকে কেন্দ্র ক'রে কল্পিত। সেহেতু, মুসলমানদের ব্যবহৃত কোন আরবী-ফার্সী শব্দ এর মধ্যে স্থান পায়নি। সম্ভবতঃ এই জন্যই 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে (১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ) মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, কোন অমুসলমান মুসলমানের ছদ্মনামে এটি রচনা করেছেন।

মশাররফের পরবর্তী দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে নাটক। স্বভাবতঃই নাটকে ব্যবহৃত ভাষা, তথ্য ও রচনাশৈলী ভিন্নতর। 'বসন্তকুমারী নাটক', 'জমীদার দর্পণ' উভয় নাটকই চলিত ভাষায় রচিত। এ সম্পর্কে মশাররফ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন যে, নাটকের ভাষায় কথ্যভঙ্গি অধিকতর সুপ্রযুক্ত হবে। অন্যথায় দর্শকচিত্তে নাটক আশানুরূপ সাড়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

'বসন্তকুমারী নাটকে' তিনি সর্বত্রই চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এ নাটকে তৎসম শব্দসংখ্যা কম এবং ক্রিয়াপদ অনেকগুলিই চলিত। তবে রাজা, মন্ত্রী এরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অর্থাৎ তৎসম শব্দপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। কখনো বা রাজা কবিত্বপূর্ণ ভাষায় আলংকারিক শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। মশাররফ রাজপ্রসাদের আড়ম্বর প্রকাশের জন্যই কবিত্বময় তথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন।

ক্রিয়াপদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মশাররফ অনেকটা মৌখিক রূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'কোত্তেন' (করতেন-এর স্থলে), 'দেখছিলুম' (দেখছিলাম-এর স্থলে), 'পাল্লেমনা' (পারলেম না), 'কোচ্চি' (করছি-এর স্থলে)। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখন পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যশৈলীতে দৃষ্ট হয়। অবশ্য সর্বত্রই তিনি সঙ্গতি বজায় রাখতে পারেননি। উক্ত নাটকে কখনো তিনি 'কল্লেন' (পৃঃ ১২৫), 'করবেন' (পৃঃ ২০) লিখেছেন। আসলে বিশুদ্ধ কথ্যভঙ্গী অনুসরণ করলে শব্দ দুটো এ রকম হতো—কোল্লেন, কোরবেন। এক স্থানে একটি ক্রিয়াপদের রূপ ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। ৮৮ পৃষ্ঠায় আছে—"আমি এ কাল পর্যন্ত সে নাম কারো কাছে ফুটিনি, মনের কথা মনে আছে।" এখানে 'ফুটিনি' শব্দের প্রয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

কর্মকারকে সর্বনামে তিনি 'রে' বিভক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন—'আমারে', 'যারে' ইত্যাদি। সম্বোধন পদে 'রত্নবতী' গ্রন্থের মত এই নাটকেও সংস্কৃতরীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন—পিতঃ, মালতি, সখে ইত্যাদি। কতকগুলি ইংরেজী শব্দ বা ইংরেজী থেকে গৃহীত শব্দও এই নাটকে দেখা যায়।

যেমন—বাক্‌স, মূল ইং box ; মাইরি, সম্ভবতঃ মূল হচ্ছে By Mary। এই নাটকে কয়েকটি ফার্সী, হিন্দী/উর্দু শব্দও দৃষ্ট হয়। কোথাও বা হিন্দীপূর্ণ বাক্য বাংলা অক্ষরে লিখা হয়েছে। যেমন—"চোপরাও, মহারাজকা হোকম হায়, হাম ক্যা করেগা" [তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় রঙ্গভূমি]। কিছু ফার্সী শব্দ যেমন—'দরবার', 'দরওয়াজা', 'কাগজ' ইত্যাদি এই নাটকে দৃষ্ট হয়।

'জমীদার দর্পণ' নাটকটিও চলিত ভাষায় লিখিত। যদিও নাটকের প্রস্তাবনা ছন্দে রচিত এবং নাটকের শেষে একটি গানও আছে। অবশ্য দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী কয়েকস্থলে আরও কয়েকটি গান সংযোজিত হয়েছে। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই সঙ্গীতগুলি সংযোজিত হয়েছে। এই নাটকে আবার কয়েকটি ইংরেজী বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তৎকালে আদালতে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত ছিল।

এই নাটকে মশাররফ সর্বত্রই কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তবে দু'এক স্থলে উকিল বা দারোগা সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'হইতে', 'হইয়া', 'ফেলিয়া' ইত্যাদি। অবশ্য কোথাও কোথাও একই সঙ্গে সাধু ও কথ্য-ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। লেখক কোথাও নিষেধাত্মক অব্যয় পদ 'না'-এর স্থলে 'নে' ব্যবহার করেছেন। উনিশ শতাব্দীর পদ্যে এই অব্যয়টির ব্যবহার অত্যন্ত দুর্লভ। উপভাষার প্রভাবে কোথাও কোথাও তিনি ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'নে' ব্যবহার করেছেন 'নিয়ে' পদের পরিবর্তে। কয়েকটি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—শব্দের আদিতে পার্শ্বিক (lateral) ধ্বনির পরিবর্তে নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহার। যেমন—'নোক' 'লোক'-এর স্থলে, 'লজ্জা' স্থলে নজ্জা। আবার তাড়ণজাত (flapped) ধ্বনির পরিবর্তে নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহার। যেমন—'রকমে' স্থলে 'নকমে'। আবার কোথাও উষ্মধ্বনির (sibilant) পরিবর্তে কোথাও 'অর্ধ-স্বরধ্বনি' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—'এসেছি' স্থলে 'এয়েছি'।

'বিষাদ সিন্ধু'র ভাষাও সাধু ভাষা। অথবা বলা যেতে পারে যে সরল সাধু ভাষা। ক্রিয়াপদগুলির রূপ সবই সাধুরীতির। শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৎসম। তবে অযথা অতিরিক্ত তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়নি; পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য অযথা তৎসম শব্দ ব্যবহার অনেক কম। এমনকি 'রত্নবতী' গ্রন্থের তুলনায় শতকরা হিসাবে 'বিষাদ সিন্ধু'র তৎসম শব্দের হার অনেক

অল্প। অবশ্য নাটকের ভাষা থেকে 'বিষাদ সিন্ধু'র ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। এর কারণ বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য। বাক্যের বহর অযথা দীর্ঘ নয়, তবে দীর্ঘ বাক্যও কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস থেকে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নেওয়া হলেও এ গ্রন্থে ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দের সংখ্যা অনেক কম। 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে আনুমানিক একলক্ষ শব্দ রয়েছে, এর মধ্যে দুইশতেরও কম আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (পুনরুক্তি ব্যতিরেকে)। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দের পরিবর্তে মশাররফ অনেক স্থলে বাঙলা শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কোন মুসলমান তাঁর ব্যবহারিক জীবনে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেন না। প্রথম খণ্ড 'বিষাদ সিন্ধু' প্রকাশের পর এই প্রসঙ্গ নিয়ে মশাররফের যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা হয়। এই বিরূপ সমালোচনায় মশাররফও মর্মাহত হন। 'বিষাদ সিন্ধু'র দ্বিতীয় খণ্ডে (উদ্ধার পর্ব) মশাররফ এই মন্তব্য করেন: "বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে, মহাপাপের কার্যই করিয়াছি।"[৫]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থখানিও সরল সাধু ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত তৎসম শব্দসংখ্যা অনেক কম। উপভাষার প্রভাবে কয়েকটি শব্দ গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়। সচরাচর এ জাতীয় শব্দ সাহিত্যিক বা লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন—'বাঁধা' স্থলে 'বান্দা', 'কাঁদা' স্থলে 'কান্দা'। এসব দৃষ্টান্ত থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এই সময় বা তার পর থেকেই মশাররফ তাঁর লেখার ব্যাপারে অনেকটা অসতর্ক বা অমনোযোগী ছিলেন। এমনও হতে পারে, বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি হয়তো সংশোধন করতেন না। এই জাতীয় ত্রুটি 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও তৎপরবর্তী গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনীতেও দৃষ্ট হয়। এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কোন সমালোচক "পূর্ববঙ্গীয় লক্ষণ" বলে চিহ্নিত করেছেন।[৬]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ভাষাও সরল সাধু ভাষা। এ গ্রন্থে অনেক প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব শব্দ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। যেমন—উকিল, মোক্তার, আমলা, মশহুর, মঞ্জুর, দরখাস্ত, বে-আক্কেল ইত্যাদি। এমনকি ইংরেজী ভাষা থেকে গৃহীত কিছু শব্দও এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন—কোর্ট, পুলিশ, ইন্‌সপেক্টার,

জজ, ডিসমিস ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষের দিকে অভিজাত মহলে হিন্দী-উর্দুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের হাকিম সাহেবও হিন্দী-উর্দু ভাষায় আলাপ অধিকতর পছন্দ করতেন। এই গ্রন্থে সাধু ভাষা সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু সংলাপের ভাষায় কোথাও কথ্যরীতি অবলম্বন করা হয়েছে। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' ও 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'র মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

(৪)

মশাররফের রচনারীতি বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে স্টাইল বিষয়ে প্রাসঙ্গিক দুই-একটি কথা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন সমালোচকরা বিভিন্ন রকমে এই স্টাইল (style) শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন।

রচনারীতি বা স্টাইল শব্দটি তিনটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭]

প্রথম—ভাষায় ব্যক্তিবিশেষের বিচিত্র বাক্-ভঙ্গি (personal idio-syncracy of expression)।

দ্বিতীয়—রচনা-নৈপুণ্য (the power of lucid exposition of a sequence of ideas)।

ভাব ভাষার মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করে, সেই ভাব এতই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র যে, ভাষা তদনুরূপ বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

তৃতীয়—বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা (complete fusion of the personal and universal)।

The highest style is that wherin the two current meaning of the word blend, it is a combination of the maximum of personality with the maximum of impersonality.

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া আরও কিছু স্টাইলের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে যথাযথ তা বর্ণনা করা বেশ কষ্টসাধ্য। মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে, স্টাইলের কাজ হচ্ছে ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা এবং এমন শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করতে হবে যেন তা ভাবোপযোগী হয়।[৮]

সংস্কৃত আলংকারিকেরা ভাষার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন অলংকার শাস্ত্রে। এই 'অলংকার' সাধারণ শব্দকে অসাধারণ ক'রে তোলে।[৯] সেইজন্য সংস্কৃত

আলংকারিকেরা শব্দবিন্যাস, ছন্দ ও ভাষার উপরেই বেশী গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা বলেন ইহা বাহ্য, এর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। সেই 'আরও কিছু' অনির্বচনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।[১০]

আমরা এখানে মশাররফের ভাষার বৈশিষ্ট্য, এই ভাষার সৌন্দর্য এবং মশাররফের বাক্‌ভঙ্গী আলোচনা করে দেখাবো যে, তাঁর ভাব কি সুন্দর-ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মশাররফের রচনা থেকে তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন উপমা-রূপক, সমাসোক্তি, অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদির উদাহরণ সন্নিবেশিত হলো। এ সমস্ত উদাহরণের অনেকগুলিই বাংলা সাহিত্যে পূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে, কিংবা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ঋণ করা হয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মশাররফ নূতন উপমা প্রয়োগ করেছেন। কোথাও কোথাও এগুলি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত হলো:

(১) তাহার **মুখ চন্দ্রমা** নিরীক্ষণ করিলে **হৃদয়াম্বুধি** আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। (পৃঃ ১৫)

(২) **দুঃখ জলধি চিন্তাবায়ুর** প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল। (পৃঃ ৫৮)

(৩) **চিত্তবারণ ধৈর্যাঙ্কুশেও** বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা-সরোবরে ধাবিত হইতেছে। (পৃঃ ১৩)

উপরে চিহ্নিত রূপকগুলি অবশ্য অনেকটা গতানুগতিক এবং সংস্কৃত থেকে গৃহীত হলেও মশাররফ তাঁর স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য সফলতার সঙ্গে এগুলোকে নিজের ক'রে নিয়ে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এই স্বী-করণের প্রতিভা মশাররফের ছিল। যেমন—তাঁর নিজস্ব বাক্‌বিধি 'উদ্বেল হইয়া' 'প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া', 'হৃদয়কে আঘাত করিতে' প্রভৃতি ব্যাকাংশগুলি প্রচলিত রূপকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুলনামূলক রূপকল্প নির্মাণে মশাররফের কৃতিত্ব নির্দেশ করে। 'রত্নবতী' গ্রন্থে অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়, যেখানে তিনি প্রচলিত রূপককে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি দ্বারা এক বৃহত্তর বা অভিনব রূপকল্প নির্মাণে সফল হয়েছেন। একটি উদাহরণ, "এই সুবর্ণ লতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আভরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন" (পৃঃ ৫৬)।

'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত এই জাতীয় উপমা-রূপকের অজস্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অলংকার প্রয়োগে মশাররফের নৈপুণ্য দু'চারটি উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়:

প্রথম উদাহরণ—"যেদিন এজিদের নয়নচকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল সুধা পান করিয়াছে সেইদিন এজিদ জয়নাবকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব রূপসাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে।" (পৃঃ ৩৪)

এখানে ব্যবহৃত রূপকগুলি গতানুগতিক হলেও মশাররফের প্রয়োগ-নৈপুণ্য মৌলিকের মতই মনে হয়।

আর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক :

"প্রতিনিধির বাক্যবজ্রাঘাতে সুখস্বপ্নতরু দগ্ধীভূত হইল।"

এখানে 'স্বপ্নতরু' অত্যন্ত সাধারণ একটি রূপকল্প, 'বজ্রাঘাত'ও তাই। কিন্তু 'বাক্য' শব্দের সঙ্গে 'বজ্রাঘাত' যুক্ত হওয়াতে এটি একটি মৌলিক প্রয়োগ হয়েছে। সংস্কৃতগন্ধী এই উভয় রূপকের জের চলেছে 'দগ্ধীভূত হইল' বাক্যের এই বিধেয় অংশ পর্যন্ত।

আরও একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক :

"যদি জায়েদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন তবে কি আজ জায়েদা বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি-সুখ সমুদয় এক-দিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ ভিন্ন দিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন?" (পৃঃ ৯৮)।

'ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত' হওয়ার যে রূপক মশাররফ ব্যবহার করেছেন তা সুপ্রচলিত একটি চিত্রকল্প তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'তুলাদণ্ডে'র সঙ্গে 'বিবেচনা' সম্পৃক্ত ক'রে মশাররফ যে রূপকের ব্যবহার দেখালেন তা সত্যি অভিনব এবং পাঠকেরা তুলাদণ্ডটি যেন তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন, আর সেই তুলাদণ্ডে একটি বস্তুকে পরিমাপ করা হয়েছে একটি 'ভাবের' (বা নির্বস্তু) দ্বারা।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে মশাররফ কী জাতীয় উপমা ব্যবহার করেছেন তার বর্ণনা দেওয়া হলো। ব্যঙ্গ বা সমালোচনার ক্ষেত্রেও মশাররফ অনুরূপ সার্থক উপমা-রূপক প্রয়োগে সক্ষম।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হলো :

"মাননীয় হার্শেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে পূর্ণ কলেবরে পূর্ণ চন্দ্ররূপে দেখা দিয়েছেন।" (পৃঃ ১৩৯)

'পূর্ণ' শব্দের তিনবার ব্যবহার অত্যধিক মনে হতে পারে, কিন্তু 'সিভিল সার্ভিস আকাশে' পূর্ণিমার চাঁদের রূপকল্প ব্যবহারে মশাররফের খোঁচা পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগ্রত করে।

উপমা ব্যবহারেও মশাররফ কী পরিমাণ দক্ষ ছিলেন 'রত্নবতী'র নিম্নোক্ত কয়টি উদাহরণই যথেষ্ট :

"শশী সীমন্তিনী যামিনী রাজপুত্রের ভাবী দুঃখে দুঃখিনী হইয়া গমন-সময়ে বিহগকুলের কলরবেই যেন ক্রন্দন এবং শিশির পতনচ্ছলেই যেন অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।" (পৃঃ ২২)

'রাত্রি'কে ব্যক্তি হিসাবে কল্পনা ক'রে যে সমাসোক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। 'রাত্রি' যেন রাজপুত্রের জন্মদাত্রী জননী এবং 'সীমন্তে শশী' যেন বিবাহিতা হিন্দুনারীর প্রতিমূর্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

আরও একটি সমাসোক্তির উদাহরণ দেওয়া হলো :

"এই দণ্ডের আভা হেরে সৌদামিনী অভিমানিনী হয়ে কাদম্বিনীর আশ্রয় লয়েছে।" (বসন্তকুমারী নাটক, পৃঃ ৪৬)

'সৌদামিনী' এখানে জীবন্ত সত্তারূপে আবির্ভূত হয়েছে। এই সমাসোক্তির প্রয়োগে মশাররফ কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন তাও যথার্থ। 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে :

"স্বার্থ প্রসবিনী গর্ভবতী আশা যতদিন সন্তান প্রসব না করে ততদিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ঈষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না।" (পৃঃ ১৭১)

এখানে যে রূপকটি ব্যবহৃত হয়েছে তা যেন কিয়দংশে কষ্টকল্পিত। কেননা 'সংশিত মানসাকাশ' দ্বারা লেখক কী বুঝাতে চেয়েছেন তা সুস্পষ্ট নয়। 'সংশিত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অনুষ্ঠিত' বা 'নিয়মিত'।

কোথাও কোথাও উপমা প্রয়োগে বাহুল্য ঘটেছে :

"হুতাশনের দহন আশা ; ধরণীর জল শোষণ আশা ; ভিখারীর অর্থলাভ আশা ; চক্ষুর দর্শন আশা ; গাভীর তৃণ ভক্ষণ আশা ; ধনিকের ধনবৃদ্ধির আশা ; প্রেমিকের প্রেমের আশা ; সম্রাটের রাজ্যবিস্তারের আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপহৃদয়ে দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি নাই—ইতি।" (পৃঃ ৪০৭)

এখানে এক অসদিচ্ছার সঙ্গে আটটি ভিন্ন ভিন্ন উপমানের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

কয়েকটি অনুপ্রাস ব্যবহারের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

(১) "কুমুদিনী কান্ত বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।" (রত্নবতী, পৃঃ ৪৮)

(২) "তৃতীয়ার চন্দ্র তার ললাটের সমতুল হতে পারে না।" (বসন্তকুমারী নাটক, পৃঃ ৪৬)

উপরের বাক্যে প্রথম 'ক' এবং 'ল' এর অনুপ্রাস, পরের বাক্যে 'ত' এবং 'ল' এর অনুপ্রাস হয়েছে।

যমকের ব্যবহার গদ্যেও লক্ষণীয় :

"চিত্তবারণ ধৈর্যাঙ্কুশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা-সরোবরে ধাবিত হইতেছে।" (রত্নবতী, পৃঃ ১৩)

উপরের বাক্যে প্রথম 'বারণ' অর্থ হস্তী, পরেরটির অর্থ 'নিষেধ'।

সর্বশেষে মশাররফ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে প্রচুর প্রবাদবাক্য ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষভাবে তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থদ্বয়ে অনেক প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদবাক্যগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ মর্মভেদী এবং বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। জন-সাধারণের মুখেমুখেই প্রবাদের প্রচলন। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অষ্টাদশ শতকে 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' অনেক প্রবাদবাক্য ব্যবহার করেছিলেন। মশাররফও অনেক প্রবাদবাক্য তাঁর রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অথবা বক্তব্যকে জোরদার ও যথাযথ করার জন্য ব্যবহার করেন। দু'চারটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

(১) বসন্তের কোকিল, সুখের পায়রা (গাজী মিঁয়ার বস্তানী, পৃঃ ৯);

(২) নাচতে বসে ঘোমটা কি (গাজী মিয়াঁর বস্তানী, পৃঃ ১৬);

(৩) আজ হাতে সোনা কাল হাতে ছাই (গাজী মিয়াঁর বস্তানী, পৃঃ ১৯);

(৪) শত্রুর মুখ আর পাগলের জিহ্বা দুইই সমান (উদাসীন পথিকের মনের কথা, পৃঃ ১৮);

(৫) এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না (উদাসীন পথিকের মনের কথা, পৃঃ ২৪)।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি প্রচলিত প্রবাদবাক্য বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু দু'একটি প্রবাদবাক্য মনে হয় বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত হয়েছে বলা চলে :

(১) "স্ত্রীলোকের মন রাজধানীর কেল্লা অথবা যাদুঘর" (গাজী মিয়ঁার বস্তানী, পৃঃ ৩৪৬);

(২) "দয়ার হাত বিস্তার নির্দয়ের হাত সঙ্কোচ" (গাজী মিয়ঁার বস্তানী, পৃঃ ৪২)।

মশাররফের নাটকের ভাষা ও রীতি সম্পর্কে কিছু না বললে তাঁর গদ্য-শৈলী সম্পর্কে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রধানতঃ তাঁর মাত্র দু'টি নাটকই বর্তমানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তাঁর অন্যান্য নাট্যরচনা একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

তাঁর উক্ত নাটক দু'টিতে তিনি নাটকের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত মানুষ-রূপে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবন্ত মানুষরূপে উপস্থাপিত করার অন্তর্নিহিত কৌশলটি হলো চরিত্রগুলোর উপযুক্ত ভাষা তাদের মুখে ব্যবহার করতে দেওয়া।

তাঁর প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটকে'র কথাই ধরা যাক। এই নাটকে আছে রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সভাসদ, কৃষক, সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রত্যেকের বাক্‌ভঙ্গী আলাদা; তাদের আলাদা শব্দ ব্যবহারই উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয় কে রাজা কে কৃষক। অবশ্য তিনি নাটকে চলিত গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের চলিত রূপটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাজা, মন্ত্রী ও রাজপুত্রের ভাষায় সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দের প্রাধান্য, ভাষায় অলংকারের প্রাচুর্য, বাক্য যথাসম্ভব দীর্ঘ।

রাজা বীরেন্দ্র যখন তাঁর বিদূষকের সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করছেন তখনও লক্ষ্য করা যাবে যে, তাঁর ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম ব্যতীত অন্যান্য শব্দাবলী সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত।

রাজোদ্যানের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজা বলেছেনঃ

"এই বসন্তকালে উদ্যানস্থ সরোবরে কমলমালা কেমন ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হয়ে নয়নের প্রীতি সাধন করছে। পুষ্পের মধুগন্ধে উদ্যান কেমন আমোদিত হয়েছে।"

এই রীতির বৈশিষ্ট্য হলো, রাজা সহজ শব্দের পরিবর্তে আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করতে অধিক আগ্রহী। যেমন—'পদ্মে'র পরিবর্তে 'কমল', 'চোখে'র পরিবর্তে 'নয়ন'। অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের চেয়ে তৎসম শব্দই অধিকতর প্রয়োগ করা হয়েছে। মন্ত্রীও তাঁর ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের পক্ষপাতী;

যেমন—'এসেছেন'-এর পরিবর্তে 'আগমন করেছেন'। রাজপুত্র 'যাই'-এর পরিবর্তে বলেছেন 'গমন করি'।

রাজা রানীর সৌন্দর্য বর্ণনায় যথেষ্ট উপমা ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। রানীকে তিনি 'নবকাল', 'সুধাকর' প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিশেষ করে তিনি রানীর চোখ, ভ্রূ, কপাল, দাঁত এবং চুলের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরঙ্গিনী, রামধনু, তৃতীয়ার চন্দ্র, সৌদামিনী, কাদম্বিনী'-এর সাদৃশ্য কল্পনা করছেন।

উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি প্রকাশেও রাজা গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দপ্রধান বাক্য ব্যবহার করেছেন: "রে দুরাত্মা, রে কুলাঙ্গার, তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি—তোর এত বড় আস্পর্দা ··· ··· এই অসি দ্বারা স্বহস্তেই তোর মস্তক ছেদন করতাম, তা করবোনা ··· ··· তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ করবে।" (পৃঃ ১১৭)

'দুরাত্মা', 'কুলাঙ্গার', 'সম্মুখে', 'অসি', 'ছেদন করতাম', 'লুণ্ঠিত হয়ে' ইত্যাদি শব্দ বা ক্রিয়াপদ সাধারণতঃ চলিত বাংলায় ব্যবহার হয় না।

বীরেন্দ্রের শেষ সংকলাপটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। কেননা এখানে আবেগ-অনুভূতির চরম প্রকাশ ঘটেছে:

> "হায়, হায়। এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মরেছে। অগ্নিদেব। আমার নরেন্দ্রকে দাও। প্রাণাধিক নরেন্দ্র। নিরপরাধী শিশু। আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও। নরেন্দ্র। আমার প্রাণের নরেন্দ্র। আমার কোলে আয়। আমার প্রাণ গেল। আমার নরেন্দ্র। এসো কোলে করি।" (পৃঃ ১২৬)

উক্ত নাটকে আবার সহজ চলিত বাংলা অর্থাৎ মুখের ভাষার যথেষ্ট ব্যবহারও রয়েছে। কৃষকদের মুখের কথায় তাদের ক্রিয়াকলাপ, ভাবভঙ্গী অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে:

[প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় রঙ্গভূমি]

১ প্রজা। বলি ও বেয়াই। রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে। রাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে,

আর কদ্দিন আসবো, প্রত্যহই আসছি যাচ্ছি; একদিনও বেরোয় না, তা বিচার কোরবে কি? যেতে আসতে পায়ের নলা চিঁড়ে গেল। ··· ··· বেটা উচ্ছিন্ন যাক। এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম, সে কি মানুষ।

২ প্রজা। ওহে তুমি বুঝতে পারোনি, রাজা কি সাধে ও-রকম হয়েছেন। রাজা বুড়ো, রানী কাঁচা, একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে। কাজেই পাগল হয়েছেন। বুড়ো বয়সে বিয়ে কল্লে সকলেরই ঐ দশা হয়। তুমিও তো কিছু কিছু বুঝো।

১ম প্রজা। এত না।

২ প্রজা। বড় লোক আর ছোট লোকে অনেক তফাত।

১ প্রজা। আরে ভাই থাম, আমরা রাজার মত পাগল নই। সোনার চাঁদ ছেলে থাকতে নিজে বিয়ে কোরে বসলো। পাগলেও এমন করে না। বড় মানুষের দোষ নাই, আমাদের ছোট লোকের ঘরে হলে ঢাকে-ঢোলে কাটি বাজতো।

২ প্রজা। ঐ জন্যেই তো বলছি বড় লোকে যা করে তাই শোভা পায়।

বেই। এবারেই গেছি; আমরা যা যা বলেছি, সকলই রাজার ছেলে শুনতে পেয়েছে।

··· ··· ··· ··· ··· ···

প্রজা। ওরে মামদো। তুই কিছু চেয়ে নে না, আমাদের সঙ্গে তো তোর খাওয়া চোলবে না।

নরেন্দ্র। ওরে তুই কি মুসলমান?

মামদো। দোই অল্লার। মুই হেঁদু।

এই গদ্যভঙ্গীর সারল্য বা প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহার থেকেই সুস্পষ্ট।

মশাররফের দ্বিতীয় নাটক 'জমীদার দর্পণ' সম্পূর্ণ কথ্যভঙ্গীতে রচিত। মাত্র একটি কিংবা দুইটি দৃশ্যে সাধুভঙ্গীতে কিছু রচনার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। আদালতের কর্মচারী, বিচারক, কেরানী, উকিল, পুলিস-অফিসাররা সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন। পুলিশ-ইন্সপেক্টারের একটি বাক্য অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সাধু ভাষায় রচিত। যাহোক, এই নাটকে মশাররফ স্বল্প তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

'জমীদার দর্পণ' নাটকের একটি দৃশ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো :

[তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক]

"প্রথম চাষা। এ গাঁয়ে আর বাস্তুকি হয় না। গেল নাত্রে ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে। জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নামও শুনেছি, এরা কেমন বাবা।

দ্বি-চা। মামুজী; কি নকমে মাল্লে ?

প্র-চা। আমি কি দেখতে গিছি ?

দ্বি-চা। বুঝিছি বুঝিছি, ও-ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাজের বেলা আমাগের বাড়ীর পাছ-দুয়ার দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও আসে ... ... ও মামুজী—ঐ সায়েব।

ইন্‌সপেক্টার। খাঁড়া রও, কাহা যাতা হায় ?

প্র-চা। কর্তা, আমরা কিছু জানিনে।

... ...

প্র-চা। কর্তা আমরা মুসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পারব না, আমাদের জাত যাবে, এ কাম আমাদের নয়।

প্র-কন। নে শালা, সুওর কি বাচ্চা, লাশ নে।

দ্বি-চা। এই নিচ্ছি।"

চাষীদের মুখের ভাষা তাদের চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। তাদের ভীত-বিহ্বল রূপটিও আমরা দেখি। পুলিশের ভয়ে তারা কিভাবে ভড়কে যাচ্ছে তার সুন্দর দৃষ্টান্ত এ দৃশ্যটি। প্রথমে তারা নানা ভাবে সাহস দেখাতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে নাজেহাল হলো।

হাস্যরসের উদাহরণও 'বসন্তকুমারী নাটকে' সুলভ। বিদূষক ও রাজার কথোপকথনটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় :

"আপনার চুল পেকেছে কই ? আমি তো একটিও পাকা দেখতে পাই না। একটিও কাল হয় নাই, যেমন সাদা তেমনি ধবধব করছে। তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন ?" (পৃঃ ২১)

আপাতঃদৃষ্টিতে এটি অর্থহীন প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য ছিল হাস্যরসের সৃষ্টি করা। উপরোক্ত বিদূষকের আবার গুরুগম্ভীর বাক্যও প্রণিধানযোগ্য :

"ফুল দেখলে মন খুশী এ-ও কি কোনো কাজের কথা হু। পেট ভরে আহারটি না করলে হাজার শোঁকো, হাজার দেখো কিছুতেই মন সুখী নন। দেখুন এই উদর, ইনি পূর্ণ থাকলে ফুল না শুকলেও মন খুশী হয়, তবে রাজা রাজড়ার মন কেমন বলতে পারি না।" (পৃঃ ১৬)

বৃদ্ধ রাজার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার কথা শুনে গ্রাম্য রমণীদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি, তা-ও লক্ষণীয়। ঐ রমণীদের একটি উক্তি অত্যন্ত চমকপ্রদ ঃ

"চোখ থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়, তা তো আগেই বলেছি।" (পৃঃ ২৯)

'জমীদার দর্পণ নাটকে'ও অনুরূপ বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

"দ্বিতীয় মোসাহেব—আমি এর ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারছিনে।
হায়ওয়ান আলী—বুঝবে কি? আজো যে গাল টিপলে দুধ পড়ে।
দ্বিতীয় মো—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নাই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন; শেষে চক্ষের জল না পড়ে, তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চলবে না। প্যাঁচ খাটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই।" [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]।

নাটক ও গদ্য রচনায় মশাররফের অলংকার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাঁর গদ্যছন্দ সম্পর্কে আলোচনা না করা হলে মশাররফের রচনাশৈলীর আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশেষ করে 'বিষাদ সিন্ধু'র গদ্যছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কবিতার মত গদ্য রচনারও একটি ছন্দ বা গতি আছে। এই গতিটি গদ্যকে কাব্যিক সুষমা দান করে। রচনা পাঠ কালে কালে এর ছন্দটি শ্রোতাকে, পাঠককে মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সেণ্টসবারীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

verses or parts of verses which present themselves to the ear as such are strictly to be avoided in prose; but such as break themselves into prose adjustment are permissible, and even strengther and sweeter the 'numerous' character very much."[১১]

'বিষাদ সিন্ধু'র গদ্যের পর্বভাগ ও স্বরভঙ্গির উত্থান-পতন, এর ভাষাকে সঙ্গীতময় করে তুলেছে। আবৃত্তিযোগ্য তাঁর এই গদ্যছন্দ 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম প্রবাহের আরম্ভ থেকেই উদাহরণ দেয়া যায় ঃ

"তুমি আমার একমাত্র পুত্র ॥ এই অতুল বিভব
সুবিস্তৃত রাজ্য ॥ এবং অসংখ্য সৈন্য ॥
সামন্ত সকলি তোমার ।। দামেস্ক রাজমুকুট ।।
অচিরে তোমারি শিরে শোভা পাইবে ।।
বল তো তোমার কিসের অভাব? ।। কি মনস্তাপ? ।।
আমি তা ভাবিয়া ।। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ।।"

আবৃত্তিকালেই এর ছন্দস্পন্দ ধরা পড়ে।

এবার স্বরভঙ্গী জ্ঞাপক একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি আরও পরিস্ফুট করা যায়।

তুমি আমার একমাত্র পুত্র এই অতুল
উচ্চ (high)
মধ্য (level)
নিম্ন (low)

বিভব সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য
উচ্চ
মধ্য
নিম্ন

সৈন্য সামন্ত সকলি তোমার দামেস্ক
উচ্চ
মধ্য
নিম্ন

উচ্চ রাজমুকুট অচিরে তোমারি শিরে শোভা পাইবে

মধ্য

নিম্ন

বল তো তোমার কিসের অভাব কি মনস্তাপ ?

আমি তো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে প্রতি পর্বে উচ্চগ্রাস (high bone) ও ঝোঁক (stress) লক্ষ্য করা যায়। এক ঝোঁক (stress) থেকে অন্য ঝোঁকে যাওয়ার সময় একটা নিম্নস্বরগ্রাসে দ্রুত সন্ধিসময় লক্ষ্য করা যায় (low-fast transition).

নিম্নে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল। বাক্যগুলির মধ্যে একটি ছন্দ লক্ষ্য করা যায় এবং এই গতির জন্য বাক্যগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পথিক উধ্ব'শ্বাসে চলিতেছেন বিরাম নেই মুহূর্ত

কালের জন্য বিশ্রাম নেই এজিদ গোপনে বলিয়া

দিয়াছেন যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইবে চলৎ

শক্তি রহিত হইবে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর

হইয়া পড়িবে সেই সময় একটু বিশ্রাম করিও কিন্তু

বিশ্রাম হেতু যে সময়টুকু অপব্যয় হইবে বিশ্রামের

পর দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবে

আরও একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক :

অর্থ ? হায়রে অর্থ ? হায়রে পাতকি অর্থ ?

তুই জগতের সকল অনর্থের মূল

প্রতিটি প্রশ্নের শেষ স্বরভঙ্গীর উর্ধ্বগতি (gliding up) লক্ষ্য করা যায়। স্বরগ্রাম উচ্চ থেকে মধ্যগ্রামে এবং নিম্ন থেকে মধ্যগ্রামে উঠানামা করবে। এ বাক্য কয়টির অদ্ভুত গঠনভঙ্গীও লক্ষ্যণীয়। প্রথম বাক্যটি একশব্দ বিশিষ্ট, দ্বিতীয়টি দুইশব্দ বিশিষ্ট, তার পরেরটি তিনশব্দ বিশিষ্ট, এবং তারপর শব্দসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি শব্দযোজনার পর উচ্চারণের দ্রুততা বৃদ্ধি পাবে। এ চারটি বাক্য একটি বাক্যের মধ্যে যোজনা করা যেত, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভাষার সমস্ত মাধুর্য অন্তর্হিত হয়ে যেতো এবং মশাররফের স্টাইলের এ হলো বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের আরও বহু উদ্ধৃতি মশাররফের রচনা থেকে দেওয়া যায়।

তথ্য নির্দেশ

[১] 'সাধু ভাষা' শব্দটি বাংলা ভাষায় কখন প্রচলিত হয় তা সঠিক বলা যায় না। রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থে'র অষ্টম পৃষ্ঠায় এ শব্দটি ব্যবহার করেন। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে, ১৮২৪ থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় (*Bulletin of S. O. A. S.*, pt-3, 1956)।

[২] S. K. Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Calcutta University Press, 1926, p. 189.

[৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

[৪] সুকুমার সেন মনে করেন যে, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনা করেন। দ্রষ্টব্য, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সং, পৃঃ ১৯৩।

[৫] 'বিষাদ সিন্ধু', উদ্ধার পর্ব, চতুর্থ প্রবাহ, পৃঃ ৩০৩, [৮ম সং, ১৯০৮]।

[৬] *Calcutta Gazette*, Appendix, 31 October, 1900 : 'mark of East Bengalism.'

[৭] মোহিতলাল মজুমদার, 'সাহিত্য কথা', কলিকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ ২৪০-৯৫। মোহিতলালের আলোচনার উপর ভিত্তি করেই স্টাইল সম্পর্কে এখানে

বিভিন্ন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য, Bonamy Dobree, *Modern Prose Style*, Oxford, 1964.

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০।

[৯] S. K. De, *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetic*, California, 1963, p. 23.

[১০] ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত কবিতাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :

"Poetry alone can tell her dreams
With the fine spell of words alone can save
Imagination from sable chain
And dumb enchantment."

স্টাইল সম্পর্কে আরও একটি মন্তব্য :

"every work of enduring literature is not so much a triumph of language as a victory over language."
দ্রষ্টব্য, মোহিতলাল মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

[১১] N. R. Tempest, *The Rhythm of English Prose*, Cambridge, 1930, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

সপ্তম অধ্যায়

মশাররফ, তাঁর কাল ও পরিবেশ

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সাহিত্যিক মান নির্ধারণ একটি চিরাচরিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আমরা যে সমালোচনার রীতিনীতি অনুসরণ করি তা শুধুমাত্র বিশ্লেষণাত্মক হয় না, সংশ্লেষণাত্মকও হয়। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার মানুষকে অর্থাৎ মানবচরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে এবং মূলতঃ গঠন করেও থাকে। এই সংস্কার বা সংস্কৃতি, বাংলাদেশে একটি মিশ্ররূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মের রীতিনীতি, ইরানী, ভারতীয় ও আরবী সংস্কৃতির একটি সংমিশ্রণ হয়েছিল উনিশ শতকের বাংলাদেশে। বলা বাহুল্য, এ সংস্কৃতির সংমিশ্রণের পশ্চাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা রাজনৈতিক শক্তিও ক্রিয়াশীল ছিল।

মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের বাংলাদেশ তথা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিনিধি। তাঁর রচিত সাহিত্যে তাই সে-যুগের হিন্দু-মুসলমান চরিত্রের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করি। বিশেষ করে স্ব-সমাজের চিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন নির্ভীক। শুধুমাত্র স্ব-সমাজ নয়, স্বীয় পরিবার, এমনকি পিতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতিও কটাক্ষ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। এইখানেই মশাররফ হোসেন সমগ্র উনিশ শতকের গল্প-লেখকদের মধ্যে একক এবং এজন্য তিনি কৃতিত্বের দাবীদার।

মশাররফের বিভিন্ন রচনা থেকে তাঁর কাল ও পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মে। তাঁর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর আত্মজীবনীতে আমরা সে-কালের মানুষের সামাজিক রীতিনীতি এবং তৎকালীন বিচিত্র সংস্কারের একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষ করি। উক্ত আত্মজীবনীতে মশাররফ তাঁর পিতা ও পিতামহের জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মশাররফের সমস্ত সংবাদের উৎস হচ্ছে তাঁর মাতামহী। মাতামহীর কাছ থেকে পরিবারের অনেক ইতিহাস অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করেন মশাররফ।

এ সমস্ত কাহিনী বা ইতিহাসের উৎস হচ্ছে মশাররফের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী', তাঁর স্ত্রী-জীবনী 'বিবি কুলসুম', তাঁর পিতা-মাতার জীবনী 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। এ গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও অতিরিক্ত কিছু মাল-মশলা জুগিয়েছে তাঁর রচিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' এবং 'জমীদার দর্পণ'। মশাররফ রচিত গ্রন্থগুলিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যায়ঃ

(ক) শিক্ষা,

(খ) মুসলমান জমীদারদের জীবনাচরণ,

(গ) লোকসংস্কার, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি,

(ঘ) সমাজে নারীর স্থান, হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথা ও বিধবা-বিবাহ সমস্যা, মুসলিম বিবাহ পদ্ধতি,

(ঙ) কৃষক বিদ্রোহ, বিশেষতঃ নীলচাষ সংক্রান্ত হাঙ্গামা,

(চ) হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব,

(ছ) মুসলিম সমাজের গঠন-কাঠামো, মুসলিম সমাজে হিন্দুসমাজের অনুকরণে 'বর্ণভেদ' প্রথা, পণপ্রথা, দাসত্ব প্রথা, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ।

(ক) শিক্ষা

মীর মশাররফের আত্মজীবনীতে গ্রাম্য পাঠশালার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটি সুন্দর ধারণা জন্মে। মশাররফের বয়স যখন চার বৎসর চার মাস চারদিন, সেদিনই তাঁর 'হাতে খড়ি' বা মুসলমান সমাজে প্রচলিত 'তাক্তি' অনুষ্ঠান হয়।[১] অর্থাৎ সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হয়। ঐ দিন শিশুর হাতে একটি শ্লেট ও একটি শ্লেট-পেন্সিল দেয়া হয়ে থাকে। উইলিয়ম এ্যাডামও[২] তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও একটি অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। উইলিয়াম এ্যাডামের বর্ণনা এরূপঃ

"When a child whether a boy or a girl, is four years, four months and four days old, the friends of the family assemble, and the child is dressed in his best clothes, brought into the company, and seated on cushion in the presence of all. The alphabet, the form of letters used for computation, the introduction to the Koran, some verses

of chapter LV, and the whole of chapter LXXXVII are placed before him ; and he is tought to pronounce them in succession. If the child is self-willed and refuses to read, he is made to pronounce the Bismillah, which answers every purpose, and from that day his education is deemed to have commenced."[৩]

'তাক্তি' অনুষ্ঠানের পর তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হন। সে-সব পাঠশালা সাধারণতঃ একজন শিক্ষক দ্বারাই পরিচালিত হতো। সেখানে তিনি বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হন। মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে প্রথম লিখা আরম্ভ, তারপর কলাপাতার ব্যবহার। সংযুক্ত ব্যঞ্জন লিখবার পর তাদের তালপাতায় লিখতে দেওয়া হয়। খুব ছোট থাকতেই নামতা মুখস্থ করানো হতো। আর ছিল 'কড়াকিয়া'। এটি টাকা-পয়সা সংক্রান্ত নামতা। আরও পরে তাদের কাগজে লিখতে দেওয়া হতো। শেষ পর্যন্ত তাদের হিসাব লিখা, চিঠিপত্র লিখা, দরখাস্ত, দলিল—এই সমস্ত শিখিয়ে দেওয়া হতো। পাঠশালার পাঠ এখানেই সমাপ্ত হতো। পাঠশালার পাঠ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারলে মুহুরী বা কেরানী হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো।[৪]

মশাররফের পার্শ্ববর্তী গ্রামে জগমোহন নন্দীর একটি পাঠশালা ছিল। মশাররফের পিতার অনুরোধে নন্দী মহাশয় উক্ত পাঠশালাটি মশাররফের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। জগমোহন নন্দীর কাছেই মশাররফের বাংলা পড়া শুরু। আরবী-ফার্সী পড়াবার জন্য মশাররফের আরও দু'জন শিক্ষক ছিলেন। আরবী-ফার্সীর শিক্ষকদের সাধারণতঃ 'মুন্সী সাহেব' নামে ডাকা হতো এবং তাঁরা বেতের ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। উইলিয়াম এ্যাডামের বর্ণনার সঙ্গে মশাররফের ব্যক্তিগত শিক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

"Not only are printed books not used in these school, but even manuscript text books are unknown. All that the scholars learn is from the oral dictation of the master ; and although what is so communicated must have a firm

seat in the memory of the teacher, and will probably find on equally firm seat in the memory of the scholar, yet instruction conveyed solely by such means must have a very limited scope. The principal written composition which they learn in this way is the 'Saraswati Bandana', or salutation to the Goddess of learning, which is committed to memory by frequent repetition and is daily recited by the scholars in a body before they leave school,—all kneeling with their heads went to the ground ; and following a leader or monitor in the pronunciation of the successive lines or couplets ··· ···The only other written composition used in these schools, that only in the way of oral dictation by the muster, consists of a few of the rhyming arithmetical rules of Subhankar."

মশাররফ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে সরস্বতী বন্দনার এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :

"সেদিন পাঠশালায় আসিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া জোরে জোরে কবিতা পড়িলাম, পাঠশালার ছুটির পূর্বে আমরা সকলে কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম—নন্দী মহাশয় পড়াইতেন :

জয় জয় দেবী চরাচর সার
কুচযুগে শোভে মুক্তার হার
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্মল বরণ ;
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ।

মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম যে, কলমটি কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাধিয়া উঠে—বাধিরা উঠিলেই মহাপণ্ডিত হইবে।"[৬]

বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষিত লোকের শতকরা হার কত ছিল এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে তা-ও উল্লেখ করেছেন :

"The number of families in which the children receive occasional instruction in reading and writing from parents or friends."

এ্যাডাম তার দ্বিতীয় রিপোর্টের পরিশিষ্টে এই সংখ্যাগুলি দিয়েছেন।

রাজশাহী জিলার নাটোর মহকুমায় মুসলমান ও হিন্দু-পরিবারের মোট সংখ্যা এরূপ :

হিন্দু	—	১০০৯৫
মুসলমান	—	১৯৯৩৫
মোট	—	৩০০৩০

এর মধ্যে নিম্নলিখিত সংখ্যার পরিবারগুলিতে লেখাপড়া প্রচলিত ছিল :

হিন্দু	—	১২৭৭
মুসলমান	—	৩১১
মোট	—	১৫৮৮

উপরের সংখ্যাগুলি থেকে এবং এ্যাডাম কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য তথ্য থেকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিতের আনুপাতিক হারের বিবরণ জানা যায়। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কোলকাতার কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে কোথাও ইংরেজী পড়ানো হতো না বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। ঢাকা, হুগলী ও কৃষ্ণনগরের মত বড় বড় শহরে অবশ্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পঠনপাঠনও হতো। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র প্রকাশিত 'ডেসপ্যাচ' (despatches) থেকে জানা যায় যে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথক 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের ছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানে স্থানে ইংরেজী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং কোলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে অধিকতর অর্থসাহায্য দেওয়া হলো এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়-গুলি পরিদর্শনের জন্য অধিক সংখ্যক পরিদর্শক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হলেন। হিন্দুসমাজ এই পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হলেন। ফলে তারা বৃহত্তর সমাজে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেন এবং সরকারী চাকুরীতে তাঁরা

অগ্রাধিকার লাভ করেন। সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ ছিলেন এবং এই বিমুখতার পশ্চাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন। কেননা ভারতের শাসনক্ষমতা মুসলমানের হাত থেকেই ইংরেজের কর্তৃত্বে চলে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে পশ্চাদমুখীতার জন্যই মুসলমান সমাজ অতি অল্পকালের মধ্যে হিন্দুসমাজের অনেক পশ্চাতে পড়ে যায়।[৭]

উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত The Indian Musalmans গ্রন্থে[৮] বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষিতের হার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। হাণ্টারের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"Our system of public instruction is opposed to the traditions and hateful to religion of the Musalmans."[৯]

ইংরেজী বা পাশ্চাত্য দেশীয় শিক্ষার প্রতি তৎকালীন মুসলমানদের কী মনোভাব ছিল তা মশাররফের আত্মজীবনীতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

> "কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে। বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় গিড়ী মিড়ী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ-রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে, ইংরেজী পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়। মাথার চুল খাট করিয়া নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোশাক পরে। ছুরি-কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব-তমিজের ধার ধারে না। স্বভাবও যেন একটু উদ্ধত ভাব ধারণ করে। নম্রতার নাম-গন্ধও থাকে না।......মাতামহীর ধারণা, ছেলে খ্রীস্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদা-রসুলের নাম করিবে না। মোসলমান ধর্ম প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না।"[১০]

ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হাণ্টারের পূর্বোক্ত মন্তব্য থেকেও এটি প্রতীয়মান হয়[১১] এবং মশাররফও অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীতে ঃ

"বিশেষ বিদ্যারচর্চা ও-অঞ্চলেই ছিল না। তবে কোন কোন গ্রামে গুরু

মহাশয়ের পাঠশালা ছিল। মক্তব-মাদ্রাসার নামও কেহ জানিত না। ফারসী-আরবী কেহ পড়িত না।"[১২]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আছে :

আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। ইংরেজী আর বাংলা পড়িতে হয়। ... ... এতদিন পড়িলাম, আল্লা-রসুলের নাম কোন স্থানে পাইলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরেজী কেতাবের মধ্যে কয়েক জায়গায় শুকরের নাম পাইলাম। পাক-সাফ, পবিত্রতার নাম-গন্ধ পাইলাম না।"[১৩]

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মশাররফ 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন :

"মুসলমান রমণীমধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিখিবার সুপ্রশস্ত পথ নাই, জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই; ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই; সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবার বুদ্ধি নাই, ... সাধারণ স্ত্রীলোক বিষয়ে ভাবিলে, তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে মুসলমান রমণীর ন্যায় অবোধ-সরল মূর্খ আর কোন জাতির মধ্যে নাই। প্রথম বয়সে খেলা-ধূলা, তাহার পর বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এক প্রকার বন্দিনী। কিছু বেশী বয়স হইলে অবিবাহিতা অবস্থায় জন্মদাতা পিতার সহিত দেখা পর্যন্ত হয় না—এ প্রথা ভদ্র সমাজেই প্রচলিত।"[১৪]

উক্ত পুস্তকের এক প্রধান চরিত্র 'সোনাবিবি' সম্পর্কে মশাররফ লিখেছেন :

"সোনাবিবির বয়স চল্লিশের উপর। স্বামী বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত শিখিয়া-ছেন পাঁচ সন্ধ্যা উপসনার নিয়ম; এবং সেই উপাসনায় পবিত্র কোরানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি 'সুরা' (পদ) ও যাহা যাহা আবশ্যক। আর দেখিবার মধ্যে দেখিয়াছেন বাড়ীর দ্বিতল-ত্রিতল দালান, চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর, হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী। উদ্ভিদের মধ্যে দেখিয়াছেন, প্যাজ, মরিচ, বেগুন ইত্যাদি। ... ... লিখাপড়ার মধ্যে অতি কষ্টে আপন নামটি সহি করিতে পারেন; কিন্তু তাহাও কাগজ ভাজিয়া না দিলে, 'দোত' হইতে কলমে কালি উঠাইয়া না দিলে হয় না।"[১৫]

মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টেও অনুরূপ

আলেখ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনে গৃহীত জনৈক সৈয়দ আমীর হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

"Among the girls of Muhammadan of the lower classes there is no education to speak of. Muhammadan girls of the upper and middle clssses are taught reading the Koran and simple religious books and neadlework in their own zananas, but they seldom learn to write. The number of leading and representative Muhammadans who are in favour of female education in public schools may be counted in one's fingers."[১৬]

উক্ত রিপোর্টে আরও দেখা যাবে যে, ৫৬৮ জন মহিলার মধ্যে একজন মাত্র লিখতে বা পড়তে পারে।[১৭] মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের শতকরা হার বাংলাদেশে এরূপঃ হিন্দু হচ্ছে ৮৬.৫৫, মুসলমান হচ্ছে ১১.৯৩।[১৮] অবশ্য হিন্দু ও মুসলমান নারীদের শতকরা হার জানা যাচ্ছে না। যাহোক, উপরের হিসাব থেকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যে কত কম ছিল তা অনায়াসেই ধারণা করা যায়। মশাররফের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা বাংলা পড়তে জানতেন বটে, কিন্তু লিখতে পারতেন না।[১৯] আরবী-ফার্সী পড়াতেন যে মুন্সী সাহেব তাঁরাও বাংলা লিখতে পারতেন না।[২০] বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের কী মনোভাব ছিল তা মশাররফের পিতার বাংলা ভাষাজ্ঞান থেকেও বুঝা যায়। হাণ্টার মন্তব্য করেছেনঃ

"The Vernacular of Bengal, a language which the educated Muhammadans despise."[২১]

হাণ্টারের মন্তব্য অনেকাংশে সত্য। কেননা নিম্নবঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় জিলাগুলিতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা ফার্সী বা উর্দুর চর্চা করতেন এবং মুসলমানদের কথ্যভাষায় প্রচুর ফার্সী-উর্দু শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহৃত হতো। হাণ্টারের পরিভাষায় এই ভাষাকে 'মুসলমানী বাংলা'[২২] বলা হয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবী মুসলিম সমাজে কী মনোভাব ছিল তা ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনে প্রদত্ত নবাব আবদুল লতিফের বিবরণ থেকে বুঝা যায়ঃ

"Primary instruction for the lowest classes of p ople who for the most part are ethnically allied to Hindus should be in Bengali language, purified however from the superstructure of Sanskritism of learned Hindus and supplemented by the numerous words of Arabic and Persian origin which are current in everyday speech. For the middle and upper classes of Muhammadans Urdu should be recognised as the vernacular."[২৩]

যাহোক, ভারত বা বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার এটা চাইতেন যে, মুসলমানেরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার চর্চা করুক :

"In Bengal it would not be desirable to encourage the Muhammadans to look to oriental languages for higher education. The vernacular language is generally Bengalee, not Hindustani far less Oordoo."[২৪]

মুসলমান সমাজে সাধারণতঃ আরবী-ফার্সী শিক্ষার ভিতর দিয়েই বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হতো। মশাররফেরও প্রথম পাঠ আরবী-ফার্সীর মাধ্যমেই শুরু হয়।[২৫] মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা কোরানের ভাষা আরবীতে করতে হয় বলে আরবী শিক্ষা করা তাদের অত্যাবশ্যকীয়। পেশাদার মোল্লা-মৌলভী— যারা কোরানের শ্লোক আবৃত্তি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতো তাদের প্রতি মশাররফ কটাক্ষ করেছেন। কেননা এই সমস্ত অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-মৌলভীরা কোরানের সঠিক অর্থ জানতো না।[২৬]

(খ) মুসলমান জমীদারদের জীবনাচরণ

উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান-হিন্দুসমাজ নির্বিশেষে জমীদার শ্রেণীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। মশাররফ তাঁর আত্ম-জীবনীতে তাঁর এক জ্ঞাতিভ্রাতা জনৈক নবাব ও জমীদারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যিনি যাবতীয় দুষ্কর্ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২৭] 'জমীদার দর্পণ' নাটকেও মশাররফ এক লম্পট জমীদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই সমস্ত জমীদারেরা অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। মশাররফের ভাষায় :

"ভগবান তাদের হাত-পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নেই। দেখতে খাসা হাত, কিন্তু খাগুসামগ্রী হাতে কোরে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়।"[২৮]

এই জমীদাররা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই নৃত্য-সঙ্গীত এবং নারীসংসর্গেই অতিবাহিত করতেন। তাঁদের বাঁদী-দাসী ছাড়া উপপত্নী বা রক্ষিতাও থাকতো। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা নবাবের রক্ষিতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'আমার জীবনী'র ১৮৮ পৃষ্ঠায় মশাররফ লিখেছেন:

"একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি। আহারান্তে নবাব সাহেব তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বাঁটিতে লাগিলেন। কি একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক পেছনের কামরা হইতে আসিয়া নবাবের বাম দিকে ঘেঁসিয়া বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফিটিতে লাগিল।"

'জমীদার দর্পণ নাটকে' মশাররফ এই সমস্ত জমীদারদের জানোয়ার বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকার লিখছেন:

"এ জানওয়ারদের চারখানা পা'ও নেই, আর ল্যাজও নেই। এরা খাসা পোশাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে; খোসামুদে কুকুররাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নেই, যা মনে হচ্ছে তাই করছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়াররা অপমানভয়ে নিজে কোন কার্যই করে না। ··· ··· আহারের সামগ্রী প্রায়ই চাকরে চিবিয়ে দেয়।"

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মশাররফ কয়েকজন মহিলা-জমিদারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই পুস্তকের বেগম সাহেবা সব সময় অতি ধনবানের মত জীবন-যাপন করতেন। মশাররফ লিখেছেন:

"বেগম সাহেবার কাণ্ড-কারখানা, কার্যপ্রণালী, ব্যবহার, ব্যয়বিধান, ব্যবস্থা সকলই অতিরিক্ত। বড়মানুষি দেখানই স্বভাব।"[২৯]

বিনা প্রয়োজনে তারা শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর প্রকাশের জন্যই অর্থব্যয় করতেন।[৩০] জমীদারদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ সব সময় লেগেই থাকতো। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে দুই মুসলিম মহিলা-জমীদারের সংঘর্ষের বিবরণ আছে।

তাদের কর্মচারীদের মধ্যে খাজনা আদায় নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে এমন বিবরণ 'গাজী মিয়ঁার বস্তানীতে' দৃষ্ট হয়।[৩১] মুসলমান সমাজের জমীদারদের জীবন নিয়ে সে-যুগে কেবল মশাররফ হোসেনই কিছু লিখেছিলেন।

(গ) লোকসংস্কার, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি

সে-যুগের গ্রামবাসীরা অতিপ্রাকৃতে, ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতো। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর স্বীয় পল্লীর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত গৌরী-নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিবরণটি দিয়েছেন তাতে তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গঙ্গাদেবী গৌরী নাম্নী দাসীর ছদ্মবেশে অবস্থান করছিলেন। যেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ গৌরীকে দেবী হিসাবে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ গৌরী অন্তর্হিত হলেন। তাঁর পায়ের চিহ্ন যেখানে পড়লো সেখানেই জলধারা উৎপত্তি হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হলো।[৩২] মশাররফ স্বয়ং এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশ্বাস করতো যে, গৌরীনদীর জল দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ক।

সে-যুগের লোকেরা ভূতপ্রেত, দৈত্য, ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতো। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে এইসব অতিপ্রাকৃত বা অশুভশক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের শ্রেণীকরণ করেছেন। এই সমস্ত অশুভশক্তিকে তাদের উৎস অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হতো। যেমন—যখন কোন গো-জাতি মৃত্যুর পর প্রেতে পরিণত হতো, তাকে 'গোদান' বলা হতো। ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মদৈত্যে রূপান্তরিত হতো। চণ্ডাল বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'দুষ্টভূতে' রূপান্তরিত হতো। কোন নারী মৃত্যুর পর প্রেতনী বা পেত্নীতে পরিণত হতো। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানরাও ভূতপ্রেতে পরিণত হতো।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা 'মামদো ভূতে', 'লাল্লু', 'কাল্লু', 'লেলুয়া', 'ভুতুয়া' ইত্যাদিতে পরিণত হতো। মৃত্যুর পূর্বে কখনও দুষ্টাপ্রকৃতির নারী 'ডাইনী'তে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। এসব ছাড়া মুসলমানগণ 'জিন', 'পরী' ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। জিন-পরীরা আগুনের তৈরী বলে তাদের বিশ্বাস। অল্পবয়স্ক শিশুদের অনিষ্ট করার জন্য ছিল 'পেচ-পাঁচী' নামক প্রেত। সন্তানবতী নারীর প্রসবকালে এ সমস্ত ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে মশাররফ সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৩]

মশাররফ যাদু, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির ভক্ত ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীর একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডে তাঁর অসুস্থা প্রেমিকা লতিফাকে কিভাবে ওঝারা ঝাঁড়-ফুঁক করেছিল তার বিবরণ আছে: ওঝা এসে কিছু অস্পষ্টস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং রোগিনীর কাছে ধূপধুনা, জবাফুল, চাল, কাঁচকলা, পাকা কলা, ডাব, মাথার খুলি, চাঁড়ালের হাড়, জারজের হাড় ঢেকে রাখা হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রেতের আবির্ভাব হয় এবং তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ওঝার সঙ্গে তার বাক্যবিনিময় হয়। সেই অদৃশ্য স্বর ঘোষণা করে যে, রোগিনীর রোগ দুরারোগ্য এবং তার মৃত্যু অনিবার্য। দুর্ভাগ্যক্রমে লতিফা আটদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। মশাররফ নিজেও তেলপড়া দিয়ে লতিফাকে আরোগ্য করে তুলতে চাইলেন।

'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'তে দেখা যায়, সোনাবিবি জনৈক গুরুজীর সহায়তায় তার বিরূপ সন্তানকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সোনাবিবির পুত্র জয়ঢাকের একটি মাটির প্রতিকৃতি তৈরী করে তাতে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন গুরুজী। আবার জনৈক বেদেনী, যে নাকি হাততালি দিয়েই গাছের পাতা যুক্ত করে দিতে পারে, তার সহায়তায় পুত্রকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেন সোনাবিবি। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দেখা যাবে যে, দৌলতন্নেসার মাতা তার কন্যার রোগমুক্তির জন্য শিরনী দিচ্ছেন। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে লক্ষ্য করা যায় যে, পেশাদার মুসলমান মোল্লারা পীরের সমাধিতে (দরগা) শিরনী দিচ্ছেন। তা ছাড়া নানাপ্রকার কুসংস্কার সে-যুগের লোকদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতো। যেমন—যাত্রাকালে হাঁচি বা টিকটিকি অশুভ বলে বিবেচিত হতো।[৩৪]

(ঘ) সমাজে নারীর স্থান

সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের নীচে। স্বামীর চরিত্র যেমনই হোক, স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর সেবা করা। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে মশাররফের মন্তব্য হচ্ছে:

> "ভারতের স্ত্রীর নিকট স্বামীর বড়ই মান ও আদর। বড় করিয়া কথা কহিতেও ভয় করে। স্বামী দেবতা।"[৩৫]

পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির কোন স্বাধীনতা ছিল না। কোন ব্যাপারেই

স্ত্রীদের কোন বক্তব্য শোনা হতো না এবং স্বামীরা ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের যে-কোন শাস্তি দিতে পারতেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের মিসেস কেনী এমন মন্তব্য করছেন যে, এদেশে স্ত্রীরা স্বামীদের কর্তৃক প্রহৃত হয়। স্বামীরা স্ত্রীদের অবাধ্যতা সহ্য করতো না। বৈবাহিক ব্যাপারেও নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পিতামাতা বা অভিভাবকেরা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করতেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে জনৈকা নারীর উক্তি এরূপ :

> "বোন! আমাদের বিয়ে সুখের ব্যাপার নয়, বড়ই দুঃখের কথা। যে মুসলমান মেয়ে বিয়েকে সুখের সম্বন্ধ মনে করে সে নিতান্ত হাবা। ... ... আগাগোড়া দুঃখ। ... ... একশত মধ্যে দু'টি স্ত্রীলোক স্বামীসুখে সুখী কিনা আমি বলতে পারি না।"[৩৬]

উচ্চসমাজে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ছিল। অবশ্য দরিদ্রসমাজে কার্য উপলক্ষ্যে মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতেন ঠিকই। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মশাররফ পর্দা না-মানার জন্য বেগম সাহেবার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বেগম সাহেবা শহরের রাজকর্মচারী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন বলে মশাররফ বিদ্রূপের কশাঘাতে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র প্রতি পৃষ্ঠাকে যেন জর্জরিত করে তুলেছেন। সমগ্র পুস্তকখানিই অভিজাতশ্রেণীর মহিলাদের প্রতি শ্লেষোক্তিতে পরিপূর্ণ।[৩৭]

প্রসঙ্গক্রমে মশাররফ অমুসলিম পাঠকদের সুবিধার্থে মুসলমান বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।[৩৮] মুসলমান বিবাহপদ্ধতির দু'টি দিক আছে : একটি শাস্ত্রীয় বিধি—এটি পৃথিবীর সব মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হয় : অন্যটি হচ্ছে স্থানীয় আচারপদ্ধতি। কোন মুসলমানের বিবাহে একজন প্রস্তাবক ও একজন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হয়, তাদের উপস্থিতিতে কন্যা বিবাহে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কন্যার স্বীকৃতির পর বরকেও স্বীকৃতি উচ্চারণ করতে হয়। পাত্র পাত্রীকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বা মোহরানা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই অর্থ দেওয়া হয় না তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্ত্রী এই অর্থ দাবী করে থাকে। বিবাহের পূর্বে পাত্রীকে দেখানো হয় না। অবশ্য এ নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। গোঁড়া মুসলমানদের ধারণা যে, কোন অনাত্মীয়া মহিলাকে কোন পুরুষই দেখতে পারে না। মশাররফও গোঁড়া মুসলমান সমাজভুক্ত ছিলেন। ফলে তিনিও বিবাহের পূর্বে কন্যাকে দেখেননি। পরবর্তী-

কালে দেখা যায় তিনি এই সমস্ত নিয়মের বিপক্ষে ছিলেন এবং সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন।

বিবাহপরবর্তী নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি হচ্ছে—মুখ দর্শন বা 'চার-চশমী' (চার চোখের মিলন)। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বর-বধূকে একটি ঘরে বসতে দেওয়া হয় এবং তাদের সামনে একটি বৃহৎ দর্পণ রাখা হয়। দর্পণের ভিতর দিয়ে উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করে। অন্যান্য অনুষ্ঠান, যেমন—অতিথি আপ্যায়ণ, সঙ্গীত অনুষ্ঠান, উপহার প্রদান, এগুলি এক এক অঞ্চলে এক এক রকম।

বিধবা-বিবাহ মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে পুর্বস্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ-বিচ্ছেদের পর একটি নির্দিষ্ট সময় বা 'এদ্দত'[৩৯] অতিবাহিত হওয়ার পর পুনর্বিবাহ সিদ্ধ। হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, বরং 'সতীদাহ' প্রথা চালু ছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এ প্রথা বাংলা বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল। "১৮১৪ থেকে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রতি বছর ৫০০ শত নারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়।" জনৈক ঐতিহাসিক এর জন্য ব্রিটিশ সরকারকে কটাক্ষ করেছেন।[৪০] ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় যে, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কেবল বঙ্গদেশেই ৬৫৪ জন বিধবা নারী সহমৃতা হন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল ৫৮৩।[৪১] এইগুলি সরকারী হিসাব। সবগুলি সহমরণের সংবাদই যে সরকারের জানা ছিল এমন কথা নয়। অবশ্য তৎকালীন সরকার একটি নিয়ম করেছিলেন যে, যে সমস্ত সদ্যবিধবা নারী সহমরণে যাবেন তাদের সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র নিতে হবে। কিছুকালের মধ্যেই এ অমানুষিক নিষ্ঠুর প্রথাটি রহিত করার জন্য ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার '১৭ নম্বর রেগুলেশন' জারী করলেন এবং এই আইনে সতীদাহ প্রথা বেআইনী বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মনে হয় ঐ সময়ের পরেও কিছুকাল এই প্রথাটি চালু ছিল। মশাররফ তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটকে' এমন একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন যেখানে এক যুবতী নারী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছেন। সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হলেও বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে খুব সহজে প্রচলিত হয়নি। এটি একটি সমস্যারূপে থেকেই গেল। কেননা অল্পবয়স্কা বিধবারা হয় সারাজীবন কঠোর বৈধব্যকে বরণ করে নিত, অথবা অন্যথায় দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮৫৬ সনে পনর নম্বর আইন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় পাশ হয় এবং বিধবা-বিবাহের পথে অন্তরায়-গুলি দূর করা হয়। আইনগত বাধা অপসারিত হলেও গোঁড়া সমাজে এই বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন খুব সহজ হলো না। অবশ্য বঙ্গদেশে কোথাও কোথাও দুই-চারিটি বিধবার পুনরায় বিবাহ হয়। যেমন, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহে কালীনাথ দে এক বিধবাকে বিবাহ করেন।[৪২] 'জমীদার দর্পণ' নাটকে মশাররফ উল্লেখ করেন যে, পাবনায় বিধবা-বিবাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা সেখানে লোকেরা বর-বধূকে জীবন্ত দগ্ধ করার চেষ্টা করে। অবশ্য মশাররফের এই ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে যাচাই করা যাচ্ছে না; তথাপি এটি সত্য যে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে হিন্দুসমাজের এক শ্রেণীর লোক প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন।

হিন্দু বা মুসলিম উভয় সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। মশাররফ স্বয়ং একাধিক দারপরিগ্রহ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। মশাররফও যেন এই বহুবিবাহ সমর্থন করতেন মনে হয়। কেননা মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ (অবশ্য এর সীমা নির্ধারিত) শাস্ত্র বা আইনসঙ্গত। কিন্তু বিনা কারণে একাধিক পত্নীগ্রহণের সমস্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'আমার জীবনী' গ্রন্থে মশাররফ তাঁর এক মাতামহীর দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন যিনি এ প্রথাকে ঘৃণা করতেন।

(ঙ) কৃষক বিদ্রোহ : নীলচাষ সংক্রান্ত হাঙ্গামা

তৎকালীন বাংলাদেশের কৃষকসমাজ বিশেষ করে নদীয়া, যশোহর, খুলনা এবং পাবনা জেলার কৃষকেরা নীলচাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে মশাররফ এ সম্পর্কে বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রঙ হিসাবে নীলের চাষ এবং রঙ তৈরী বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে শুরু হয়। লুই বগদ নামে জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের দিকে নীল তৈরী করা আরম্ভ করেন।[৪৩] উনবিংশ শতাব্দীতে এটি একটি লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে পরিণত হয় এবং বাঙলায় বসবাস-কারী অনেক শ্বেতাঙ্গ-ব্যবসায়ী নীলের ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে অবশ্য এতদ্দেশীয় অনেক জমীদার আর্থিক লাভের জন্য নীলচাষ আরম্ভ করে।

ক্রমে অবস্থা এমন হয় যে, লাভের দিকেই সকলের আগ্রহ দেখা যায়; যে সমস্ত চাষী নীলকুঠির মালিকদের জন্য নীলচাষ করতো তারা ন্যায্যমূল্য পেত না। নীলচাষের দু'রকম পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।[৪৪] এক, 'নিজাবাদ' চাষ, দুই, 'রাইয়তী' চাষ। 'নিজাবাদ' পদ্ধতিতে নীলকুঠির মালিক তার নিজ জমিতে নিজের খরচায় নীলচাষ করতো। আর 'রাইয়তী' পদ্ধতিতে প্রজা নীলকুঠির মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার নিজের জমিতে নিজের খরচায় নীল-চাষ করতো। চুক্তিতে নীলের মণপ্রতি দামের উল্লেখ থাকতো এবং নীলকুঠি মালিকেরা প্রজাকে অগ্রিম দিতো। এই অগ্রিম অর্থ বৎসরান্তে হিসাব করে মিটিয়ে দেওয়া হতো। এই পদ্ধতি আপাততঃ খুবই সহজ মনে হয় এবং আপত্তিকর কিছুই এর মধ্যে নাই মনে হতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ এর মধ্যে অনেক দুর্নীতি প্রবেশ করে।[৪৫] নীলকুঠির মালিকেরা বাজার-দরের চাইতে অনেক কম মূল্যে নীল ক্রয় করতো। নীলচাষ সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, একমণ নীলের দাম মাত্র চার টাকা দেওয়া হতো; অথচ তখন বাজারে দশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত এক মণের দাম ছিল। নীলকুঠির মালিকেরা নীলের দাম মোটামুটি একই দামে নির্দিষ্ট ক'রে রাখতো এবং প্রজাদের সবচেয়ে উর্বর জমিতে নীলের চাষ করতে বাধ্য করা হতো। তদুপরি জমির মাপ এবং নীলের বোঝা মাপের সময়ও কুঠিয়ালরা প্রতারণা করতো।

নীলচাষীদের উপর যে নানারকম অত্যাচার হচ্ছিল তা সরকারের জানা ছিল এবং ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের দিকে সরকার তা স্বীকার করেছেন। ইউরোপীয় চারজন নীলকর সাহেবের অসাদাচরণের দায়ে নীলচাষের লাইসেন্স বাতিল ক'রে দেওয়া হয় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে।[৪৬]

পরবর্তীকালে অনেক বিদেশী নীলকর জমিদারী ক্রয় ক'রে বা পত্তনী নিয়ে অনেক জমির মালিকে পরিণত হয়। এর ফলে তারা অশিক্ষিত রায়তের উপর যথেচ্ছ কর্তৃত্বের সুযোগ লাভ করে।[৪৭] তৎকালীন বাঙলার গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন, "কোন প্রজার জমিদার নীলকর না হলে তার নীলচাষের ব্যাপারে কিছুটা বাঁচোয়া; কিন্তু যে সমস্ত প্রজার জমিদার স্বয়ং নীলচাষী সে সমস্ত প্রজার রক্ষা ছিল না।"[৪৮]

কৃষকদের পক্ষে এই নীলচাষ মোটেই লাভজনক ব্যবসায় ছিল না। এই কারণে যখন তারা নীলচাষে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তাদের উপর

নীলকরদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ও লাঠিয়ালেরা নানারূপ অত্যাচার করতো। ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এদিকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের পাঁচ নম্বর রেগুলেশনের বলে নীলকর জমিদাররা নীলচাষীদের ওয়াদা খেলাফের অজুহাতে মামলায় জড়িয়ে প্রজাদের জব্দ করতো। এই আইনে আবার অনেক চাষীর জেল পর্যন্ত হয়।[৪৯] এদিকে বিদেশী নীলকর সাহেবরা অপ্রতিহত অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে এই কারণে যে, ইউরোপীয়ানদের বিচার শুধু কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টে ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটরাই করতে পারতেন। এই কারণেও পল্লী অঞ্চলের প্রজারা তাদের অভিযোগের প্রতিকার পায়নি এবং যে চাষী একবার নীল চাষের চুক্তিতে রাজি হতো, সে বংশানুক্রমে নীলচাষে জড়িয়ে পড়তো। কেননা সে যে অগ্রিম নিতো তা সে কোনদিনই আর শোধ করতে পারতো না।

কয়েক বছরের মধ্যে নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চলে নীলচাষ হতো সেখানকার চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে নীলচাষ করবে না স্থির করে। তারা অবশ্য নীলকর সাহেবদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও সংঘবদ্ধ হয়। নীলকর জমিদারেরা, নীলকুঠির মালিকেরা চুক্তিভঙ্গের দায়ে বহু প্রজার বিরুদ্ধে মামলা করে। বিচারকেরা যারা অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয়ান, নীলকুঠির মালিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে। সরকারের কাছে নীলকুঠির মালিকেরা অভিযোগ করে যে, চাষীরা তাদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নিতো। অন্যদিকে প্রজারা অভিযোগ করে যে, নীলকুঠির মালিকেরা তাদের ভাড়াটিয়া লোকদের দ্বারা জোরপূর্বক কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করতো। নীলচাষ সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় নীলকুঠির মালিকেরা অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন, প্রজাদের কয়েদ ক'রে রাখা—এসব পদ্ধতিতে তারা চুক্তিতে সই করতে প্রজাদের বাধ্য করতো। নীল-কমিশন কর্তৃক এই সমস্ত অনেক অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বৃটিশ লেখক ও সিভিল সারভেণ্ট সি. ই. বাকল্যাণ্ডের Bengal under the Lieutenant Governor's পুস্তকে আর একটি প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়।[৫০]

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত The Hindoo Patriot সাপ্তাহিক চাষীদের পক্ষ সমর্থন ক'রে লিখতে থাকে। এই পত্রিকায় অসংখ্য চিঠিপত্র, অভিযোগপত্র, সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"মিয়ার সাহেবের বিজলী কুঠির ওমান সাহেব উমেদপুর, কৃষ্ণপুর, পোয়ারা,

বিষতোদ, রাখণ্ডী, আরকান্দি গ্রামের কয়েকজন মণ্ডলকে বন্দী ক'রে রাখে এবং তারা চুক্তি সই না করলে তাদের গুদামে বন্দী ক'রে রাখবে বলে ভয় দেখানো হয়। ··· ··· ম্যাকার্থার দুইশত লাঠিয়াল নিয়ে উক্ত ভদ্রলোকের কাচারি-বাড়ী আক্রমণ করে। ··· ··· মল্লিকপুর গ্রামটি লুণ্ঠিত হয়েছে। স্কিনার সাহেব তদন্তে গেছেন।[৫১] "হাজরাপুর কুঠির মালিক ওট্‌স সাহেব জনৈক রামতনুর বাড়ী আক্রমণ করে। রামতনু বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা পালাতে পারেনি। লাঠিয়ালেরা প্রথমে ঘরগুলি ভেঙ্গে ফেলে, আসবাবপত্র লুঠ করে, মেয়েদেরকে আটক করা হয় এবং একদম বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ··· ··· লাউতারা গ্রামের শাকেরাও ওট্‌স সাহেব কর্তৃক অনুরূপভাবে লাঞ্ছিত হয়। তাদের বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হয়, পরে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে মামালাও হয়েছিল; কিন্তু স্কিনার সাহেব তা খারিজ করে দেন। ··· ··· ওমান সাহেব সমস্ত কুঠিয়ালদের মধ্যে জঘন্য অত্যাচারী, ··· ··· সম্ভবতঃ এই কারণেই তার কারখানা এ বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ··· ··· মলোনী সাহেবের আবির্ভাব আবার সবার মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। প্রজাদের ধারণা, সরকার তাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও নীলকর কুঠিয়ালদের প্রতি তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।[৫২] ··· ··· ওমান সাহেব অনেক লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি নিজে বন্দুক রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত।"[৫৩]

সেকালের বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতেও এই অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। 'বঙ্গদূত',[৫৪] 'সমাচার দর্পণ',[৫৫] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'[৫৬] ইত্যাদিতেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক রচনায়ও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, 'আলালের ঘরের দুলালে'[৫৭] আছে :

"যশোহরে নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ; আর যিনি নীল-করের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা হয়।"

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকেও এই নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন :

"রেভারেণ্ড জেম্‌স লং সাহেব প্রজাদের পক্ষ সমর্থন ক'রে আসছিলেন,

তিনি 'নীল দর্পণ' নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৫৮] এই অনুবাদ প্রকাশ করার জন্ম লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ডও হয়। চাষীরা বারংবার সরকারের কাছে তাদের অভাব-অভিযোগের বিবরণ জানিয়ে প্রতিকার চায়।"

Buckland লিখেছেন:

"Numerous petitions were received from the raiyats complaining of cruel oppressions practised upon them by the planters, and of compulsory cultivation of a crop which they represented not only as unprofitable but as entailing upon as a harrassing, vexations distasteful interference."[৫৯]

বাংলার ছোট লাট স্যার গ্রাণ্টের ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬০, কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়:

"I proceeded along the Kumar and Kaliganga which rivers run in Nadia and Jessore and through that part of the Pabna district which lies south of the Ganges. Numerous crowds of raiyats appeared at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo."[৬০]

তৎকালীন ভারতের বড় লাট লর্ড ক্যানিংও নীলচাষ সংক্রান্ত গোলযোগে বিচলিত হন। ইংলণ্ডে ভারত-সচিবের নিকট লিখিত এক পত্রে ক্যানিং লিখেন:

"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, this was when Grant came back from his rather ill-timed expedition to the railway works at Sirajgenj. You will have seen a short account of it in one of his minutes or official letters. Both banks of the River [the Jamuna] for a whole day's voyage (70 or 80 miles) lined up by thousands of people, the men running with the steamer,

the women sitting by the water's edge ; each village with those who had flocked into it from distant districts, taking up the running in succession ; all crying to the Sahib for justice, but all respectful and orderly ··· ···. A few people who can do this and do it soberly and intelligently may be weak and unresistful individually but as a mass they cannot be dealt with too carefully ; neither can there be any doubt that they feel a deep seated grievance. From that day I felt that a shot firied in anger or fear by a foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flame."[৬১]

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় 'একাদশ আইন' (Act XI) প্রণীত হয়। এই আইনে নীলচাষ সংক্রান্ত গোলযোগের তদন্ত করার জন্য 'কমিশন' গঠিত হয়। যথাসময়ে এই কমিশন তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিশন কৃষক কর্তৃক আনীত সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করে, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে এবং নীলকর সাহেবদেরও জেরা করে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, কৃষকেরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছিল তা প্রায় সবগুলিই প্রমাণিত হয়। অবশ্য একটি কথা থেকে যায় যে, সমস্ত বিদেশী নীলকর সাহেবরা সমান অপরাধী কিনা তা বলা সম্ভবপর নয়। এটা নিঃসন্দেহ যে, কিছু সংখ্যক নীলকর সাহেব সত্যি সত্যি অপরাধী ছিল। নীল ব্যবসায়ে নিযুক্ত ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা ছিল ২৪৩ এবং এদের ৫৬৭টি তালুক ছিল। ৪৪টি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে কমিশন নানারূপ প্রশ্ন ক'রে (questionnaire) পাঠান। তারা তার জবাবও দেয়। যাহোক, কমিশন ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী, ধর্মপ্রচারক, এদের থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ ক'রে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন কোন নীলকর জঘন্য অত্যাচারী ছিল। যদিও তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কমিশন নীরব। ভারতবর্ষীয় শাসক সম্প্রদায় আর নীলকর সাহেব এরা একই শ্রেণীর বা একই দেশের অধিবাসী ছিল এবং অধিকাংশ ম্যাজিস্ট্রেট নীলকর সাহেবদের বন্ধু ছিল। কমিশনের একটি মন্তব্য এরূপ :

"The bias of the English magistrate has been increasingly towards his countrymen, whom he has asked to his own table or met in the hunting field or whose houses he has personally visited."[৬২]

অবশ্য এদের মধ্যে সৎকর্মচারী ছিল না এমন নয়। কিন্তু তারা উধ্ব'তন কর্তৃ'-পক্ষের মনোভাবের জন্য সৎ থাকতে পারেনি। নীল-কমিশনের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়:

"honest officers willing to do their duty were discouraged or prevented from doing their duty by the attitude of the higher authorities."[৬৩]

আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের আগে অনেক নীলকর সাহেবকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। রেভারেণ্ড জেম্‌স লং সাহেব কমিশনের সামনে এদের সম্পর্কে বলেছিলেন:

"the wolf is appointed the guardian of the flock."[৬৪]

ইডেন সাহেব বলেন:

"one tithe of the offences actually committed ever came before any court at all."[৬৫]

কমিশনের কাছে বিবৃতিদানকালে উক্ত ইডেন সাহেব আরও বলেন:

"deeds of violence are not frequent ; but still they are such as to keep up and perpetuate a feeling of terrorism without which ; in my opinion, the cultivation of indigo could not be carried for one day. Any act of violence committed in a district [he refers to incident in Rajshahi where three cultivators were killed, six wounded, three villages gutted] would be enough to strike terror into the hearts of ryots."[৬৬]

নীলচাষ সংক্রান্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে De-Latur নামক জনৈক বিচারক বলেন:

"such a system of carrying on Indigo I consider to be a system of bloodshed."[৬৭]

উক্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিদেশী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলি আনা হয় :

(ক) নির্যাতন ও এ দেশীয় লোক হত্যা,

(খ) অন্যায় আটক,

(গ) অন্য নীলকুঠিয়ালদের সঙ্গে সংঘর্ষ, দাঙ্গা,

(ঘ) দৈহিক শাস্তিপ্রদান।

কমিশন এই সুপারিশ করে যে, চুক্তি সই করার ব্যাপারে প্রজাদের উপর জোর করা চলবে না। সব রকম অভিযোগের বিচার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পন্ন হবে। এই কমিশনের রিপোর্টের পরপরই নতুন মহকুমা স্থাপিত হলো, পুলিশকে শক্তিশালী করা হলো এবং উন্নত ব্যবস্থায় তারা কাজ করতে সমর্থ হলো, নীলচাষ যে যে অঞ্চলে বেশী হতো সেখানে আদালত স্থাপন করা হলো। যাহোক, প্রজারা খুশী হলো এই ভেবে যে, সরকার তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ এবং তাদের প্রাণ-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে প্রস্তুত। নীলচাষ সংক্রান্ত হাঙ্গামা শুধু বঙ্গদেশ বা ভারতে নয়, ইংলণ্ডেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। লণ্ডনের 'টাইমস'[৬৮] ও 'ইকনমিস্ট'[৬৯] পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি হয় এবং ১৮৬০ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এ নিয়ে 'হাউস অব কমন্স'-এ বিতর্কও হয়।[৭০]"

বাংলায় এই নীলচাষ উনিশ শতক পর্যন্ত চলে। ইউরোপে কৃত্রিম নীলের আবিষ্কার হওয়ার পরপরই এর চাহিদা কমে যায়। ভারত থেকে নীলের রপ্তানীও ক্রমাগত কমতে থাকে। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের পর নীলচাষ একরকম বন্ধই হয়ে যায়।[৭১]

মশাররফ তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে এক নীলকর সাহেবের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই সাহেবটি একজন ঐতিহাসিক চরিত্র।[৭২] একদিকে মশাররফ বিদেশী নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে ব্রিটিশ গভর্নরের ন্যায়বিচার ও সাধুতার প্রশংসাও করেছেন। যদিও ঘটনার বিবরণে সামান্য ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সিরাজগঞ্জে গভর্নর স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট গিয়েছিলেন নতুন রেল লাইনের উদ্বোধন করতে। যাহোক এই গ্রাণ্টের শাসনকালেই 'নীল কমিশন' গঠিত হয় এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার তারপরই ক্রমশঃ লোপ পায়।

(চ) হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব

বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হিন্দু এবং মুসলমান বহু শতাব্দী যাবৎ পাশাপাশি বসবাস করছে। সুতরাং এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এবং জীবনাচরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক সমাজের প্রভাব অন্য সমাজের উপর পরিলক্ষিত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলা যেতে পারে। যে সমস্ত এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সে-সব এলাকায় মুসলমানেরা হিন্দুদের ন্যায় পোশাক পরিধান করতো। নদীয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানেরা ধুতি পরতো।[৭৩] হিন্দুদের মত মুসলমানেরা মাথায় টুপী পরতো না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানে তেমন কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। অপ্রকাশ্যে হিন্দুরা গো-মাংসও ভক্ষণ করতো। গো-জাতিকে হিন্দুরা দেবতা বলে মানতো, সেজন্য গো-মাংস ভক্ষণ তাদের নিষিদ্ধ ছিল। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে জনৈক ব্রাহ্মণ-শিক্ষকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যিনি গোপনে গো-মাংস পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করেছেন।[৭৪] নামকরণের ব্যাপারেও হিন্দুসমাজের প্রভাব মুসলমান সমাজে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অনেক মুসলমান হিন্দুদের মতই বাংলা বা সংস্কৃত নাম রাখতো। মুসলমানেরা সাধারণতঃ আরবী-ফার্সী নাম রাখতো। মশাররফের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল 'কালী'।[৭৫] হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে সামাজিক রীতিনীতির ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান, সঙ্গীত অনুষ্ঠান, অতিথি আপ্যায়ণ। 'পণ প্রথা'টি যে হিন্দুসমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমান সমাজেও 'বর্ণভেদ প্রথা' চালু ছিল। বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর মধ্যে কোন সম্পর্ক হতো না। তাঁতি, জোলা ও কলুরা শরীফ বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত না। মুসলমান সমাজে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পাঠ প্রচলিত ছিল। আবার মুসলমান জমীদাররা দুর্গা ও সরস্বতী পূজার প্রতিমা-নির্মাণে অর্থসাহায্য করেছেন।[৭৬]

একই গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।[৭৭] উক্ত গ্রন্থে এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলমান জমীদাররাও হিন্দু-কর্মচারী নিয়োগ করতেন। অবশ্য কোন কোন সময় হিন্দু ও মুসলমান দুই

সম্প্রদায় সাক্ষাৎ-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের কোথাও কোথাও শান্তিভঙ্গ করেছে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থে জনৈক হিন্দু-রাজকর্মচারী নামাজের সময় সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। উনিশ শতকে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে।[৭৮] বঙ্গদেশের বাইরে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনও শুরু হয়।

হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবহৃত ভাষায়ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রসঙ্গে। যেমন হিন্দুদের ভাষায় এই সমস্ত শব্দগুলো লক্ষ্যণীয়ঃ পূজা, আশীর্বাদ, ভগবান, উপবাস, উপাসনা। অনুরূপ ক্ষেত্রে মুসলমানেরা এই শব্দগুলির পরিবর্তে নামাজ, দোয়া, আল্লা, রোজা, ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য মশাররফ তাঁর পুস্তকে 'আশীর্বাদ', 'স্নান', 'জল', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মুসলমানের কথ্য ভাষায় এ সমস্ত শব্দ 'দোওয়া' 'গোসল' ও 'পানি' রূপে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) মুসলমান সমাজের গঠন-কাঠামো, দাসত্বপ্রথা, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ ইত্যাদি

সে যুগের মুসলমান সমাজ যে উচ্চ এবং নিম্ন এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল সে কথা সহজেই অনুমেয়। উনিশ শতকের মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুপস্থিত ছিল। মশাররফ নিজেও উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে। সম্ভবতঃ শিক্ষা ও চাকুরীর মারফৎ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উন্নতির ফলেই মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি হয়। অপরদিকে উচ্চশ্রেণীর অনেকে বিত্ত হারিয়ে লেখাপড়া শিখে চাকুরী গ্রহণ করে—এভাবে যে মধ্যবিত্ত সমাজ গঠিত হয় তারাই বিশ শতকে দেশের নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

মশাররফের জ্ঞাতিভ্রাতা নবাব মোহাম্মদ আলী ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সবাই অর্থনৈতিক কারণ বা উত্তরাধিকার সূত্রে উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মশাররফের রচনায়ও এই দুই শ্রেণীর (উচ্চ ও নিম্ন) অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় একদিকে তাঁর পিতা ও অন্য দুইজন জমীদারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এবং অন্যদিকে বলা হয়েছে দরিদ্র কৃষকদের কথা। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে বর্ণিত হয়েছে তিনজন মহিলা-

জমীদারের কাহিনী। উক্ত পুস্তকে উনিশ শতকের শেষ পাদের কথা বলা হয়েছে। ঐ সময়ে উচ্চশ্রেণীর অনেক জমীদারই তাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি হারাচ্ছিল। 'জমীদার দর্পণ' নাটকেও জমীদারের কাহিনী।

মশাররফের রচনা থেকে দাসত্বপ্রথা সম্পর্কেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এই পুরাতন প্রথাটি উনিশ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথাটির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে (৯ এপ্রিল) 'ক্যালক্যাটা গেজেট' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই প্রথা বিলোপের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে Law Commission on Slavery in India গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়নি। এই কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষেই এই প্রথাটি চালু ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় শিশু ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং সময়ে সময়ে শিশুদের অপহরণ ক'রে নিয়ে যাওয়া হতো এবং পরে তাদের বিক্রয় করা হতো। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এটি একটি নিয়মিত ব্যবসায়-স্বরূপ ছিল। ঢাকা জেলায় দাস বিক্রির প্রচলন ছিল।[৭৯] রংপুর জেলায় দাসদাসী গৃহস্থালির কাজের জন্য কেনা-বেচা হতো।[৮০] কমিশনের রিপোর্টে ডাক্তার বুকাননের নিম্নোক্ত মন্তব্য দৃষ্ট হয়:

"গৃহভৃত্য সংগ্রহের অসুবিধার জন্য অনেকে দাসী ক্রয় ক'রে রাখতো।"[৮১]

মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের বাড়ীতে ত্রিশ-বত্রিশ জন দাসী-বাঁদী ছিল। তাঁর মাতামহ রংপুর অঞ্চল থেকে বাঁদী ক্রয় ক'রে তাঁদের গৃহে পাঠাতেন। দুর্ভিক্ষের সময় দারিদ্র্য হেতু অনেক দরিদ্র-পিতা তার কন্যাকে বিক্রয় ক'রে দিতো। এমনকি দরিদ্র-স্বামী স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রয় করতো। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে মশাররফ লিখেছেন যে, ঐ যুগে দাসী বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল না। দাসীরা উপপত্নী হিসাবে গণ্য হতো এবং তাদের গর্ভে সন্তানও হতো। দাসপ্রথা সম্পর্কে যে কমিশন গঠিত হয় তার রিপোর্টে আছে:

> "A Musalman man has by the Mohammedan Law a right to exact the embrace of his unmarried slave of the same religion, but not of his Hindu slave." (পৃঃ ৩১)

উক্ত কমিশনের রিপোর্টে আরও দেখা যায়, দাসীরা যাতে পালিয়ে না যায়

সেজন্য মুসলমান সমাজের অনেকেই এদের 'নিকা' (বিবাহ) ক'রে স্ত্রী হিসাবে ভোগ করতেন।

এই সমস্ত বাঁদী-দাসীদের সন্তান-সন্ততিরা বংশানুক্রমে দাস হিসাবেই থেকে যেতো। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, এই সমস্ত দাসী-সন্তানেরা প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বা গৃহ থেকে পলায়ন ক'রে অন্যত্র চলে গেছে। দাসত্বপ্রথার সম্পর্কে যে আইন-কমিশন গঠিত হয় তাতেও এমন মন্তব্য আছে যে, মুসলমান সমাজে 'গোলাম' নামে যে একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাস।[৮২] বিগত শতকের মুসলমান সমাজের একটি অন্ধকার অধ্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন মীর মশাররফ। অবশ্য হিন্দুসমাজেও যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ল' কমিশনের রিপোর্টে সে সম্পর্কে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'জমীদার দর্পণ' নাটকে মশাররফ এমন কথা লিখেছেন যে, অনেক মুসলিম পরিবার খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের কথা ভাবছেন। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে খ্রীস্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেন। তৎকালীন বাংলার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদনদত্ত খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যেও এমন দু'একজন আছেন, যেমন শেখ জমিরুদ্দীন। অবশ্য পরে তিনি আবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[৮৩] বর্তমান মুহূর্তে এটি বলা অত্যন্ত কঠিন যে, কতজন বাঙ্গালী-মুসলমান সে যুগে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন—তার সংখ্যা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। Calcutta Christian Observer পত্রিকায় এমন মন্তব্য করা হয়েছিল যে, হিন্দুর চাইতে মুসলমানেরা বাইবেলের শিক্ষা-গ্রহণে বেশী বিমুখ।[৮৪] কলিকাতার আর একটি সংবাদপত্র Calcutta Christian Herald-এ দু'টি মুসলমান পরিবারের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছে।[৮৫] আবার অনেক পত্রিকায় মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

[১] 'আমার জীবনী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০২।

[২] বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সরেজমীনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেলের কাছে "*Reprot on the State of Education in Bengal between 1835 and 1836* শীর্ষক রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি সর্বমোট তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন।

[৩] *Report on the State of Education in Bengal* (second part), W. Adam, Calcutta, 1836, p. 18.

[৪] 'আমার জীবনী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৩।

[৫] এ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ১৭।

[৬] 'আমার জীবনী', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৬। মূল পুস্তকে এই সরস্বতী-বন্দনায় কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে। প্রথম চরণের শেষ শব্দ 'সার'-এর স্থলে 'সারে', 'শোভে' স্থলে 'শোভিত', 'বীণা' স্থলে 'বিনা' ছাপা হয়েছিল।

[৭] M. F. Rahman, *The Bengali Muslims and English Education* (an unpublished M. A. Thesis, London University, 1948)—অপ্রকাশিত এম. এ. গবেষণা নিবন্ধ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।

[৮] W. W. Hunter, *The Indian Musalmans* : Are they bound in conscience to rebel against the Queen ? London, 1871.

[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৪।

[১০] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১৬৪।

[১১] "The truth is that one system of public instruction, which has awakened the Hindus from the sleep of centuries, and quickened their inert masses with some of the noble impulses of a nation, is opposed to the traditions, unsuited to the requirement, and hateful to the religion, of the Musalmans."
—*The Indian Musalmans*, পৃঃ ১৭৪।

[১২] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১০২।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৩।

[১৪] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', একাদশ নথি, পৃঃ ১৩৮।

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

[১৬] *Report of Bengal Provincial Committee : Indian Education Commission*, 1882, p. 229.

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৯, ২৭।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬, পঞ্চম অধ্যায়।

[১৯] 'আমার জীবনী', পঃ ১০৪।

[২০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

[২১] 'হাণ্টার', পৃঃ ১৭৮।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

[২৩] *Report of Education Commission : Bengal Provincial Committee*, 1882, p. 214.

[২৪] বাঙ্গলা সরকারের সেক্রেটারী C. Bernard কর্তৃক ভারত সরকারের সেক্রেটারীর কাছে (১৮৭২) লিখিত পত্র থেকে; Selections from the Records of Government of India (The Education of Muhammadan Community, No. CCV, 1886, p. 173).

[২৫] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১০২।

[২৬] প্রাগুক্ত, এ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট, পৃঃ ২৭।

[২৭] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১৮০-১৯০।

[২৮] 'জমীদার দর্পণ', প্রস্তাবনা।

[২৯] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', তৃতীয় নথি, পৃঃ ৩৩।

[৩০] 'আমার জীবনী', অসমাপ্ত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র অংশঃ "হাতে এক পয়সা নাই কথার মাত্রা পাঁচ টাকার। মুসলমান সমাজের প্রায় আধা-আধি এইরূপ যার-ফটকা বাবুগিরি, বড় মানুষীর ভড়ং, সাজ-গোজ পরণ-পরিচ্ছদ, বড় বড় কথা।" পৃঃ ১৪২-২৪১।

[৩১] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', চতুর্দশ নথি, পৃঃ ২২৮-২৪১।

[৩২] 'আমার জীবনী', পৃঃ ৭৬-৮১।

[৩৩] 'আমার জীবনী', পৃঃ ৯৮; এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৩৪] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', পৃঃ ৪৫।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪-১০৫। "স্বামী দেবতা, স্বামী অন্নদাতা, স্বামী বিধাতা, স্বামী ত্রাণকর্তা, স্বামীই বুদ্ধি, স্বামীই বল, স্বামীপদ সেবা করাই কুলস্ত্রীর প্রধান ধর্ম।"

[৩৬] 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী', সপ্তদশ নথি, পৃঃ ২৮৬-২৮৮।

[৩৭] প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্যঃ দ্বাদশ নথি।

[৩৮] 'বিষাদ সিন্ধু', প্রথম খণ্ড, মহরম পর্ব, তৃতীয় প্রবাহ।

[৩৯] মশাররফের মতে 'এদ্দত' বা অপেক্ষাকাল হলো ৪ মাস ১০ দিন। 'হেদায়া' অনুযায়ী তিন মাস। (*Hedaya : A Commentary on the Musalman Law*, Hamilton, London, 1870, p. 128).

[৪০] "More than 500 women were allowed to immolate themselves every year between 1814 and 26, while the British Government patronised the show." W. H. Carey, "*The Good Old Days of Hon'ble John Company*, Vol. II, Simla, 1882, p. 195.

[৪১] "Reports on the Suttees performed in the Lower and Upper province in the year 1821, 22, p. 126. (ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য হস্তলিখিত বিবরণ)। দ্রষ্টব্যঃ Hindu manners, customs, and ceremonies", by A. J. A. Dubois. ইংরেজী অনুবাদ H. K. Beau Champ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৯৭, পৃঃ ৩৫৯-৭০।

[৪২] কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯০৬, পৃঃ ১৯১।

[৪৩] সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৫৯।

[৪৪] *Report of the Indigo Commission*, Calcutta, 1860, paras 20-21, p. 7.

[৪৫] R. C. Majumdar, *British Paramounty and Indian Renaissance*, pt. I, p. 914.

[৪৬] C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant-Governors*, Appendix, Grant's minute, para 2.

[৪৭] পত্তনি—কোন জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়মিত খাজনা দিয়ে বংশানু-

ক্রমে ভোগ-দখল বা হস্তান্তর করার নাম পত্তনি।

[৪৮] C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Grant's minute, para 9.

[৪৯] *Report of the Indigo Commission*, Appendix 21.

[৫০] C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, Calcutta, 1901, pp. 185-194.

[৫১] *The Hindoo Patriot*, Calcutta, July 5, 1860.

[৫২] *The Hindoo Patriot*, August 22, 1860.

[৫৩] প্রাগুক্ত, September 3, 1860.

[৫৪] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', পৃঃ ১৯৮, উদ্ধৃত।

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।

[৫৬] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', কলিকাতা, ১৮৫০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৫-২০।

[৫৭] টেকচাঁদ ঠাকুর, 'আলালের ঘরের দুলাল', প্রথম সংস্করণ, ১৮৫৭, পৃঃ ১৪১।

[৫৮] প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন দত্ত এই অনুবাদ করেন।

[৫৯] *C.* E. Buckland, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬।

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

[৬১] Private Letters ; From Canning to Wood, October 30, 1860. (ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত)।

[৬২] *Report of the Indigo Commission*, para 119.

[৬৩] প্রাগুক্ত, paras 3571-3671 ; R. C. Majumdar সম্পাদিত *The British Paramountcy and Indian Renaissance*, p. 923.

[৬৪] *Indigo Commission Report*, para 1628.

[৬৫] প্রাগুক্ত, para 3595.

[৬৬] প্রাগুক্ত, para 3596.

[৬৭] প্রাগুক্ত, para 3918.

[৬৮] *The Times*, London, April 11-21, May 7, July 9, August 4, 1860.

৬৯ *The Economist*, London, April 21, 1860, vol. XVIII, পৃঃ ৪১৮-৪২০।

৭০ পার্লামেণ্টে লর্ড ক্লানরিকার্ডের বক্তৃতা, মে ১৫, ১৮৬০। দ্রষ্টব্য : Hansard's Parliamentary Debate, vol. 158, Col. 1265. পার্লামেণ্টে লেয়ার্ডের প্রশ্ন, এপ্রিল ১২, ১৮৬১। দ্রঃ Hansard, vol. 162, Col. 507.

৭১ প্রমোদ সেনগুপ্ত, 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ', পৃঃ ১৩৬।

৭২ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র আলোচনা, পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৭৩ 'আমার জীবনী', পৃঃ ২৮৬।

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৭।

৭৫ 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ৪৪, ৪৫, ৫২। 'আমার জীবনী' থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য : "হিন্দুপ্রধান দেশ। ধুতি পড়িতে শিখিলাম। চাদর বা উড়নী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাশনেবল করিলাম। হায় হায়, বাউরী চুল কাটিয়া থাক থাক করিলাম। ... ... টুপিটাও ক'দিন পরে সহপাঠিরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। ... ... পরণ-পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী চাল। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা শামসুদ্দীন শতীশ ... ... নামাজ রোজা ভুল।" পৃঃ ২৮৬-২৮৭।

৭৬ 'আমার জীবনী', পৃঃ ৯৫।

৭৭ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', পৃঃ ১৫৬-১৬৩।

৭৮ *The Hindoo Patriot*, Calcutta, September 17, 1884, p. 148. *The Moslem Chronicle*, Calcutta, April 9, 1875. দ্রষ্টব্য : কাজী আবদুল ওদুদ, 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ', কলিকাতা, ১৯৩৬।

৭৯ *Adam's Report on Education*, p. 82.

৮০ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

৮১ *Law Commission on Slavery*, p. 43.

৮২ "In some of the Musalman communities there exists a class of people denominated 'Gholams' the signification of which word seems to denote that the class so designated is in a state of slavery." *Law Commission on Slavery*, p. 40.

৮৩ শেখ জমীরুদ্দিন, 'মেহের চরিত', কোলকাতা, ১৯০৯।

৮৪ *The Calcutta Christian Observer*, June, 1842, vol. XI, p. 373. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৩ সালের M. M. Ali কর্তৃক লিখিত Ph. D. Thesis, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, 1833-57, পৃঃ ৩৩৪-এ উদ্ধৃত।

৮৫ *The Calcutta Christian Herald*, Calcutta, October 8, 1844.

অষ্টম অধ্যায়

মশাররফ-মানস সমীক্ষা

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মীর মশাররফ হোসেনের ধারণার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনাই এ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ তাঁর রচনায় উনিশ শতকীয় যুগমানস কিভাবে বিধৃত হয়েছে তারও খতিয়ান নেওয়া যেতে পারে। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় মশাররফ-মানস সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা-ও এক্ষণে বিচার্য বিষয়।

মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম এমন এক সময়ে, যখন তৎকালীন ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে গেছে এবং একদা শাসক-জাতি মুসলমানদের হাত থেকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা একে একে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মীর মশাররফের পৈত্রিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। একদা তাঁর পিতা-পিতামহের জমিদারী ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর পূর্বপুরুষের সব সম্পদ, সম্পত্তি লোপ পেতে থাকে। অবশ্য এর নানাবিধ কারণও বিদ্যমান ছিল। একটি প্রধান কারণ পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ আর অন্যদিকে ছিল সামাজিক কারণ। যখন ক্রমে ক্রমে কৃষকেরা জমিদারদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, জমিদারী রক্ষা করা তখন কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে 'নীলবিদ্রোহে'র কথা উল্লেখ করা যায়।[১]

মশাররফের পিতা জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতন ও দুঃখ-দুর্দৈবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মশাররফের পিতা জমিদার ছিলেন; পরে পারিবারিক ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে তিনি একেবারে সহায়-সম্বলহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে মশাররফের পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কেননা তাঁর প্রথমা স্ত্রী কিছুদিন পূর্বেই মারা গেছেন। এই বিবাহের ফলে তিনি আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। বৈবাহিক সূত্রে তিনি বেশ কিছু সম্পত্তি, জায়গা-জমি লাভ করেন। জীবনে যখন আবার কিছুটা প্রাচুর্য দেখা গেল তখনই মশাররফের পিতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক বিলাসিতা ও মনোভাব আবার প্রবল হয়ে উঠতে থাকলো।

মশাররফ তাঁর পিতার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। সুতরাং মশাররফ বাল্যকালে পিতাকে প্রাচুর্যের মধ্যে, বিলাসিতার মধ্যে বসবাস করতে দেখেছেন। সুতরাং পিতার জীবনযাত্রা পুত্রের চরিত্রগঠনকে প্রভাবান্বিত করেছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ এবং শৈশবসংসর্গ ও শিক্ষা এই সবকিছু মিলিয়ে মশাররফ এক বিচিত্র মানুষে তৈরী হলো। একদিকে প্রাচীন জমিদারের সন্তান আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত মানসিকতার অধিকারী হলেন মশাররফ। মশাররফের পিতা উনিশ শতকীয় ঐশ্বর্যশালী একজন জমিদারের মতই বিলাসী ছিলেন এবং নারী-সংসর্গে সময় অতিবাহিত করেছেন। মশাররফের পিতা মশাররফকে আর এক জমিদার-নবাবের (মশাররফের পিতার ভ্রাতুষ্পুত্র) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন মশাররফ কিশোর বালক মাত্র। এই কিশোর বয়সেই নবাবের রক্ষিতা-নারীর সঙ্গে মশাররফ পরিচিত হন। মশাররফ তাঁর আত্মীয় নবাবের বাড়ীর কাছেই অবস্থান করতেন। মশাররফ গিয়েছিলেন সেখানে পড়াশুনা করতে। নবাবের প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই ভর্তি হয়েছিলেন মশাররফ। কিন্তু তাঁর পড়াশুনার কোন অগ্রগতিই হচ্ছিল না। সঙ্গীত এবং নারীসংসর্গের প্রতিই মশাররফের অধিক আসক্তি ও আগ্রহ দেখা গেল। অবশ্য এর জন্য নবাবকেও অংশতঃ দায়ী করা চলে। একটি অল্পবয়স্ক কিশোরকে পেশাদার নারীর সঙ্গলাভে উৎসাহিত করা নবাবের উচিত হয়নি এ কথা বলা চলে। আবার শুধু নবাবকেও দোষ দেওয়া যায় না। কেননা এটি বংশানুক্রমিকও হতে পারে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রেও মশাররফের নারী-আসক্তি প্রবল ছিল এমন বলা যায়। কেননা আমরা জানি, মশাররফের পিতারও একজন রক্ষিতা ছিল। তাঁরও অধিকাংশ সময় নৃত্য ও সঙ্গীতে ব্যয় হতো। বাল্যে মশাররফ দু' দু'বার বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। মশাররফের পিতা যখন বাড়ী ছিলেন না, তখন তিনি নানা কাজে সময় অপব্যয় করতেন এবং অতি অল্পবয়সেই গৃহের পরিচারিকাদের মারফত যৌন-অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ কথা তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে[৩] অকপটে স্বীকার করেছেন এবং এ জন্য মশাররফ তাঁর পারিবারিক পরিবেশকেই দায়ী করেছেন।

মশাররফের বয়স যখন বিশ বছরও হয়নি, তখনই তিনি গোপনে বাড়ী থেকে অনেক দূরে যশোরে বিয়ে করে বসেন—যদিও তিনি তাঁর মনোনীতা মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারেননি। এদিকে চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই তাঁর

মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের প্রতি মশাররফের পিতা বীতরাগ হয়ে পড়েন। ছেলেমেয়েদের ভার তাঁর শাশুড়ীর উপর দিয়ে তিনি গান-বাজনা নিয়েই মশগুল থাকতেন। মশাররফ-জননীর প্রতি মশাররফের পিতার অবহেলা মশাররফকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। পিতার উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন মশাররফকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ক'রে তোলে। হয়তো এই মানসিকতা থেকেই মশাররফও অতি অল্পবয়সেই প্রচলিত নীতিবোধকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে ভোগ-বিলাসের পথে অগ্রসর হলেন। মশাররফ-জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ হচ্ছে এভাবেই—১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম বিবাহের মধ্য দিয়ে।

মীর মশাররফ তাঁর প্রথম এবং দ্বিতীয় বিবাহের মধ্যবর্তী সময়ের কোন বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ করেননি। এ সময়টিকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় বলে অভিহিত করা যায়। পঞ্জিকা অনুযায়ী এ সময়টি হচ্ছে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বিবাহ করতে যেয়ে তিনি প্রবঞ্চিত[৪] হন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি এর ফলে হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর রচিত 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে দেখা যায় তিনি মদ্যপান এবং নানাবিধ কুসংসর্গে দিন অতিবাহিত করেন।[৫] প্রথম বিবাহের পর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁর আট বৎসর অতিবাহিত হয় এবং দৈবক্রমে একদা একটি সুন্দরী বালিকার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পরে তাকে গৃহে আনয়ন করেন এবং তার সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হন। সম্ভবতঃ এই সময় মশাররফের পিতা মৃত এবং তাঁদের পারিবারিক 'পীর'-এর নির্দেশ অনুসারে ইসলামী বিধি অনুযায়ী উক্ত বালিকাটিকে বিবাহ করেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এই সময়ও তাঁর সেই হতাশা-বোধ এবং অবসন্ন-ভাব তিরোহিত হয় নাই। তাঁর নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্য-দোষ বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এমনকি তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের এগার বৎসর পরেও যখন জনৈকা ইঙ্গবঙ্গ বারবনিতার গর্ভে তাঁর অবৈধ সন্তানের জন্মের কাহিনী সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন[৬] তখন তাঁকে বিকৃত রুচিগ্রস্ত ছাড়া কি বলা যায়? তবে এ কথাটি অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, মশাররফ তাঁর জীবনের অনেক পদস্খলনই অকপটে স্বীকার করেছেন। অবশ্য এ সমস্ত স্বীকারোক্তি তাঁর জীবনের শেষ দু'তিন বছরের মধ্যে করেন। মশাররফের এই সমস্ত পদস্খলন বা নৈতিক শৈথিল্যকে শুধুমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার

সমষ্টি মনে করলে ভুল হবে। কেননা মশাররফের জীবন-পরিবেশ, তৎকালীন যুগপ্রভাব সব কিছুরই বিচিত্র যোগফল তিনি।

তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় দ্বিতীয় বিবাহের পর এবং শেষ হচ্ছে দেলদুয়ার জমিদারীতে চাকরী নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে।

পরবর্তী রচনার কোথাও মশাররফের প্রথমা স্ত্রীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, মশাররফের প্রথমা স্ত্রী বিনা অপরাধে তার স্বামীর কোন স্নেহ-ভালবাসা কিছুই পাননি। মশাররফ যে তার প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গতঃ, মশাররফ 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দ্বিতীয় বিবাহের পর তাঁর প্রথমা স্ত্রী মশাররফ ও কুলসুমের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন। এ সমস্ত কারণেই মশাররফ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি।

মশাররফের জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত সময়ে, তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সুখী বলে মনে হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর এগারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই সময়েই মীর মশাররফ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি[৭] রচনা করেন। তাঁর জীবনের এই পর্ব শেষ হয় দেলদুয়াবের জমিদারের চাকুরী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই। মনে হয়, কোন কারণে তিনি তাঁর মনিবের বিরাগভাজন হয়ে চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং চাকুরীস্থলও পরিত্যাগ করেন।

মশাররফের জীবনের পরবর্তী কয়েকটি বৎসর তিমিরাচ্ছন্ন। এ সময়ের তাঁর জীবনের বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না। সম্ভবতঃত ৎকালীন অভিজাত-মহল এবং গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচলিত নীতি-আদর্শের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে এবং সে কারণেই হয়তো তিনি তাঁর গ্রামের নিভৃত নিলয়ে নিঃসঙ্গজীবন যাপন করেন। এই পর্বের স্থিতিকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। একে আমরা তাঁর জীবনের পঞ্চম পর্যায় বলে অভিহিত করতে পারি। এই পর্যায়ের অবসান ঘটবে ফরিদপুর পদমদীর নবাব এস্টেটে চাকরী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর জীবনের এই পঞ্চম পর্যায়ের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে তিনি বেশ কয়খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে মাত্র একখানি গদ্য-গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। অবশ্য তাঁর অধিকাংশ পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উপাদান সংগ্রহ করেন ইসলামের ইতিহাস থেকে।

মশাররফ জীবনের শেষ বা অন্তিম পর্যায় পদমদীতে অতিবাহিত হয় এবং সম্ভবতঃ পদমদীতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিম পর্যায়ে মশাররফের প্রধান কাজ হলো স্মৃতি রোমন্থন এবং তাঁর আত্মজীবনী দ্বাদশ খণ্ডে 'আমার জীবনী' রচনা এবং স্ত্রী জীবনী 'বিবি কুলসুম'ও এই সময়ে রচিত হয়। এটিও এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। হয়তো তিনি বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে ব্যর্থ হচ্ছিলেন অথবা তাঁর সম্মুখে উজ্জ্বল রঙ্গীন ভবিষ্যতের কোন সম্ভবনাও আর দেখা যাচ্ছিল না।

মশাররফ-মানস বিশ্লেষণে—মশাররফ জীবনপরিক্রমার সংবাদ নেওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেজন্যই উপরের আলোচনায় মশাররফ-জীবনের পর্যায় ভাগ ক'রে তাঁর মানস-গঠনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হলো।

তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে মশাররফের কী পরিমাণ যোগাযোগ ছিল তা-ও তাঁর রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যায়। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম কিংবা অষ্টম দশকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা বা আন্দোলন শুরু হয় বলা যায়। সেকালে সাধারণতঃ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অথবা ধনী ব্যক্তিদের সন্তানেরাই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকতেন। মীর মশাররফ হোসেনের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অধিকন্তু সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তিনি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি একজন স্বদেশবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছেন। দেশ স্বাধীনতা অর্জন করুক এই কামনা তিনি বহুভাবে করেছেন; যদিও তা কোথাও অস্পষ্ট কোথাও বা স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে মশাররফের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তৎকালীন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সাজুয্য লক্ষণীয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য স্পষ্ট দাবী অবশ্য বিংশ শতাব্দীর পূর্বে শ্রুত হয় নাই। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই ভারতবর্ষীয়রা ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে ও দলগতভাবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দরবার করছিল আইনতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক কিছু ক্ষমতা এদেশবাসীর কাছে হস্তান্তরের জন্য। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসও এই শতাব্দীর ক্রান্তিকালেই আবির্ভূত হয়।

'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন :

"স্বাধীনতা কি মধুমাখা কথা। স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়। স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান। স্বাধীনভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরা পর্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে—না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়।"[৮]

এই গ্রন্থের অন্যত্র আছে :

"স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে মহামূল্য রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।"[৯]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে মিসেস কেনীর মনোভাব ব্যক্ত করতে যেয়ে লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য :

"হোম যে কি জিনিস; 'হোম' কথাটি যে কত মিষ্ট তাহা বিলাতি অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোমকে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানি না। এই 'হোমে'ই যে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝড় জঙ্গল, জলে ডোবা, সেঁতসেঁতে, কুঁড়েঘর-শোভিত হোমই যে পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী তাহাই বা কয়জনে মনে করি।"[১০]

'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে মশাররফ এই উক্তি করেন যে, তাঁর স্ত্রী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।"[১১]

এই উক্তিগুলি যে মশাররফের স্ত্রীর মনের কথা তা নয়, মশাররফের মনের কথাই বটে। উপরোক্ত মন্তব্যগুলো থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মশাররফ একজন স্বদেশবৎসল ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি দেশের স্বাধীনতা প্রতিক্ষণই কামনা করতেন। তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি কোন রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এর কারণটি অর্থনৈতিক। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে মশাররফ এই মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর স্ত্রী 'স্বদেশী আন্দোলনে'র প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন :

"স্বদেশী আন্দোলনে বিবি কুলসুম অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। আন্দোলনকারীদিগের দুই-তিনজন ব্যতীত সকলের ঘরের সন্ধান করিয়া বলিতেন যে, ইহাদের এরূপ ঝকমারী কেন? ...... যাহাদের ঘরে তণ্ডুল নাই তাহাদের আবার সভা-সমিতি কি? ...... যাহার তণ্ডুলের ভাবনা নাই তিনিই ঐ সকল দেশ-হিতকর সভায় যাইতে পারেন। দু'বেলা উপোসের হাঁড়ি মাথায় বহিয়া, পেট পোড়াইয়া দেশের উন্নতি, দেশের হিতসাধন, সভায় যাইয়া কৃত্রিমভাবে যোগ দেওয়া ঠিক নহে। আমি সভা-সমিতিতে যোগ দিবার উপযুক্তই নই।"[১২]

সম্প্রতি কোন কোন সমালোচক এমন উক্তি করেছেন যে, মশাররফ তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না[১৩] এবং তাঁর এই ঔদাসীন্যকে সমালোচকেরা ভাল চোখে দেখেননি। উপরন্তু, সে যুগের বিখ্যাত 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র সঙ্গে পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন না। সমালোচকের এ ধরনের বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান নবাব ও জমিদারদের দ্বারা এবং এর প্রায় সমস্ত সদস্যই ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় অর্থবান ব্যক্তিগণ। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা চলে যে, মশাররফ সমাজের অভিজাতমহলের একজন ছিলেন না বলেই উক্ত 'সোসাইটি'তে সদস্যরূপে গৃহীত হননি।

মশাররফ যে সমাজের যথেষ্ট কল্যাণকামী ছিলেন সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি তাঁর রচনায় ঘোষণা করেছেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি বলেন যে, সমাজের দুর্দশা ও অধঃপতন দেখে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাকান্ত।[১৪] উক্ত পুস্তকের অসমাপ্ত অংশে তিনি লিখেন :

"কে বলে গাজী মিয়াঁ লোকের নিন্দা করেছে? নিন্দা তো নয়, প্রাণ হ'তে ভালবেসে সকলকে মানবকুলকে সাবধান করেছে। খাঁটি চিত্র এঁকে মানবসমাজের চক্ষের উপর ধরে দিয়েছে।"[১৫]

ইংরেজ সরকারের প্রতি মশাররফের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের এক আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে ও উপন্যাসে স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আবার অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে তিনি ইংরেজের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমের মতই মশাররফও একদিকে দেশের স্বাধীনতা, অন্যদিকে ইংরেজের সুশাসন ও মহানুভবতা—এ উভয়সংকটে পড়েছেন। এই মানস-সংকটের হেতু খুব স্পষ্ট নয়—কেননা, মশাররফ ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন না। বঙ্কিমের মনোভাব সম্পর্কে ইংরেজ অধ্যাপক ক্লার্কের কয়েকটি সুচিন্তিত অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমের ইংরেজপ্রীতি এ রমক ছিল বলা যায়:

(১) বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজন। এর দ্বারা ভারতের উপকারই হবে।

(২) বৃটিশ রাজ বন্ধুভাবাপন্ন। এর সাহায্যে ভারতের উন্নতি হবে।

(৩) হিন্দুর সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন এ দেশে থাকবে।[১৬]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে মশাররফ ইংরেজকে, তার শাসনকে বহুভবার বহুভাবে প্রশংসা করেছেন। এবং এই গ্রন্থের এক চরিত্রকে (লেখকের ছদ্মবেশ) জনৈক ব্রিটিশ কর্মচারী প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন।[১৭] গাজী মিয়াঁর ছদ্মনামে লেখক মশাররফ লিখছেন:

"ইংরেজ আমাদের ভক্তির ভাজন। ইংরেজ আমাদের মাথার মণি। এই ইংরেজ আমাদের হর্তা-কর্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা; অসীম ক্ষমতা। ··· ··· ইংরাজ-চক্ষে অবিচার-অত্যাচার স্থান পায় না। ··· ··· তাই ইংরেজকে হৃদয়ের সহিত নমস্কার। ইংরাজ রাজ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করুন, জগৎ শাসন করুন, সমগ্র ধরার আধিপত্য লাভ করুন, কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি।"[১৮]

এ প্রসঙ্গে আমরা মশাররফের পিতার মনোভাবের উল্লেখ করতে পারি। মশাররফ বারবার তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, তাঁর পিতা ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন।[১৯] কোন ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মশাররফের পিতা মন্তব্য করেন: "নীলকাজ বন্ধ হতে পারে, কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এদেশে থাকিবে।"[২০] সম্ভবতঃ পিতার কাছ থেকে মশাররফ ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করেন। জনৈক ইংরেজ-নীলকর কুঠিয়ালের সঙ্গে যে মশাররফের পিতার

বন্ধুত্ব ছিল তা-ও আমরা জানি।[২১] নীলকর সাহেবদের প্রতি মশাররফ যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তা-ও সত্য। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে ইংরেজ কুঠিয়াল কর্তৃক বাঙ্গালী মহিলা অপহরণের এক দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[২২] উপসংহারে তিনি নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন ঃ

> "এই প্রকার কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য এই বাংলা মুলুকে স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে তাহা গণনা করিয়া প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই।"[২৩]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে তিনি কেনী নামক জনৈক ইংরেজ নীলকর কুঠিয়ালের অপকীর্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে উক্ত কেনী সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল, তথাপি সাহেবের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাঠককে জানিয়েছেন। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তিনি বিদেশী নীলকর কুঠিয়ালদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

বৃটিশ শাসন এবং কর্মচারীদের মশাররফ ন্যায় এবং সৎ বলে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় তিনি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লেখ করেছেন—যিনি অন্যায়ভাবে ইংরেজ কুঠিয়ালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।[২৪] অন্যত্র 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তিনি আর এক অসৎ ইংরেজ ডাক্তারের চিত্র অঙ্কন করেছেন।[২৫]

এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মশাররফ এক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন।[২৬] মশাররফের বিভিন্ন রচনা থেকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় আমরা দেখি বিদেশী নীলকর কর্তৃক অত্যাচারিত এ দেশীয় কৃষকদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে, মশাররফের এক আত্মীয় শাহ গোলাম[২৭] কৃষকদের সঙ্গে নীলচাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সত্ত্বেও তার প্রতি কোন সমর্থন ছিল না। তার কারণ অন্যত্র, সেটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক। একদা শাহ গোলাম মশাররফের পিতাকে তার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে উৎখাত করেছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে, মশাররফ 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রকেও ইংরেজ-বিদ্বেষের জন্য অভিযুক্ত করেছেন। মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে এমন কথা বলেছেন যে, দীনবন্ধু মিত্র জানেন না যে, ইংরেজের মধ্যেও এমন মহৎ ব্যক্তি আছেন যাঁরা চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল।[২৮]

কুসংস্কার এবং মধ্যযুগীয়তা এই দুইয়ের প্রতি যে মশাররফ বিরূপ ছিলেন তা তাঁর 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় ঃ

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান। সমাজের ব্যর্থতা দূর কর। কুসংস্কার-তিমির সদ্‌জ্ঞান জ্যোতি প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। ... ... বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ কিছুই নয়, পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে; মহাপাপের কার্যই করিয়াছি।"[১১]

কিন্তু এই পুস্তকে তিনি কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। যেমন, হোসেনের খণ্ডিত মস্তকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মশাররফের উক্তি:

"কি আশ্চর্য। সেই মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকৌশলীর লীলা অবক্তব্য। পাত্রস্থ শির ক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল ... ... ঐশ্বরিক ঘটনায় ধার্মিকের আনন্দ— পাপীর ভয়, মনে অস্থিরতা।"[৩০]

মশাররফ তাঁর আত্মজীবনীতে পরিষ্কার বলেছেন যে, প্রথম জীবনে তিনি তন্ত্র-মন্ত্রের ভক্ত ছিলেন।[৩১] এমনকি তিনি তাঁর প্রেমিকা—যাকে তিনি বিবাহে ব্যর্থ হন, তার অসুস্থতা বা বিকারগ্রস্ত হওয়ার পর মন্ত্রের সাহায্যে তিনি নিজে তাকে সুস্থ করার প্রয়াস পান।

গৌরীনদীর পানির ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন: "গৌরীনদীর জল পান স্নান করিয়া অনেক কঠিন কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।"[৩২]

জমীদারদের সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় বা দ্বিধা ছিল। যদিও তিনি নিজে জমীদার বংশসম্ভূত ছিলেন, তথাপি জমীদারদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাল ছিল না। 'জমীদার দর্পণ' নাটকে যে জমীদারের বর্ণনা আছে, সে একজন অসৎ, পাষণ্ড এবং লম্পট। কিন্তু মজার ব্যাপার এই বইটিই তিনি উৎসর্গ করেছেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা এক জমীদারকে—পরে তিনি নবাব খেতাবও লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটক'টিও উৎসর্গ করেছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফকে এবং 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন তাঁর মনিব জমীদার করিমন্নেসা বেগমকে। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এক অসৎ জমীদার পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন—যারা অন্যায়ভাবে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করেছিল এবং নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল।[৩৩] যাহোক, এটা ঠিক যে, তিনি তথাকথিত ধনী সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন; তথাপি তিনি অবচেতন মনে ধনীদের কৃপাদৃষ্টি কামনা করতেন।

মশাররফের রচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত সংস্কৃতির এক প্রতিনিধি। যদিও দেখা যাবে, তিনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আরবী-ফার্সী দিয়ে লেখাপড়া শুরু করেন; তিনি আবার হিন্দু গুরুমশাইয়ের কাছেও বাংলা শিখেন। সেখানে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'সরস্বতী বন্দনা'ও শিখেন।[৩৪] পরে তিনি কৃষ্ণনগরে যে স্কুলে অধ্যয়ন করেন, সেখানে তিনি হিন্দুদের পোশাক, আচার অনুকরণ করেন।[৩৫] তাঁর প্রথম তিনটি পুস্তক হিন্দুজীবনের চিত্রসম্বলিত।[৩৬] প্রথম জীবনে তিনি তাঁর নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার করতেন। তিনি কোরআন পাঠ করতেন, আবার রামায়ণ-মহাভারতও পড়তেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' এবং 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র-সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শেষ জীবনে অবশ্য ইসলামের ইতিহাস বা বিষয় নিয়ে তিনি অনেক কয়টি গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলাদেশের অন্যান্য সম্প্রদারের, বিশেষ ক'রে হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি মশাররফ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করুক, এটি তিনি সব সময়ই চাইতেন। এমনকি তিনি গো-হত্যা বিরোধীও ছিলেন; যাতে ক'রে এই সমস্যাটি নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন সংঘর্ষ না হয়।[৩৭] যারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের উস্কানি দেয় তাদেরও তিনি সমালোচনা করেছেন। এ বিষয় নিয়ে তিনি একখানি প্রহসন[৩৮] রচনা করেন।

হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন মশাররফ। কিন্তু হিন্দু-সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেন:

> "এ বিষয় চতুর বলি হিন্দু। কার্য-উদ্ধারে ভারি মজবুত। ভারি পাকা। সত্য-মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী, তোষামোদ, ... যেন-তেন প্রকারেণ কার্য-উদ্ধার ক'রে কিছু লাভ করবেই করবে।"[৩৯]

এই একই পুস্তক 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে তিনি মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের উপর আক্রমণ করায় মুসলমানদেরও নিন্দা করেছেন। এটা যেন আপাত-বিরোধী বলে মনে হয় যে, তিনি জনৈকা জমিদারের হিন্দু-কর্মচারীদের সমালোচনা করেছেন। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি হিন্দুদের দেবতা 'কৃষ্ণে'র প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে মশাররফ হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর

যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় তাতে তিনি যে জমিদারের অধীনে চাকুরী করতেন সেখানকার সমস্ত হিন্দু-কর্মচারীদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে অনুরূপ আরো বহু অসঙ্গতির উদাহরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর নামের বানান বিভিন্ন রকমে লিখেছেন। 'রত্নবতী'তে তাঁর নাম এভাবে মুদ্রিত হয়েছেঃ 'শ্রী মীর মসাঃরফ হোসেন'। পরবর্তী পুস্তকে তিনি লিখেছেনঃ 'শ্রী মীর মসাঃরফ হুসেন'। 'বসন্তকুমারী নাটকে' লিখেছেন 'শ্রী মীর মশাররফ হোসেন'। এখানে সর্বপ্রথম মশাররফ তাঁর নামে তালব্য 'শ' ব্যবহার করলেন এবং 'র'ও দু'বার লিখেছেন। 'জমীদার দর্পণ' নাটকেও এই বানান আছে, কিন্তু 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে মশাররফ 'শ্রী' বর্জিত হলেন। পরবর্তী একটি গ্রন্থে তিনি 'মশাররফ' না লিখে 'মোশাররফ' লিখেন। এখানে আবার 'শ্রী' আছে। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন 'মীর মশাররাফ হোসেন'; কিন্তু তাঁর সর্বশেষ পুস্তকে তিনি আবার 'শ্রী' ব্যবহার করেছেন। যদি তিনি একটু সতর্ক হতেন তা হলে এই সমস্ত অসঙ্গতি পরিহার করতে পারতেন।

মশাররফ বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি ঐ যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে ছিলেন। যাহোক, একটি ধর্মসভায় যেখানে ইসলাম-বিষয়ক বক্তৃতা হচ্ছিল সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর রচিত 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থ থেকে আবৃত্তিও করেছিলেন।[৪০] ইসলামের ঐতিহ্য ও অতীত গৌরব-গাথার প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ তাঁর কয়েকটি পুস্তকের উল্লেখ করা যায়। যেমন, 'মোস্লেম বীরত্ব', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'এসলামের জয়', 'খোতবা' এবং এই ধরনের আরও ক'খানা পুস্তক।

মুসলিম সমাজে যে পেশাদারী মোল্লা-শ্রেণী আছে তাদের প্রতি মশাররফ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। মানিক পীরের দরগায় যে মোল্লা শিরণী দিত তাকে 'জমীদার দর্পণ' নাটকে মশাররফ নিন্দা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আবার অনেক প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করেছেন। যেমন, তাঁর স্ত্রীর বোরখা ব্যবহার। 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'তে তিনি নরক-যন্ত্রণার যে কাল্পনিক চিত্র দিয়েছেন তা অনেকটা গোঁড়া মুসলমানদের বর্ণিত নরকের বর্ণনারই অনুরূপ। সঙ্গীতের প্রতি মশাররফের মনোভাবও সুস্পষ্ট। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে সঙ্গীত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বস্তু। দেখা যায়, মশাররফের পিতা সঙ্গীতচর্চায়

উৎসাহী ছিলেন।[৪১] পূর্বেও আমরা দেখেছি যে, মশাররফ রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তাঁর স্কন্ধে যে বিরাট পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল, সে কারণে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতে পারেননি। অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর রচিত পুস্তকে অনেক মন্তব্যের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে তিনি বলেন:

> "অর্থ। হায়রে অর্থ। হায়রে পাতকী অর্থ। তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতাপুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ··· ··· এ সকলই তোমার জন্য।"[৪২]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য আছে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র দ্বিতীয় খণ্ডেও তিনি অর্থ সম্পর্কে বলেন, "তুই এত মধুর, তুই এত তিক্ত।"[৪৩]

এমন অনুমান করা বোধ হয় চলে যে, মশাররফ নিয়তিতে বিশ্বাস করতেন। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র নায়িকা বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ করেছে। 'বিষাদ সিন্ধু'র হাসান মৃত্যুকে মেনে নিলেন, কেননা তিনি মনে করলেন যে, এটা বিধাতার অভিপ্রায়। 'বিষাদ সিন্ধু'র উপসংহারে তিনি লিখছেন: "ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ··· ··· ।" 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য আছে।[৪৪]

মশাররফের জীবন-দর্শনকে এক হিসাবে নীতি-উপদেশাত্মক (didactic) বলা চলে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, পুণ্যের শেষ পর্যন্ত জয় হবে, (ব্যতিক্রম হচ্ছে 'জমিদার দর্পণ' নাটক, যেখানে হায়ওয়ান আলীর কোন অনুশোচনা বা শাস্তি হয় নাই) এজিদের পতন, রেবতীর মৃত্যুদণ্ড, কেনী এবং পয়জারন্নেসার চরম পরাজয় ও মৃত্যুই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বীর-যোদ্ধার ভয়ে এজিদ ভূগর্ভস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, পয়জারন্নেসা তার জীবদ্দশায়ই লাঞ্ছিতা হন, চরম অপমান ও ঋণজালে আবদ্ধ হন। মনিবিবি মৃত্যুর পূর্বেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন। মশাররফ বিশ্বাস করতেন যে, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই পূর্ণ হবে এবং কেউ তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না এবং অন্যায়কারীরা এই জগতেই তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করবে।

তথ্য নির্দেশ

[১] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে মীর মশাররফ 'নীলবিদ্রোহ' সম্পর্কে সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর পিতার সম্পত্তি কিভাবে লোপ পাচ্ছে এবং তাঁর পিতার ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাতা কিভাবে চাষীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জমি দখল ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, খাজনা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, তার বিস্তারিত কাহিনী এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

[২] নবাব মোহাম্মদ আলী ফরিদপুরের পদমদী গ্রামের জমিদার ছিলেন। মশাররফের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের এক জ্ঞাতিভ্রাতা নবাব মোহাম্মদ আলী। মশাররফ রচিত 'আমার জীবনী' গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে। দ্রষ্টব্য : এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

[৩] 'আমার জীবনী', সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

[৪] চেতলা (কোলকাতা) নিবাসী নাদের হোসেন নামক জনৈক ভদ্রলোকের প্রথমা কন্যা লতিফুন্নেসাকে মশাররফ বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কোন এক চক্রান্তের ফলে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আজিজুন্নেসার সঙ্গে মশাররফের বিবাহ হয়। এ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৫] 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ৫৫।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩-১১৫।

[৭] 'বিষাদ সিন্ধু', তিন পর্ব এবং 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'।

[৮] 'বিষাদ সিন্ধু' (ত্রয়োদশ সং), উদ্ধার পর্ব, পঞ্চম প্রবাহ, পৃঃ ৩১১।

[৯] প্রাগুক্ত, এজিদবধ পর্ব, প্রথম প্রবাহ, পৃঃ ৫০৭।

[১০] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১ম সংস্করণ), চতুর্দশ তরঙ্গ, পৃঃ ৭১।

[১১] 'বিবি কুলসুম', পৃঃ ৪২।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

[১৩] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা, ১৯৫৬, পৃঃ ৭০-৭১।

[১৪] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', দ্বাদশ নথি : "ঐ দেখুন গাজী মিয়াঁ মনের দুঃখে ও আনন্দে এক প্রকার হর্ষবিষাদে তুলিহস্তে চিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। সমাজের দুঃখ, সমাজের অবনতি দেখিয়া ঐ দেখুন তাহার দক্ষিণ চক্ষে অজস্র জলধারা ঝরিতেছে।"

[১৫] 'আমার জীবনী', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী', দ্বাদশ নথি দ্রষ্টব্য।

[১৬] C. H. Philips (ed), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961 গ্রন্থে T. W. Clark লিখিত প্রবন্ধ "The Role of Bankimchandra in Development of Nationalism", পৃঃ ৪২৯-৪৪৫।

[১৭] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', নবম নথি, পৃঃ ১১০।

[১৮] প্রাগুক্ত, অষ্টম নথি।

[১৯] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১২০। "পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত"।

[২০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

[২১] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের কুঠিয়াল, টি. আই. কেনী।

[২২] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১২৬-১৩৩।

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

[২৪] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', পৃঃ ৫২-৬৭।

[২৫] 'জমীদার দর্পণ', তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। ডাঃ কানিংহাম চরিত্র দ্রষ্টব্য।

[২৬] কাজী আবদুল ওদুদ, 'শাশ্বত বঙ্গ', 'বিষাদ সিন্ধু' প্রবন্ধে প্রথম এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেন। পৃঃ ১২৪।

[২৭] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', সপ্তম তরঙ্গ।

[২৮] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১২২।

[২৯] 'বিষাদ সিন্ধু', উদ্ধার পর্ব, চতুর্থ প্রবাহ, পৃঃ ৩০০ (২০ সং)।

[৩০] 'বিষাদ সিন্ধু', উদ্ধার পর্ব, তৃতীয় প্রবাহ।

[৩১] 'আমার জীবনী', পৃঃ ৩৭৭।

[৩২] 'আমার জীবনী', পৃঃ ৭৬।

[৩৩] 'আমার জীবনী', পৃঃ ২২৬-২২৭।

[৩৪] 'আমার জীবনী', পৃঃ ১০৬।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬।

[৩৬] 'রত্নবতী' (উপাখ্যান), 'গৌরী সেতু' (কবিতা), 'বসন্তকুমারী নাটক'।

[৩৭] 'গো-জীবন' (প্রবন্ধ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, পৃঃ ২১।

[৩৮] 'টালা অভিনয়', দ্রষ্টব্য : কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

মুসলিম সাধনা', পৃঃ ২৩৬।

[৩৯] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', ত্রয়োদশ নথি, পৃঃ ২১৪।

[৪০] শেখ জমিরদ্দিন, মেহের চরিত, পৃঃ ৫৭।

[৪১] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', পৃঃ ৪০, ১৩৭, ১৬৮।

[৪২] 'বিষাদ সিন্ধু', উদ্ধার পর্ব, দ্বিতীয় প্রবাহ, পৃঃ ২৮৩ (অষ্টম সং)।

[৪৩] 'আমার জীবনী', পৃঃ ২৯৮-৯৯।

[৪৪] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', পৃঃ ১৯৩।

নবম অধ্যায়

মশাররফ-সমালোচনার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ধারা

সমকালীন সমালোচনা

মশাররফের জীবদ্দশায় গল্পলেখক বা কবি হিসাবে তাঁর সাহিত্য-কীর্তির কোন পূর্ণ আলোচনা হয়নি। কিন্তু তৎকালীন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রে তাঁর কোন কোন পুস্তকের সমালোচনা প্রায়শঃ প্রকাশিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেসব সমালোচনার একটা হিসেব-নিকেশ করা হলো। পরবর্তীকালের সমালোচনারও উল্লেখ আমরা এখানে করবো।

মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল The Calcutta Review[১] নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকায়। ইংরেজীতে সমালোচনাটি এরূপ ছিল :

> "This is a romantic tale designed to show that knowledge is of greater importance than wealth, but as it is founded on the marvellous and the supernatural, it is not likely to be of much use. The author's argument is to the effect that knowledge is more valuable than wealth, since the former enabled one Sumantan to turn some women into apes, while the latter was ineffectual to produce that wonderful result. But as no knowledge that we know of can turn women into apes, the superiority of knowledge over wealth may be well doubted. But we dare say the writer did not intend either to instruct or to argue, but merely to make his readers laugh. We take it that the author conceald his name under the nom de plume of a Musalman."

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সমালোচক পুস্তকটির গুণাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলছেন না, অধিকন্তু তাঁর সন্দেহ যে, কোন মুসলমান লেখক এটি লেখেননি।

মশাররফের দ্বিতীয় রচনা 'গোরী সেতু' কবিতা-পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'বঙ্গ দর্শনে' এটির সমালোচনা প্রকাশ করেন। সেটি হচ্ছে এই :

"গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক; পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না--কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।"[২]

এখানেও একটি বিষয় পরিষ্কার যে, সমালোচক গ্রন্থ সম্পর্কে বিশেষ কিছু ব্যক্ত করেননি। সমালোচক যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেটি হলো বাঙ্গালী মুসলমানদের বাংলা ভাষার চর্চা করা উচিৎ—ফারসী বা উর্দু নয়।

মশাররফের প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী নাটকে'র কোন সমালোচনা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে তাঁর দ্বিতীয় নাট্য-রচনা 'জমিদার দর্পণ' 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচনাটি এরূপ :

"জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।

জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।

এই দর্পণে জমিদারদের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ তাহার সময় নহে। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী, এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখন ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা জমিদারের কথা বলিতে চাহি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, শেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল; স্থানাভাবে প্রযুক্ত করিতে পারিলাম না। কিন্তু 'সরোজিনী' নাটকের ন্যায় ইহাতেও অনেক পরিহার্য্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।"[৩]

উপরোক্ত সমালোচনায় আমরা দেখি যে, মশাররফের নাট্য-রচনায় দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। সমালোচক কোন একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন, সাহিত্যিক কোন আন্দোলন বা ঘটনা নয়। তবুও সমালোচক নাটকের একটি বিশেষ দৃশ্যের প্রশংসা করেছেন।

মশাররফের অপর রচনা একটি প্রহসন 'এর উপায় কি?' সম্ভবতঃ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্য।[৪] ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকায় এর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়:

"ইহাও আর একখানি প্রহসন। এ দেশের মুসলমান ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতস্পৃহ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেই প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু যদি তাঁহারা যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও কল্পনায় ও ভাষায়

যারপর নাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন—অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করি—এর উপায় কি ?"[৫]

মশাররফের পরবর্তী গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' মহরম পর্ব, তৎকালীন ইংরেজী দৈনিক *The Englishman, The Statesman and Friend of India,* প্রভৃতি সংবাদপত্রে, সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গবাসী', 'ভারতী', 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', 'চারুবার্তা', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি বাংলা সংবাদপত্রে সমালোচিত হয়। The Englishman লিখেন :

"A history of the Moharram in Bengali is a novelty, probably it is a labour of love. Mir Mosharraf Hussain has brought a full account of one of the important phases of his national faith within the reach of Bengali readers. The *Bishad Shindu* is published in a cheap form and is interesting apart from its religious character."[৬]

The Statesman and Friend of India লিখেন :

" 'Bishad Sindhu' or the 'ocean of grief' is the title of the book published in Bengali by the Corinthian Press. The author is Meer Moosharruf Hossein, an Honorary Magistrate. In this work the author has undertaken a write a history of the Muharram, being nothing more than a recital of the tragic event of the massacre of Hussein on the plains of Karbala. The sect of Mahomedans known as Shias still keep up this festival with religious fervour. The main facts are taken from various Persian and Arabic works and the author has endeavoured to give a faithful and detailed account of tragedy. The name of the book has been chosen we presume, to convey an idea of the most intense grief, which is at the same time as 'boundless as the ocean', and which

Mahomedans affect to simulate during the Muharram festival. The work will no doubt prove of much interest to the Mahomedan community."[৭]

সমসাময়িক বাংলা পত্রিকায় যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হলো। 'চারুবার্তা' পত্রিকায় নিম্নোক্ত সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়ঃ

"হিন্দু-মুসলমানে একতা সম্মিলন না হইলে যে এ দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না, অনেক চিন্তাশীল লোকে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভাষার একতাই জাতীয় বন্ধনের মূল। কেহ কেহ আশা করেন, আমাদের বাংলা ভাষা একদিন সমস্ত ভারতের ভাষা হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা যখন বাঙ্গালার দুইটি প্রধান জাতির মধ্যে ভাষার একতা দেখিতে পাই না তখন আর ওরূপ দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে সাহস পাই না। বাঙ্গালার লোকসংখ্যায় দেখা গিয়াছে ঃ এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় তুল্য। এই যে তিন কোটি মুসলমান, বাঙ্গালা দেশই ইহাদের মাতৃভূমি; বাঙ্গালা ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষা। কিন্তু মুসলমানেরা এ কথা স্বীকার করেন না। ইহারা যদিও মাতৃভূমি বলিয়া অন্য কোন দেশের উল্লেখ করিতে পারেন না; কিন্তু পারসী, আরবীই তাহাদের মাতৃভাষা মনে করেন। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানে কদর্য বাঙ্গালায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালি মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে বা বাঙ্গালা চর্চা করিতে একান্ত বিরোধী। তাঁহারা অশুদ্ধ উর্দু ছাড়িয়া ভদ্র বাঙ্গালির ভদ্র বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতে বড়ই অপমান বোধ করেন। ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকারলাভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইতিপূর্বে ইহার প্রণীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। ইনি যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমন লিখিতে পারেন না। একজন মুসলমান বাঙ্গালির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরব ও প্রশংসার কথা নহে।

'বিষাদ সিন্ধু' বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

দুঃখিনী মাতৃভাষা তাঁহার মুসলমান সন্তানের প্রদত্ত বিদেশীয় উপকরণে অথচ স্বদেশীয় ছাঁচে গঠিত এই মনোহর অলঙ্কারখানি অতিযত্নে অঙ্গে ধারণ করিবেন। মীর মশাররফ হোসেনের লিপিশক্তি অতি মনোহর; তাহার লেখার গুণে একবারও মনে হয় নাই যে, কোন অপরিচিত বৈদেশিক ঘটনা ও আচার-ব্যবহারের কথা পাঠ করিতেছি। যে মহরম পর্ব্ব প্রতি বৎসর দর্শন করি; যাহা আমাদের জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছে; তাহার প্রকৃত ইতিহাস আমরা কেহই সম্যক অবগত নহি। সামান্য মুসলমানের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে উহার প্রকৃত গৌরব ও মর্ম্ম কিছু উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বিষাদ সিন্ধু পড়িয়া আমাদের পূর্বসংস্কার দূরীভূত হইল। অন্তঃকরণে এক অতি অপূর্ব্ব বিস্ময়-পূর্ণ ভাবের উদয় হইল। একদিকে হাসান-হোসেনের অসাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, মহত্ত্ব ও উদারতা, অন্যদিকে এজিদের ক্রূর প্রকৃতি, নিষ্ঠুরতা, মজ্জাগত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা এমন অপূর্ব্ব কৌশলে চিত্রিত হইয়াছে যে, পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আলোড়িত, হৃদয় বিক্ষুব্ধ ও মন হর্ষ-বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। ইহার উপসংহার ভাগ এমন করুণরসপূর্ণ যে, পাঠ করিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন না। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ মধুর লালিত্যপূর্ণ। যাহারা বিশুদ্ধ ও সুরুচিপূর্ণ বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসেন, বিষাদ সিন্ধু তাঁহাদের পক্ষে একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, বাঙ্গালি হিন্দু এই পুস্তক পড়িয়া মুসলমানকে ভাই বলিতে শিখিবেন, আর বাঙ্গালি মুসলমান এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা করিবেন।"[৮]

'সুলভ সমাচারে' নিম্নোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ

"এই পুস্তকখানি আমরা বহুদিন পূর্বে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মীর মশাররফ হোসেন নামক একজন মুসলমান বিরচিত। ··· ··· বলিতে কি, ইহা আমাদিগের চিত্ত এতাধিক আকর্ষণ করে যে, দুইদিনের মধ্যেই ২০৪ পৃষ্ঠাযুক্ত এই পুস্তক পাঠ আমরা সমাপ্ত করি। ইহার ঘটনারাশি ইতিহাসমূলক; কিন্তু ঠিক যেন উপন্যাসের ন্যায় আমরা পাঠ করিলাম। ঘটনাগুলি উপন্যাসের ন্যায়; লেখার চাতুর্য ও মিষ্টতা তাহাদিগকে যথার্থই উপন্যাসের বেশ প্রদান করিয়াছে। এ দেশের মুসলমানেরা কেহ যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে জানেন আমরা পূর্বে তাহা জানিতাম না। এমাম হাসেন হোসেনের ইতিহাস বাস্তবিক বিষাদ সিন্ধু; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার

হাতে পড়িয়া ইহা বিষাদ মহাসাগর রূপ ধারণ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবি যে চরিত্র গড়েন তাহাতে কল্পনা থাকে; সুতরাং তাহা পাঠে লোকের মনে বিস্ময়-ভাবাদি সহজে উদয় হইতে পারে; কিন্তু মায়মুনা-রূপ রাক্ষসী, জায়েদা-রূপ ঈর্ষান্বিতা ও বিশ্বাসঘাতিনী, এজিদের ন্যায় স্বার্থপর, আত্মাভিমানী ও ধার্মিক বিদ্বেষী লোকসকল ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আছে ইহা কি বিস্ময়কর। এমাম হাসেন হোসেনের প্রতি ইহাদের ব্যবহার বাস্তবিক বিষাদ সিন্ধু উথলিত করে। যে হাসান বৃদ্ধের হস্ত হইতে বর্শাঘাত পাইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, জায়েদা বিষ খাওয়াইয়াছেন জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং সে কথা সম্পূর্ণ গোপনে রাখিলেন তাঁহারও এ জগতে ভয়ানক শত্রু হয়। বিষাদ সিন্ধু পুস্তকখানি আদরের বস্তু হইয়াছে। মহরমে কেন যে এতকাল পরে লোকে বুক চাপড়ায় তাহা পাঠে ইহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। যাহারা মহরমের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে চাহেন তাহারা এই পুস্তক পাঠ করুন। যাঁহারা পবিত্র সত্য উপন্যাস পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারাও ইহা পাঠ করুন। মীর মশাররফ হোসেন যে উপাদেয় সামগ্রী আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে আমরা যথার্থ অন্তরে নমস্কার করি।"[৯]

'ভারতী' পত্রিকায় নিম্নোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়:

"বিষাদ সিন্ধু। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত। প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে চলিল; মুসলমান আসিয়া বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এত দীর্ঘকালেও বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম ইতিহাস কাহিনী সম্যক অবগত নহেন; যা জানেন তা ভাসা ভাসা উপরি উপরি মাত্র। যদি মুসলমানগণ বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী হইয়া তাহাদের ইতিহাসাদি খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল উক্ত অভাব দূর করিতে পারেন এমন নহে—এই সূত্রে উভয় জাতির মধ্যে ক্রমে একটা সখ্যতা স্থাপন হইতে পারে। তাই বিষাদ সিন্ধু পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস-ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

লেখক বিষাদ সিন্ধুর দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আগ্রহ সহকারে তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। আশা করি এইরূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম-ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা কাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন।"[১০]

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সমালোচনা অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"আমরা শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত বিষাদ সিন্ধু (মহরম পর্ব) নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থখানিতে মহরমের আনুপূর্বিক ইতিহাস অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মুসলমান-জগতে মহরম এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার যথাযথ ইতিহাস একজন মুসলমানের নিকটেই আশা করা যাইতে পারে। হোসেন সাহেব আরবী ও পারসী মূল হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-ভাণ্ডারে এক মূল্যবান পদার্থ প্রদান করিলেন। ইতিহাসটি একখানি সুন্দর উপন্যাস। যেরূপ সুন্দর, সুললিত, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়। স্তম্ভান্তরে আমরা এই বিষাদ সিন্ধু মন্থন করিয়া মহরমের চমৎকার রহস্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম।"[১১]

'সমর' পত্রিকায় সমালোচনাটি এরূপ :

"বিষাদ সিন্ধু (মহরম পর্ব) প্রথম ভাগ, মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত। মহরমের মূল ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ ইহা তত যত্নের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু ইহার কিয়দংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া আর ইহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমরা সমুদয় পুস্তকখানি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলাম। মুসলমান কর্তৃক লিখিত বাঙ্গালায় এরূপ রচনাচাতুর্য আমরা কখনও দৃষ্টি করি নাই। ইহার ভাষা এত সুশ্রাব্য ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আমরা গ্রন্থকারকে শতশত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। 'বিষাদ সিন্ধু' যে কেহ পাঠ করিবেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজকাল মুসলমান ভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাকে নূতনব্রতী

বলিয়া বোধ হয় না; বাস্তবিক তিনি যে একজন সুলেখক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইচ্ছা সমুদয় গ্রন্থখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিই। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ তাহা পারিলাম না। আমরা ভরসা করি গ্রন্থকার তাঁহার খনি হইতে আরও অধিক রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।"

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় নিম্নোক্ত রূপ মন্তব্য করা হয়ঃ

"গ্রন্থকর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গতজীবন 'আজীজন নাহার' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যনির্বাহ করিয়া সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত। সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদ সিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া 'বিষাদ সিন্ধু' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাঁহারা মুসলমানদিগের মহরম পর্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি তাহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথ পূর্ণ হইবে। মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ যে বঙ্গভাষা বিস্তৃতির আর একটি নূতন পথ এবং মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি মুসলমানদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, ইহা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন।"[১২]

'বিষাদ সিন্ধু' দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণের শেষে জনৈক অজ্ঞাত পাঠকের একটি সমালোচনাও মুদ্রিত হয়েছে। ঐ পত্রে মশাররফকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, উপরের সবগুলো সমালোচনাই সাধারণ আলোচনা। কোন বিস্তৃত বা বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনাই করা হয়নি।

মশাররফ রচিত প্রবন্ধ 'গো-জীবনে'র একটি সমালোচনা 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেটি নীচে উদ্ধৃত হলোঃ

"কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গো-জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো-বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উৎথিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ অপক্ষপাতীভাবে

তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্যও জন্মিল। ভরসা করি মুসলমানগণ তাহার অনুসরণ করিবেন।"[১৩]

'ভারতী' পত্রিকায় 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'রও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ

"আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস নহে; কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ইহা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী। অত্যাচারের কাহিনীটি সুখপাঠ্য—কিন্তু গল্পের গাঁথুনিটি সুসংবদ্ধ নহে।"[১৪]

এরপর যে সমালোচনাটি পাওয়া যাচ্ছে তা হলো 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র প্রথম খণ্ডের উপর। The Calcutta Gazette পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায় নিম্নোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ

"(It) is a story relating mainly to the quarrel between two female Muhammedan Zamindars in Northern Bengal. It is full of graphic realistic sketches illustrating the life led by the local Mahommedan gentry, the roguery of Zamindari amla, the corruption of the police and the high handed proceedings of the native judiciary and magistracy in the Mufassal. Among the characters that of Begum Saheb is very cleverly drawn. The writer is no friend of female emancipation and he comments in strong language on Begum Saheb's not conforming to a system of Purdah prevalent among high class Mahommedan ladies. The writer though a Muhammedan ; writes Bengali with ease and possesses a wonderful command over the vocabulary of the language. But his style is nevertheless ungrammatical and marked by East Bengalism (sic) and absence of literary grace."[১৫]

উপরোক্ত পুস্তকের আর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'প্রদীপ' পত্রিকায়। সেটি লিখেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ঃ

"মীর সাহেবের পূর্বে মুসলমান লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল; পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থ রচনা করিতেছেন; মুসলমান গদ্য লেখকবর্গের মধ্যে এখন পর্যন্ত মীর সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্য-সেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইহার সাহিত্য-গুরু; প্রথমে 'গ্রামবার্তায়' পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া মীর সাহেব 'আজিজন নেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টিয়া একদা নীলবিদ্রোহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা দুই-একটি বঙ্গবিদ্যালয়, দুই-চারিখানি কলেজ এবং দুই-দশ খানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশাররফ হোসেন যে সাহিত্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। ··· ···

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র; সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, অম্লমধুর, মধুর, অতিমধুর, যাহা চাও তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর-করুণ রস উছলিয়া পড়িতেছে।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইতে শ্রুতিকটু দোষ পরিহার করিতে পারেন না, স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং গাজী মিয়াঁর কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ফলা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন সেখানেই যেন সপাসপ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতর-ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা

ছুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই ? পাঠক। হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ যাই নাই। ... ...

মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিয়াঁ প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তম্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভালমন্দ সকলপ্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, ধিনতাধিনা, তেনাচোরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা। বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজ রাজ্যের লজ্জার বিষয় ; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বিলাতি বার্নিস ; ভিতরে টিন পাতা ; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই। ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না ; কিন্তু ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহু ব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে ; কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্মচারীর, গাজী মিয়া সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। রাজা-প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

গাজী মিয়াঁ কে ? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্যকলাপের মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন ? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজী মিয়াঁর আত্মগোপন-চেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্বত্র তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্যসেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প ; তন্মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' রচয়িতা শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে বিষাদ সিন্ধু প্রসূত হইয়াছে, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'ও যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা এমন ভাব এমন কাহিনীবিন্যাস-কৌশল

মুসলমান সাহিত্য সেবকদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কেবল 'বিষাদ সিন্ধু' রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।"[১৬]

মীর মশাররফ হোসেন যে সকল কবিতা-পুস্তক রচনা করেন সেগুলোর কোন সমালোচনা তৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম' প্রভৃতি গ্রন্থ কোথাও সমালোচিত হয়েছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর পর ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে (চুঁচুড়া) যে পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

"বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জাতিভেদ কিছুই নাই।··· ··· মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য বিলাপ করিতেছি, মীর মোসারেফ হোসেনের জন্য সেইরূপ গভীর দুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। আমার বড় বাসনা হইয়াছিল মনোমোহন বা গিরিশচন্দ্রের অন্যতর একজনকে এই সম্মিলনের সভাপতি করা হয়,—আমি এমনকি এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর মোসারেফ হোসেনকে আমি কখন দেখি নাই ; তাঁহার বিষাদ সিন্ধু আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম এই সম্মিলনে তাহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি সাধন করিব। শেষ সময়ে শুনিলাম তিনি এখন বিহেস্ত-বিহারী। যাঁহারা কখন মুর্শিদাবাদের মহরমের সময় মর্শিয়া-গীতি শুনিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন মহরমের আখ্যান-কাব্য 'বিষাদ-সিন্ধু' কিরূপ প্লাবনী করুণারসে টলটল করিতেছে। আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালী লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"[১৭]

উপরের সমালোচনাগুলি থেকে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে মুসলমানদের পক্ষে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখা কষ্টকর ছিল। উনিশ শতকের প্রাপ্ত সাহিত্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তৎকালে মুসলমান লেখকগণ এক মিশ্রভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। ঐ মিশ্রভাষা বাংলা, আরবী, ফার্সী, হিন্দী ও উর্দুর সমন্বয়ে গঠিত একটি পঞ্চভাষা। পরবর্তীকালে একেই 'দোভাষী পুথি'র

ভাষা বলা হয়েছে। নিম্নবঙ্গের অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ভাষা সম্পর্কে উইলিয়াম হাণ্টার নিয়োক্ত মন্তব্য করেছেন :

> "it has developed ... ... a popular dilect of its own. The pato is known as Musalman Bengali is as distinct from the Urdu of upper India, as the Urdu of North India is different from Persian of Herat."[১৮]

বাংলা ভাষা মুসলমানদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা কেন বাংলা ভাষা শিখেনি এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তৎকালীন মুসলমান-সমাজের সামগ্রিক চেহারার বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের বহির্ভূত বিষয় হলেও এ সমাজের মন ও মানস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা[১৯] এ পুস্তকের অন্যত্র আছে। এ প্রসঙ্গে মোদ্দা-কথা এই যে, উনিশ শতকের উচ্চবিত্ত মুসলমানগণ উর্দু বা ফার্সীতে কথাবার্তা বলতেন। অপরপক্ষে সাধারণ বা নিম্নবিত্ত মুসলমানেরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। যেহেতু সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা অতি অল্পই লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেতেন; সেহেতু বঙ্গভাষী মুসলিম সমাজে কোন সাহিত্যিক প্রতিভার জন্ম হয়নি। বাংলা সৃজনশীল সাহিত্যে মশাররফই প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান লেখক যিনি যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মশাররফ হোসেনের সমস্ত সমালোচকই ছিলেন অমুসলমান এবং মশাররফের রচনা সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও তাঁদের মন্তব্যগুলো অনেকাংশেই খুব সংক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল এবং অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সাধারণ রকমের।

মীর মশাররফের মৃত্যুর পরেও অবস্থা একই থাকে। যদিও কোন ইতিহাস পুস্তক, যেমন নদীয়া জিলা[২০] বা ময়মনসিংহ জেলার বিবরণে[২১] কিংবা জীবনী পুস্তকে যেমন : কাঙ্গাল হরিনাথের[২২] জীবনী বা মেহেরুল্লার জীবনীতে[২৩] প্রসঙ্গক্রমে মশাররফের নামের উল্লেখ আছে। অবশ্য মশাররফের নাম যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব পুস্তকগুলির মধ্যে জলধর সেন রচিত কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনী উল্লেখযোগ্য। জলধর সেন মশাররফের সঙ্গে সেকালের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক এবং বাউলসঙ্গীত রচয়িতা কুমারখালির কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছেন :

> "এই সময়ে একদিন পরলোকগত মীর মশাররফ হোসেন মহাশয় কুমারখালীতে আসেন। তিনি কাঙালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর

সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অনতিদূরে গৌরীনদীর তটে লাহিনী-পাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। ··· ··· তাঁহার 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশাররফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহেই মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না, লিখিতেন—'গৌরীতটবাসী মশা'। এই মশার লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গৌরী সেতু', তাঁহার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', তাঁহার 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' আর তাঁহার অমূল্য রত্ন 'বিষাদ সিন্ধু' যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধবয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন তোমাকে 'নীলবিদ্রোহ' সম্বন্ধে অনেক নোট দিয়া যাইব—তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও, আমি এ বয়সে আর পারিলাম না। আলস্যবশতঃ সে 'নোট'ও লওয়া হইল না। তিনিও আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ার সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মীর মশাররফ হোসেনের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।"[২৪]

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়[২৫] মীর মশাররফ এবং নাঈমুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। মীর মশাররফ 'গো-জীবন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে গো-হত্যাবিরোধী মন্তব্য লিখার পরে 'আখবারে ইসলামিয়া' পত্রিকার সম্পাদক নাঈমুদ্দিন মশাররফকে 'কাফের' বলে ফতোয়া (ঘোষণা) দেন।

তারপর মশাররফ নাঈমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানহানির এক মামলা করেন। সেকালের আর একটি পত্রিকা 'ইসলাম দর্শনে'র সম্পাদক আবদুল হাকিম

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের অবদান সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন :

> "আমাদের শ্রদ্ধেয় মীর মশাররফ বঙ্কিম বাবুর প্রায় সমসাময়িক। মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনি মুকুট সদৃশ।"[২৬]

উক্ত পত্রিকায় অবশ্য কতকগুলি মুসলমানী বিষয়কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করায় মশাররফকে সমালোচনা করা হয়। অবশ্য বাংলা গদ্য রচনায় মশাররফের কৃতিত্বের প্রশংসাও করা হয় :

> "মীর মশাররফই প্রথম লেখক, যিনি পুথি-সাহিত্যের প্রভাব কাটাইতে পারিয়াছেন। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় পুস্তক লিখিয়া তিনি গোঁড়া মুসলমানদের চক্ষুশূল হইয়াছেন।"[২৭]

উপরের মন্তব্য ও অন্যান্য সমালোচনাগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, মশাররফই প্রথম লেখক, যিনি দোভাষী বা পঞ্চভাষিক পুথির রচনাভঙ্গী বর্জন করতে পেরেছিলেন। কোন কোন সমালোচক মশাররফের এই বিশেষ দিকটির প্রশংসা করেন এবং বঙ্গভাষার উপরে তাঁর যথেষ্ট দখল থাকায় সমালোচকেরা সেজন্য মশাররফকে যথেষ্ট প্রশংসা করেন। যদিও সমালোচকেরা মশাররফের লেখার অন্যান্য দোষগুণের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। তথাপি উপরের উদ্ধৃত সমালোচনাগুলি থেকে আমরা মশাররফ-রচনার বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারি।

পরবর্তী সমালোচনা

পরবর্তী সমালোচনাগুলোকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, প্রধান সমালোচনা; দুই, অপ্রধান সমালোচনা।

প্রধান সমালোচনা মূল গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করে রচিত। সমালোচকগণ মশাররফ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে তাঁর রচনার মূল্যায়ন করেছেন। অপ্রধান সমালোচকগণ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অপরের উপর নির্ভর ক'রে মশাররফের রচনার মূল্যায়ন করেছেন। এর ফলে তাদের সমালোচনায় অনেক তথ্যগত অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। অবশ্য অনেক সময় প্রধান সমালোচকরাও অজ্ঞতাবশতঃ অশুদ্ধ তথ্য সরবরাহ করেছেন। প্রথমে প্রধান সমালোচনাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত 'বিষাদ সিন্ধু'র সমালোচনাটিই সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা। প্রবন্ধটি তিনি লিখেন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধে 'বিষাদ সিন্ধু'র ত্রুটি-বিচ্যুতি, উৎকর্ষ ও মশাররফ-মানস সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করেন :

"... ... উপাদান তিনি যেখান থেকেই সংগ্রহ করুন না, এই গ্রন্থে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অসাধারণ। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস পুথি সাহিত্য ও বিষাদ সিন্ধুর মধ্যে বোধ হয় এই সাদৃশ্য। জীবনে বা সাহিত্যে অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস কোন অপরাধ নয়; যখন অজ্ঞতা এবং ভয় এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখনই তা জীবনে অভিশাপস্বরূপ হয় এবং তা সাহিত্যে অবাঞ্ছিত। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের দরুন তিনি সাহিত্যিক দক্ষতা প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন। ... ... জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা অগভীর নয়। মানবজীবনের জটিলতা সম্পর্কেও সম্যক পরিচিত।

তার স্বাভাবিক প্রতিভা এবং ধর্মবিশ্বাস ও পরকাল সম্পর্কে ধারণার মধ্যে একটি বিরোধ লক্ষ্য করা যায় ... ... ।"[২৮]

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের সঙ্গে মশাররফের তুলনা করেন :

"এই গ্রন্থের চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে মেঘনাদ-বধ কাব্যের চরিত্র সৃষ্টির সাদৃশ্য আছে। মেঘনাদ-বধের নায়ক রাবণের যেমন অসীম ক্ষমতা, তেমনি তার দুঃখ। এজিদও রাবণের মত শক্তিশালী ... ... মেঘনাদ-বধের সীতা হচ্ছে বিষাদ সিন্ধুর জয়নাব। জয়নাবের স্বগতোক্তি সীতা-সরমার আলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

মশাররফের চরিত্র অঙ্কনের দক্ষতার কথাও সমালোচক বলেছেন। দেখা যাচ্ছে, কাজী ওদুদের সমালোচনাই মীর মশাররফ সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত সমালোচনা। সমালোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও মশাররফের রচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'[২৯] গ্রন্থাবলীর 'মীর মশাররফ হোসেন'।[৩০] পুস্তিকাটি মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার হলেও এতে মশাররফের পঁচিশখানা পুস্তকের তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ব্রজেন্দ্রনাথ মশাররফের একটি অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়েছেন, পূর্বের কিছু সমালোচনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং মশাররফের দুষ্প্রাপ্য রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। প্রথমেই ব্রজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন :

"... ... বাঙলাদেশে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান অন্যদিকে 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা মীর মশাররফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ। এদেশে তিনিই এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যশিল্পী। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' যেমন একদা প্রতি ঘরে ঘরে পঠিত হইতো তেমনি বাঙলাদেশের মুসলমানরাও 'বিষাদ সিন্ধু' পাঠ করতেন। ... ...
... ...
জীবনে ও সাহিত্যে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি বঙ্গমাতার দুই বিবদমান সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।"[৩১]

পরবর্তী সংস্করণে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাররফের জীবনীর আরও কিছু তথ্য সংযোজন করেন।[৩২]

আবদুল লতিফ চৌধুরীর 'মীর মশাররফ হোসেন'[৩৩] মূলতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই রচিত। মূলগ্রন্থ সংগ্রহে অক্ষম হওয়ায় আবদুল লতিফ 'রত্নবতী', 'বসন্তকুমারী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি 'বিষাদ সিন্ধু', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'এসলামের জয়' এবং 'বিবি কুলসুম' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি 'বিষাদ সিন্ধু'র গল্পাংশটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং মশাররফের উপন্যাস রচনায় দক্ষতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

"বিষাদ সিন্ধু বাংলা সাহিত্যে অমর সৃষ্টি। বিষাদ সিন্ধু জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। ... ... এক হিসাবে বিষাদ সিন্ধুকে গদ্যে রচিত মহাকাব্য বলা যায়। তবে একথা সত্য যে বিষাদ-সিন্ধু কাব্য নয়—উপন্যাস। ... ... বিষাদ সিন্ধুর বহু অংশে উচ্চাংগের কবিকল্পনা ও দার্শনিক ভাব-তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে। ... ... সর্বত্র ইতিহাসকে অনুসরণ না করলেও এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক পরিণাম স্বীকৃত হয়েছে। ... ... উপন্যাসের উপক্রমণিকার নিয়তির লীলা পরিণাম প্রকাশিত হওয়ায় জাগ্রত কৌতূহলের অবসান হয়েছে।"[৩৪]

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' সম্পর্কে লতিফ চৌধুরী বলেন :

"গাজী মিয়াঁর বস্তানী উপন্যাস জাতীয় রচনা, সুলিখিত উপন্যাস নয়। এতে বহু নরনারীর সমাবেশ হয়েছে; ঘটনাগুলি পরস্পর বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়—এতে মূল ঘটনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ... ... পুস্তকখানা টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল ও কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম পেচার নক্সা জাতীয় রচনা। তবে গাজী মিয়াঁর উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা আরো ব্যাপক ও গভীর এবং নিঃসন্দেহে গাজী মিয়াঁর বস্তানী উল্লিখিত পুস্তক দুইখানা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা।"[৩৫]

তিনি আরও বলে যে, "গাজী মিয়াঁর বস্তানীর ভাষা কমলাকান্তের দপ্তরের ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"[৩৬] তিনি 'এসলামের জয়' সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

"তার সমগ্র রচনার মধ্যে 'এসলামের জয়' গঠন-পারিপাট্যে, ভাষা, দার্শনিক ভাব-কল্পনায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিবেশনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের মনে হয় ভাষা, শব্দবিন্যাস, চিত্র-পরিকল্পনায় এসলামের জয় তার অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে।"[৩৭]

লতিফ চৌধুরীই বোধ করি প্রথম সমালোচক, যিনি 'গাজী মিয়াঁর বস্তানীর বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। সবশেষে তিনি মশাররফের দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবনী 'বিবি কুলসুম' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বিবি কুলসুম সম্পর্কে তার মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

"বিবি কুলসুমের বেদনাবিজড়িত কবিত্ব গল্প মোহ ও সহমর্মিতা পাঠককে অভিভূত করে।"[৩৮]

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' মীর মশাররফ হোসেনের রচনার উল্লেখ ও সমালোচনা করা হয়েছে।[৩৯] উক্ত গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের একজন 'বিষাদ সিন্ধু', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'এসলামের জয়', 'মৌলুদ শরীফ', ও 'বিবি কুলসুম' সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সংক্ষেপে 'জমীদার দর্পণ' ও 'বসন্ত-কুমারী নাটক' সম্পর্কেও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। মশাররফ সম্পর্কে উক্ত সমালোচকের মন্তব্য অনেকটা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও আবদুল লতিফ চৌধুরীর অনুরূপ। উক্ত সমালোচক মশাররফের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মন্তব্য করেছেন।[৪১] উক্ত সমালোচক মশাররফের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। তাঁর মন্তব্য এরূপ:

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবেও তিনি জড়িত ছিলেন না।"[৪১]

মশাররফের রচনাশৈলী সম্বন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেছেন, যদিও তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

মশাররফ সম্পর্কে সর্বশেষ পুস্তক মুনীর চৌধুরী রচিত 'মীর মানস'।[৪২] অরবিন্দ পোদ্দার কৃত 'বঙ্কিম মানস'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই পুস্তক।[৪৩] অরবিন্দ পোদ্দার তার পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনের বিভিন্ন সময়ে যে মানসিক দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়েছিলেন তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেই দ্বন্দ্ব তার সাহিত্যে কী ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন অরবিন্দ পোদ্দার। অনুরূপভাবে মুনীর চৌধুরী তার 'মীর মানস' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মশাররফের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। 'মীর মানস' গ্রন্থটি মুনীর চৌধুরী লিখিত আটটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রবন্ধ 'মীর মানসে' চৌধুরী মশাররফের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। মুনীর চৌধুরী সমালোচকদেরও সমালোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। বিশেষ করে কাজী আবদুল ওদুদ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আবদুল লতিফ চৌধুরী, আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুল হাই এদের মন্তব্য-সমূহের সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে কাজী ওদুদ তার সমালোচনায় যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তাকেই বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেছেন। যদিও মুনীর চৌধুরী মশাররফের অন্তর্দ্বন্দ্বের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। মুনীর চৌধুরীর মত হলো, মশাররফ তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে এক একটি মানসিক জটিলতার মধ্যে পড়েছেন এবং মশাররফের দৃষ্টি-ভঙ্গী যেন পশ্চাৎমুখী ছিল এবং তিনি মধ্য-উনিশ শতাব্দীর 'ক্যালকাটা-কালচার' দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি।[৪৪] অবশ্য কখনো কখনো মুনীর চৌধুরী খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অসতর্ক। যেমন, 'বসন্তকুমারী নাটকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রেবতী এবং তার চিঠির ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি দেখা যায়।[৪৫] তিনি নাটকটির বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং পরিবেশের প্রশংসা করেছেন। তিনি ফরাসী নাট্যকার রেসিনের 'ফ্রিডা' নাটকের সঙ্গে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[৪৬] মশাররফ ফার্সী জানতেন এমন কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। সুতরাং রেসিনের সঙ্গে মশাররফের তুলনা একেবারেই অবান্তর।

'জমীদার দর্পণ' সম্পর্কে মুনির চৌধুরী বলেন, নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' অনুকরণে রচিত এবং 'নীলদর্পণের' চাইতে এটি নিকৃষ্ট রচনা।

'নীলদর্পণে' একটি বিরোধীশক্তি রয়েছে যা অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্থাপন করে, কিন্তু 'জমীদার দর্পণ' নাটকে তদ্রূপ কোন শক্তির অস্তিত্ব নাই।[৪৭] 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। বিশেষ করে চরিত্র অঙ্কনে মশাররফের দক্ষতার কথা মুনীর চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। জনৈক সমালোচক[৪৮] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'কে মশাররফের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিহ্নিত করলে চৌধুরী তা স্বীকার করেন না। তবে মুনীর চৌধুরী এই পুস্তকখানি যত্নসহকারে পাঠ করেছেন বলে মনে হয় না, নইলে তিনি এটিকে মশাররফের বাল্যকালের কাহিনী বলে অভিহিত করতেন না।[৪৯] আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। চৌধুরীর বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকটি ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে লেখা এবং কতকাংশে অশ্লীল রচনা। তিনি বলেন, "এই গ্রন্থ যদি দর্পণ হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, এই বৃহৎ দর্পণখানা নিতান্তই সস্তা, সেকেলে ও গ্রাম্য। ... ... বস্তানীর জমীদাররা দরিদ্র দেশবাসীর ওপর কোন রকম অত্যাচার উৎপীড়ন করেন না।"[৫০] সুতরাং মশাররফ যে দরিদ্র জনসাধারণ বা নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এ কথা মুনীর চৌধুরী মনে করেন না। অন্য একটি অধ্যায়ে চৌধুরী বাঙলা আত্মজীবনী ও মশাররফের আত্মজীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন। নবীনচন্দ্র সেনও মশাররফের আত্মজীবনীর সঙ্গে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন মুনীর চৌধুরী। যেহেতু মশাররফের আত্মজীবনী বৃদ্ধবয়সে লেখা ; সুতরাং এ জীবনীতে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে।[৫১] সমালোচক মশাররফের 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে রচয়িতার যে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়[৫২] তাই সমালোচককে মুগ্ধ করেছে। সম্ভবতঃ চৌধুরী বিস্মৃত হয়েছেন যে, 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থটিও আত্মজীবনীর পরেই রচিত। সুতরাং বার্ধক্যের দোহাই দিয়ে স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা প্রমাণ করা মুস্কিল।

এবার মশাররফের অপ্রধান সমালোচকদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত Bengali Literature গ্রন্থে[৫৩] মশাররফের নাম উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে মশাররফকে মাত্র 'বিষাদ সিন্ধু'র রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম লেখক বলে অভিহিত করা হয়েছে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত জে. সি. ঘোষ রচিত পুস্তকে বলা হয়েছে ঃ

"এই যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক হলেন মীর মশাররফ আকবর হোসেন। শুধু এই যুগ নয়, সব সময়ের জন্যই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ লেখক।"[৩৪]

সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মশাররফের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'জমীদার দর্পণ' সম্পর্কে তিনি বলেন: "বাস্তব চিত্র হিসাবে নাটকটি মূল্যহীন নয়।"[৩৫] কিন্তু সুকুমার সেনের মন্তব্য কোথাও কোথাও অশুদ্ধ এবং অনেকাংশে অগভীর। যেমন, উক্ত ইতিহাস-পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণে তিনি 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'মদিনার গৌরব', 'হজরত বেলালের জীবনী' প্রভৃতি পুস্তকগুলিকে গদ্য-রচনা বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি পদ্য-রচনা।

মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেনকে মুসলমান সাহিত্যিকদের 'পথপ্রদর্শক' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য তিনি মশাররফের কোন গ্রন্থের সমালোচনা করেননি। কেবলমাত্র তাঁর রচিত পুস্তকের তালিকা সংযোজিত করেছেন। 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য় আশরাফ সিদ্দিকী মশাররফের রচনা ও আত্মজীবনীর সমালোচনা করেন। কিন্তু মনে হয়, তিনি মশাররফ হোসেনের সমগ্র রচনাবলী পাঠ করেন নাই। মশাররফের পূর্বপুরুষদের কাহিনী ও তাঁর বিবাহের কাহিনী পরিবেশনায় আশরাফ সিদ্দিকী অনেক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।[৩৬] কাজী আব্দুল মান্নান 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য়[৩৭] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কেননা এই গ্রন্থে লেখক নীলচাষের একটি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করেছেন এবং একটি কাহিনীর সুষম পরিণতি দান করেছেন।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে আশুতোষ ভট্টাচার্য[৩৮] মশাররফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তার আলোচনার তথ্যের উৎস হচ্ছে আশরাফ সিদ্দিকী ও মুনীর চৌধুরীর প্রবন্ধগুলো। তার আলোচনায় এমন কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, তিনি মশাররফের মূল রচনাগুলো পাঠ করেছেন। সর্বশেষ যে পুস্তকটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি তা হচ্ছে আনিসুজ্জামান রচিত 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'।[৩৯] যদিও তাঁর আলোচনার মূল লক্ষ্য অন্যদিকে—যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং ইংরেজ আমলের মুসলিম চিন্তাধারা ইত্যাদি। তথাপি, মশাররফ

হোসেনের রচনা সম্পর্কে তার মূল্যবান মন্তব্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য। অপ্রধান সমালোচনাসমূহ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, এই সমালোচকবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের আলোচনা প্রায় ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত এবং কোথাও বা অশুদ্ধ তথ্য পরিবেশনার ত্রুটি লক্ষিত হয়।

সমকালীন সমালোচনাগুলি ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ঐ সমস্ত সমালোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সেকালে মশাররফের রচনা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যদিও কখনও কখনও তাঁর রচনার বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর রচনার প্রশংসা করেছেন। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মশাররফের জীবদ্দশায়ই তিনি কিছুটা খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। অন্যদিক থেকেও এই সমালোচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বাংলা সাহিত্য-চর্চায় কিভাবে মুসলমান লেখকরা আগ্রহী হচ্ছেন তার বিবরণও এসব সমালোচনা থেকে সংগ্রহ করা যায়। অনেকে মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চাকে জাতীয় সংহতির পথে অগ্রগতি বলে মনে করেছেন। এইসব সমালোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে মোটেই আগ্রহী ছিল না। পরবর্তী সমালোচনাগুলি এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো—যদিও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় সমালোচনাগুলি মাত্র আলোচিত হয়েছে।

এটি সত্যি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর রচনার কোন সমালোচনা প্রকাশিত হয়নি এবং তাঁর অনেক পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ হয়নি। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালী পাঠকেরা মশাররফ লিখিত পুস্তকসংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত 'বিষাদ সিন্ধু'র সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটির উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তিনিই প্রথম সমালোচক যিনি মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ শিল্পী হিসাবে বিবেচনা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ই মশাররফ হোসেনের রচনার প্রায় সম্পূর্ণ একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মশাররফের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রণয়ন করেন। মশাররফ সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করেন, যদিও কোথাও কোথাও সে মন্তব্য উৎসাহের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত।

কয়েকটি দুর্লভ পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃতিও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সরবরাহ করেছেন। পরবর্তী সমালোচকরা সকলেই অল্পবিস্তর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। লতিফ চৌধুরীর সমালোচনাটিও উল্লেখযোগ্য এজন্যে যে, তিনি মশাররফের কোন কোন পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। কোন কোন গ্রন্থের সমালোচনা, যেমন 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' এ দু'টি গ্রন্থের সমালোচনা লতিফ চৌধুরীর আগে কেউ করেননি। আবদুল হাই লিখিত সমালোচনা মশাররফ সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য সরবরাহে অক্ষম হলেও তিনি মশাররফের মনোজগতের কোন কোন দিক নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে রাজনীতিতে বা সামাজিক আন্দোলনে মশাররফের নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আবদুল হাই-ই প্রথম মন্তব্য করেন। মুনীর চৌধুরী কৃত 'মীর মানস'ই মশাররফ সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ, যার পর আর অনুরূপ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু মুনির চৌধুরীর আলোচনাও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। তার আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে মশাররফের চিন্তা-ভাবনা ও মনোজগতের বিভিন্ন দিক। এসব বিষয়ে পূর্বে কদাচিৎ আলোচনা হয়েছে। অবশ্য মুনীর চৌধুরীর সমালোচনা অনেক সময়ই বাগড়ম্বর বা দুর্বোধ্য শব্দযোজনার অন্তরালে অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। তথাপি এযাবৎ মশাররফ সম্পর্কে যাবতীয় সমালোচনার মধ্যে চৌধুরীর সমালোচনা অধিকতর গ্রহণযোগ্য—কেননা তা মশাররফ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা আনয়ন করে।

তথ্য নির্দেশ

[১] *The Calcutta Review*, vol. I, No. 99, 1870, p. 235.

[২] 'বঙ্গদর্শন', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৌষ, ১২৮০, পৃঃ ৪৩১।

[৩] 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০, পৃঃ ২৩৭। উক্ত পত্রিকায় রাধানাথ বর্ধন রচিত 'সরোজিনী নাটকে'র সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। সরোজিনী নাটকের ভাষা বা ভাব সে যুগেও অশালীন বলে বিবেচিত হয়।

[৪] কিছুকাল হয় শিকাগো থেকে ডক্টর আনিসুজ্জামান এর একটি কপি সংগ্রহ করেছেন। চার অঙ্কে বিভক্ত এটি একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। রাধাকান্ত নামে জনৈক ধনবান বিবাহিত যুবক 'নয়নতারা' নাম্নী জনৈকা বারবণিতার প্রণয়াসক্ত হয়। রাধাকান্তের স্ত্রী মুক্তকেশী স্বামীকে নানাভাবে সুপথে আনার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে মুক্তকেশীর এক বান্ধবীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পুরুষ-বেশে তার বান্ধবীকে শয়নগৃহে নিয়ে রাত্রি-যাপন করে। এদিকে নয়নতারার প্ররোচনায় রাধাকান্ত মুক্তকেশীকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে গভীর রাত্রে মুক্তকেশীর শয়নগৃহে প্রবেশ করে। সেখানে এক অন্য পুরুষকে দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। পরিশেষে মুক্তকেশীর বান্ধবী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে এবং ঘটনার মিলনান্তক পরিসমাপ্তি ঘটে। কিছু অশালীন শব্দ প্রয়োগের জন্য সমালোচক মীর মশাররফ হোসেনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন।

[৫] 'বান্ধব', কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত, ঢাকা, আশ্বিন, ১২৮৩ (১৮৭৬), পৃঃ ২২০।

[৬] *The Englishman*, Calcutta, May 4, 1885.

[৭] *The Statesman and Friend of India*, Calcutta, May 31, 1885.

[৮] 'চারুবার্তা', ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২। কলিকাতা, ৮ই জুন, ১৮৮৫। ৮ থেকে ১৩ পর্যন্ত সমালোচনাসমূহ 'বিষাদ সিন্ধু'র দ্বিতীয় খণ্ডের (প্রথম সংস্করণ) শেষে সংযোজিত হয়েছে।

[৯] 'সুলভ সমাচার', ৪ঠা মে, ১৮৮৬; ১৯শে বৈশাখ, ১২৯৩।

[১০] 'ভারতী', ফাল্গুন, ১২৯৩; মার্চ-এপ্রিল, ১৮৮৭।

[১১] 'বঙ্গবাসী', ২৭শে বৈশাখ, ১২৯২; মে, ১৮৮৫।

[১২] 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', কুমারখালি, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তার 'মীর মশাররফ হোসেন' পুস্তিকায়ও এটি উদ্ধৃত করেন (প্রথম সং, পৃঃ ১৭)।

[১৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ ২১।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

[১৫] *The Calcutta Gazette*, October 31, 1900, Appendix, পৃঃ ৮-৯। 'Muhammedan'-এর বানানটি তিন রকম হয়েছে।

[১৬] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭, ৮-৯।

[১৭] 'বসুধা', ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২, উদ্ধৃত।

[১৮] W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, London, 1871, p. 152.

[১৯] এ পুস্তকের সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[২০] কুমুদনাথ মল্লিক : 'নদীয়া কাহিনী', ১৯১২, দ্বিতীয় সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

[২১] কেদারনাথ মজুমদার, 'ময়মনসিংহের বিবরণ', কলিকাতা, ১৯০৪, ২য় সং, ১৯০৭, পৃঃ ৮৩।

[২২] জলধর সেন, 'কাঙাল হরিনাথ', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০-৪১।

[২৩] শেখ জমীরুদ্দিন, 'মেহের চরিত', পৃঃ ৫৭-৫৮।

[২৪] জলধর সেন, 'কাঙাল হরিনাথ', পৃঃ ৪০।

[২৫] 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯১৯ ; কার্তিক, ১৩২৬ ; পৃঃ ১৯৬ ২০২।

[২৬] 'ইসলাম দর্শন', কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩২৭, পৃঃ ৪৮৭।

[২৭] প্রাগুক্ত, চৈত্র, ১৩২৭, পৃঃ ৫৩৪।

[২৮] কাজী আবদুল ওদুদ, 'শাশ্বত বঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫১।

[২৯] 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ৮ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কৃত 'বাঙালী লেখকদের জীবনী'। ২৯ নম্বর পুস্তিকাটি মীর মশাররফের জীবনী। প্রতিটি পুস্তক অবশ্য পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

[৩০] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'মীর মশাররফ হোসেন', প্রথম সং, কলিকাতা, ১৯৪৩।

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬।

[৩২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ।

[৩৩] আবদুল লতিফ চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেন, সিলেট, ১৯৫২।

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৯।

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

[৩৯] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', প্রথম সং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

[৪২] মুনীর চৌধুরী, 'মীর মানস', ঢাকা, ১৯৬৫।

[৪৩] অরবিন্দ পোদ্দার, 'বঙ্কিম মানস', কলিকাতা, ১৯৫১ (মূলে এটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডি. ফিল. থিসিস)।

[৪৪] মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬। উক্ত চিঠিখানি রানীর ভগ্নীর কাছে লিখা। কিন্তু চৌধুরী লিখেছেন চিঠিখানা রাজাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

[৪৮] কাজী আবদুল মান্নান, 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', ঢাকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯৫৮, পৃঃ ৫৯।

[৪৯] মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪, ৬৫, ১৮০। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি মশাররফের পিতামাতার জীবনী।

[৫০] মুনীর চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

[৫৩] Annada Sankar Ray and Lila Ray, *Bengali Literature*, P. E. N., Bombay, 1942, p. 61.

[৫৪] J. C. Ghosh, *Bengali Literature*, London, 1948, p. 133. লেখক মশাররফের নাম 'মীর মশাররফ আকবর হোসেন' কোথায় পেলেন বুঝা গেল না। বিষাদ সিন্ধু সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : 'He touchingly retold the story of Karbala in Visad Sindhu.'

[৫৫] সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় সং, ২য় খণ্ড, ১৯৪৯, পৃঃ ২৫৯।

[৫৬] আশরাফ সিদ্দিকী, 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯৫৭, পৃঃ ১।

[৫৭] কাজী আবদুল মান্নান, 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', ২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৫৯।

[৫৮] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ২৯৪-২৯৯।

[৫৯] আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৪। (পি. এইস. ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

উপসংহার

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে নাট্য-রচনাসহ মশাররফের গদ্য-রচনাগুলি আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা মশাররফের রচনার গুণাগুণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবো এবং বাংলা নাট্য ও গদ্য আখ্যায়িকা সাহিত্যে মশাররফের স্থান নির্ধারণ করতেও আমরা সক্ষম হবো। প্রথমতঃ, নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্বের কথা আলোচনা করা যাক।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে মশাররফের অবদান মাত্র দু'খানা পূর্ণাঙ্গ নাটক ও খান-দুয়েক প্রহসন। তবে এই দু'খানা নাটকই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মশাররফের স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছে। মশাররফ যখন নাট্যরচনায় অবতীর্ণ হন তখন বাংলা নাটকের শৈশবাবস্থা। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' প্রথম বাংলা নাটক। এর বিষয় পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া।[১] তারপর উল্লেখযোগ্য নাটক বা প্রহসন হচ্ছে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'।[২] তর্করত্ন এক জাতীয় নকশা বা প্রহসন রচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে বিবেচিত হন। মধুসূদন দত্ত পৌরাণিক এবং সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা'[৩] বিয়োগান্তক নাটক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সংযোজন। এই যুগের আর একটি অতি বিখ্যাত নাটক হচ্ছে নীলচাষ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটক।[৪] নাটকীয় গুণ বা রচনারীতির চাইতে এ নাটকের বিষয়বস্তুর জন্যই এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তারপর এটি ইংরেজীতে অনূদিত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়।[৫] জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, "এ নাটকটি প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তার কারণ এই নয় যে, এটি সত্যি সত্যি নাটক হিসাবে একটি মূল্যবান গ্রন্থ, এর হৃদয়বিদারক কাহিনী ও তাৎপর্যের জন্যই এমনটি হয়েছিল।"[৬]

মশাররফের আবির্ভাবও এই সময়ে। মশাররফ তাঁর নাটক 'বসন্ত কুমারী'র (১৮৭৩) বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ কোন কিংবদন্তী কিংবা কোন লোকগাথা

থেকে সংগ্রহ করেছেন। নাটক হিসাবে এটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, কেননা এর মধ্যে রয়েছে মনোজ্ঞ নাটকীয় সংলাপ, যা হাস্যরসে, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে পরিপূর্ণ। ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল সহজ। প্রায়ই মনে হয়, যেন এটি বিংশ শতাব্দীর কথ্য ভাষারই কাছাকাছি। মশাররফ তাঁর দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'জমীদার দর্পণ'-এ এমন একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন যা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এ নাটকে জনৈক দুর্নীতিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল লম্পট জমীদারের কুকীর্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভিজাত মুসলিম সমাজকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ নাটকে। সে যুগে জমীদাররা কী অপ্রতিহত ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তা এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে। সত্যি এটি প্রশংসনীয় যে, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপকর্ম প্রকাশ করার সৎসাহস মশাররফ দেখিয়েছেন। এ নাটকের সংলাপের ভাষা এ জাতীয় নাটকের উপযোগী চলিত ভাষা, জনৈক সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> "নাটক হচ্ছে অনেক উপাদানের সংমিশ্রণ।[৭] বিষয়বস্তু অনুযায়ী নাটকের ভাষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। কখনও অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষা নাটকে দৃষ্ট হয়, আবার কখনও শিক্ষিত অভিজাত ব্যক্তির সাধু ভাষা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাও নাটকে দৃষ্ট হয়। নাটকের সংস্থান বা ঘটনা অনুযায়ী নাটকের ভাষার উঠা-নামা বা হেরফের করার ক্ষমতা মশাররফের মধ্যে লক্ষণীয়। এটি নিঃসন্দেহে প্রাথমিক যুগের বাংলা নাটকে মশাররফের একটি মূল্যবান অবদান।"

মশাররফ রচিত গন্থ আখ্যায়িকাগুলিতেও ভাষার উপরে তাঁর দখলের প্রশংসা করতে হয়। মশাররফ বর্ণিত অধিকাংশ নারী-পুরুষ চরিত্র অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আহরিত এবং মশাররফ তাদের হৃদয়ের পরস্পর-বিরোধী বৃত্তিকে তথা অন্তর্দ্বন্দ্বকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন,—তাদের চরিত্রের বৈচিত্র্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। মশাররফের অধিকাংশ রচনায়ই মানবজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি চিত্রিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, পাপ কখনও পরিণামে জয়লাভ করে না। যদিও কখনও কখনও পাপের শক্তি এত প্রবল হয় যে, মানুষকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক হতে হয়। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ ধ্যান-ধারণাকে

শিল্পরূপ দেওয়া, যদিও 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা নীতিকথা রয়েছে। 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে যদিও মশাররফ নীতিবোধকে পরিহার করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানবজীবনের সমস্যাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একজন যথার্থ ঔপন্যাসিকের মতই তিনি তুচ্ছতা দীনতা ঔদার্য মহত্ত্ব যুক্ত রক্তমাংসের মানব-মানবীর সমস্যাকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে জনৈকা নর্তকীর প্রতি তাঁর পিতার আসক্তি, উক্ত নর্তকী কর্তৃক তাঁর মাতাকে হত্যার চেষ্টা এবং বিবাহিতা নারীর প্রতি কেনীর লালসা, 'বিষাদ সিন্ধু'তে জয়নাবের প্রতি এজিদের মোহ, এ সমস্ত ব্যাপারগুলি যদিও লেখক অনুমোদন করেন না, তথাপি এই সমস্যাগুলিকে লেখক মানবিক সমস্যা বলে বিবেচনা করেন। এই সমস্ত মানবীয় সমস্যাগুলির প্রতি যদিও তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে সচেতন অথচ নীতিবাদী হিসাবে এগুলিকে তিনি সমর্থন করেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মশাররফের 'বিষাদ সিন্ধু' ভাষা ও রচনা-রীতির দিক থেকে অথবা চরিত্র অঙ্কনের দিক থেকে একটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা। মুসলমান সাহিত্যিক রচিত এটিই প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশদত্ত প্রমুখ হিন্দু লেখক কর্তৃক রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাথমিক যুগের ধারায় মশাররফেরও একটি স্থান রয়েছে। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, মশাররফ তাঁর পূর্বসূরীদের নিকট ঋণী, কিন্তু এ-ও সত্য যে, তাঁর রচনা মানের দিক থেকে তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার সঙ্গে বিনা দ্বিধায় তুলনীয়।

এই উপন্যাসে এবং তাঁর অন্যান্য সমাজ বিষয়ক রচনায় তাঁর চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ থেকে। 'জায়েদা' চরিত্রের উদাহরণই ধরা যাক। উপন্যাসের প্রথমে সে এক সাধ্বী রমণী। কিন্তু তারপর ক্রমশঃ ঈর্ষা তাকে গ্রাস করে ফেলে এবং কাহিনীর শেষে সে একটি দুষ্টা নারীতে পরিণত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত যেমন ভারতের ইতিহাস বা কিংবদন্তী বা টড লিখিত 'Annals of Western Rajosthan' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তেমনি মশাররফও ইসলামের ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'

মারাঠাদের কাহিনী থেকে সংগৃহীত। মহারাষ্ট্র-প্রধান বীর শিবাজী এই কাহিনীর নায়ক, আর নায়িকা হচ্ছেন সম্রাট আওরঙ্গজেব দুহিতা। ইংরেজ লেখক কণ্টার কর্তৃক বর্ণিত শিবাজীর কাহিনী থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তবে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র দ্বিতীয়ার্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মৌলিকতা প্রদর্শনে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। রমেশচন্দ্র তাঁর বর্ণিত চরিত্রের অন্তর্জগতের সংবাদ সরবরাহের চাইতে ঐতিহাসিক তথ্যাদির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ অপেক্ষা বহির্দ্বন্দ্বের বিবৃতি প্রদানে তিনি অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তুলনামূলকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ অধিকতর উন্নত ও সার্থক। ইতিহাসের পটভূমিকা থেকে আহরিত ও সৃষ্ট বঙ্কিমের চরিত্রগুলো অধিকতর বিশ্বাস্য ও স্বাভাবিক। মশাররফও তাঁর ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা বর্ণনায় সমান দক্ষ ছিলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন না করেও মশাররফ জীবন্ত নর-নারীর আলেখ্য তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মশাররফ ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না বা স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে করা যায় না। মশাররফের একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস মুসলিম জীবন নিয়েই রচিত। মশাররফের 'বসন্তকুমারী নাটকে'র সব চরিত্রই অমুসলমান। উক্ত নাটকের চরিত্রগুলি সৎ কিংবা অসৎ নারী বা পুরুষ হিসাবে সৃষ্ট হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর কাছে তারা হিন্দু বা অমুসলমান সে কথা তুচ্ছ। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে যেখানে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত সমাজের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে হাকিম সাহেব একজন অসৎ ব্যক্তি, দুর্নীতিপরায়ণ এবং কুচক্রী; তিনি হিন্দু বলে অসৎ নন। মশাররফের রচনায় এমন কোন প্রমাণ নাই যার দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারে। 'গাজী মিঁয়ার বস্তানী'তে তিনি উভয় সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে রচিত উপন্যাসে এমন উপাদান আছে যাতে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কে বিভেদের ফাটল-রেখা দেখা দিতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্পর্কে মশাররফের যে একটি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

ভাষার ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের যে দ্বন্দ্ব, মশাররফ সে বিতর্কের উর্ধ্বে ছিলেন। সাধু ভাষার লেখক পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষা থেকে প্রচলিত আরবী-

ফার্সী শব্দ বিতাড়িত ক'রে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বা বাগ্বিধি প্রবর্তনের প্রয়াস পান, অন্যদিকে বটতলার মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত পুথির মুসলমান লেখকেরা অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক উর্দু-ফার্সী-আরবী ভাষার এক 'জগাখিচুড়ী' ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সমালোচকেরা পরে এ ভাষাকে 'দোভাষী' পুথির ভাষা নামকরণে বিশেষিত করেছেন। 'আলালের ঘরের দুলালে' প্যারীচাঁদ মিত্র ঠকচাচা কর্তৃক ব্যবহৃত এই আরবী-ফার্সী-উর্দুর মিশ্রিত বাংলা ভাষাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। যখন একদিকে গোঁড়া হিন্দু লেখকগণ 'হিন্দু বাংলা' লিখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অন্যদিকে মুসলমানেরা 'মুসলমানী বাংলা' লিখতে ততোধিক দৃঢ়সংকল্প। সেই সময় মশাররফ এক সরল সহজ বাংলায় গদ্য রচনা শুরু করেন, এই রীতিকে 'সরল সাধু ভাষা' নামে অভিহিত করা যায়। বাংলায় যেমন প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এই 'সরল সাধু ভাষা'য়ও তেমনি সংস্কৃত তৎসম শব্দ বিনা দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়েছে।

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে মশাররফের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে তাঁর সহজ-সাবলীল এবং মধুর রীতির জন্য, জীবন্ত নারী-পুরুষের চরিত্র সৃষ্টির জন্য, বর্ণনা ও বিবৃতির জীবন্ত রূপের জন্য, 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে অতি আবেগের সঙ্গে কারবালার করুণ কাহিনী রূপায়ণে দক্ষতার জন্য, হিন্দু-মুসলমান চরিত্রের পক্ষপাত বিহীন রূপায়ণের জন্য, এবং তাঁর যথোচিত ন্যায়-নীতিবোধের জন্য।

গদ্য-রচয়িতা হিসাবে কৃতিত্বের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখি, পরবর্তী অনেক লেখক মশাররফের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রভাবের দুইটি দিক রয়েছে : এক বিষয়গত, দুই রচনাশৈলীগত। 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকে গ্রন্থ রচনা করেন। উনিশ শতকের শেষে অনেক লেখক, কবিদের জীবনী, সাধু সন্তের কাহিনী এবং হজরত মোহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের কাহিনী নিয়ে অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেন।[৮]

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মোজাম্মেল হকের 'ফেরদৌসী চরিত' হচ্ছে 'শাহনামা' রচয়িতা পারস্যদেশীয় কবি ফেরদৌসীর জীবন-কাহিনী। বাগদাদের সাধক 'মনসুর আনাল হক'-এর জীবন নিয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থ হচ্ছে 'মহর্ষি মনসুর'। কবি কায়কোবাদ কাব্যাকারে কারবালার কাহিনী নিয়ে 'মহরম শরীফ' রচনা করেন। কারবালার ঘটনা নিয়ে লেখা 'বিষাদ সিন্ধু' বা অনুরূপ সাহিত্যিক রচনায় যে সমস্ত অনৈতিহাসিক উপাদান রয়েছে, তা বর্জন করাই ছিল

কায়কোবাদের লক্ষ্য। হামিদ আলীও কারবালার ঘটনা নিয়ে রচনা করেন 'কাসেমবধ কাব্য' ও 'জয়নাল উদ্ধার কাব্য'। ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেন 'মহাশিক্ষা কাব্য' এবং ফজলুর রহিম চৌধুরী লিখেন 'মহরম চিত্র'। আরও পরবর্তীকালে গদ্যে গিরীশ সেন লেখেন 'এমাম হাসান ও হোসেনের জীবনী', লুৎফর রহমান রচনা করেন 'ছেলেদের কারবালা' এবং আবদুর রশীদ লেখেন 'কারবালা'।[৯] উপরের সব লেখকই অল্পবিস্তর মীর মশাররফ হোসেনের নিকট ঋণী।

তথ্য নির্দেশ

[১] নাটকটি মূলতঃ পদ্যে লেখা।

[২] জি. সি. গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস' ও তারকচন্দ্র চূড়ামণি রচিত 'সপত্নী নাটক' যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'কীর্তি-বিলাস' গদ্য ও পদ্যে মিশ্ররীতিতে রচিত।

[৩] ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

[৪] ঢাকা থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণে লেখক বা প্রকাশকের নাম ছিল না। ভূমিকা লিখেছেন 'কস্যচিৎ পথিক'।

[৫] বলা হয়ে থাকে, মধুসূদন দত্ত এ নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন।

[৬] "it gained an almost international reputation no so much on account of its intrinsic merit as for the heart-rending pathos of the story and its implication." P. R. Sen, *Western Influence in Bengali Literature*, 2nd ed., Culcatta, 1947, p. 167.

[৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

[৮] প্রসিদ্ধ লেখক হলেনঃ শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৪৬); দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭); এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৮); রেয়াজউদ্দিন (১৮৫৯-১৯১৯); মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০); মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩); গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০); কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)।

[৯] 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', হাই ও আহসান, পৃঃ ২৫৪, ১৩৯, ১৬০ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

গ্রন্থপঞ্জী

(১) প্রাথমিক গ্রন্থাদি : মূল গ্রন্থ

মীর মশাররফ হোসেন : 'আমার জীবনী', ১২ খণ্ড (১১ ও ১২ খণ্ড একত্রে প্রকাশিত), প্রথম খণ্ড প্রকাশকাল ১লা আশ্বিন, ১৩১৫, মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা ৩৬, গোরাচাঁদ রোড, এণ্টালী কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। শেষ খণ্ড প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩১৬ (১৯১০)।

: 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', ১২৯৭ (১৮৯০), কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া থেকে মীর মাহতাব আলী কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৪৬ নং পঞ্চানন তলা ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

: 'এসলামের জয়', কলিকাতা, ১৯০৮।

: 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', প্রথম অংশ, প্রকাশক M. U. Ahmed, কলিকাতা উইলিয়াম্‌স্ লেন ৪নং ভবনস্থ দাস যন্ত্রে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত (১৮৯৯)।

: 'গো-জীবন', কলিকাতা, ১৮৮৯।

: 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু', প্রকাশক শ্রী আজিজদ্দীন মহম্মদ পাব্বনন্দ আলী, মাগুরা, পৌষ, ১২৭৯ (১৮৭২)।

: 'জমীদার দর্পণ', ১২৭৯। কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া। কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রে রামসর্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

: 'বসন্তকুমারী নাটক', কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া, ১৫ মাঘ, ১২৭৯। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, ১৪৯ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

: 'বাজিমাত', ডিসেম্বর, ১৯০৮, কলিকাতা।

: 'বিবি কুলসুম', কলিকাতা, ১৯১০, চৈত্র, ১৩১৬।

ঃ 'বিবি খোদেজার বিবাহ', কলিকাতা, ১৩১২, ২৫নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত। মীর এব্রাহিম হোসেন দ্বারা প্রকাশিত।

ঃ 'বিষাদ সিন্ধু', মহরম পর্ব, ১৮৮৫। আইন উদ্দীন বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত। করিন্থিয়ান প্রেস, ৩৩, নূতন চীনা বাজার, কলিকাতা থেকে ডি. সি. দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

ঃ 'উদ্ধার পর্ব', ময়মনসিংহ, ১৮৮৭।

ঃ 'বিষাদ সিন্ধু', একত্রে তিন পর্ব (মহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদবধ পর্ব), পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৫। অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯। একবিংশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯২৫। ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩১।

ঃ 'মদিনার গৌরব', ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৬। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২০ (১৯১৩), কলিকাতা, ২৫/এ, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রী মিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ঃ 'মোস্লেম বীরত্ব', কলিকাতা (১৯০৭), ১৫৯ কড়েয়া রোড, রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত। এম. এব্রাহিম এ্যাণ্ড কোম্পানীর দ্বারা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত।

ঃ 'মৌলুদ শরীফ ও খোতবা', ১ম সংস্করণ, ১৯০৩। চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৫৯, কড়েয়া রোড, রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত। ২৫ নং ডাক্তার করম হোসেন লেন হইতে শ্রী মীর আশরাফ হোসেন দ্বারা ১৩১৯ (১৯১২) সনে প্রকাশিত।

ঃ 'রত্নবতী', কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া, ১৮৬৯ (১২৭৫)। কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে, ১৪৯, মানিকতলা স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত। (New Bengal Press, Calcutta).

ঃ 'হজরত বেলালের জীবনী', কলিকাতা (১৯০৫), ১৫৯. কড়েয়া রোড, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত। কলিকাতা টালিগঞ্জ থেকে মীর এব্রাহিম হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত।

(২) অন্যান্য গ্রন্থ

আজিমুদ্দিন শেখ ঃ 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে', কলিকাতা, ১৮৬৭।

আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৪।

আলি, আমীর : *A Short History of the Saracens*, London, 1916.

আহমদ, শেখ রেয়াজুদ্দিন : 'আরব জাতির ইতিহাস', ২য় খণ্ড, রংপুর ১৯১০।

ইলিয়ট, টি. এস. : *Selected Essays*, London, 1958.

ইবন খালদুন : (অনুবাদ F. Rosenthal), *The Muqaddimah*, London, 1958.

ইসলাম, মযহারুল : 'কবি হেয়াত মামুদ', রাজশাহী, ১৯৬১।

এয়াকুব, মুন্সী : 'জঙ্গনামার পুথি', কলিকাতা, ১৮৬৭।

ওদুদ, কাজী আবদুল : 'শাশ্বত বঙ্গ', কলিকাতা, ১৯৪৮।

: 'বাংলার জাগরণ', কলিকাতা, ১৯৫৬।

ওয়েস্টল্যাণ্ড, জে. : *Jessore District*, Calcutta 1871.

কমিশারিয়াট, এম. এস. : *A History of Gujrat*, Bombay, 1938.

ক্যাম্বেল, সি. : *Memoirs of my Indian Career*, London, 1893.

কেরী, ডাব্লু. এইচ. : *The Good Old Days of the Hon'ble John Company*, 3 vols., Edinburgh, 1882-87.

ক্লার্ক, টি. ডাব্লু. : *The Language of Calcutta* (1760-1840).

: *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London, 1956.

গুপ্ত, বিপিন বিহারী : 'পুরাতন প্রসঙ্গ', কলিকাতা ১৯১৩।

গুহঠাকুরতা, পি. : *The Bengali Drama, its Origin and Development*, London 1930.

গ্রিম্‌স্‌ডিচ, এইচ. বি. (Grimsdithch) : *Character and Environment in the Novels of Thomas Hardy*, London, 1925.

ঘোষ, জে. সি. : *Bengali Literature*, London, 1948.

ঘোষ, লোকনাথ : *Modern History of Indian Chiefs, Rajas and Zamindars*, Calcutta 1879-81.

চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম : 'চণ্ডীমঙ্গল' (দীনেশ সেন সম্পাদিত), কলিকাতা ১৯২৬।

চক্রবর্তী, বিহারীলাল : 'গ্রন্থাবলী' (সম্পাদনা—অবিনাশ চক্রবর্তী), কলিকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : 'গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯৩৯।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : *The Origin and Development of Bengali Languge*, Calcutta 1926.

চূড়ামণি, তারকচন্দ্র : 'সপত্নী নাটক', কলিকাতা, ১৮৫৭।

চৌধুরী, আবদুল লতিফ : 'মীর মশাররফ হোসেন', সিলেট, ১৯৫২।

চৌধুরী, নীরদ : *The Autobiography of an unknown Indian*, London, 1951.

চৌধুরী, মুনীর : 'মীর মানস', ঢাকা ১৯৬৫।

চৌধুরী, এস. বি. : *Civil Rebellion in the Indian Mutinies* (1857-59), Calcutta, 1957.

জমিরুদ্দিন, শেখ মোহাম্মদ : 'মেহের চরিত', কলিকাতা, ১৯০৯।

জেঙ্কিন্‌স্‌, এলিজাবেথ : *Henry Fielding*, London, 1947.

টড, জেম্‌স্‌ : *Annals and Antiquities of Rajosthan*, 2 vol., London, 1829.

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ : 'স্বরচিত জীবন চরিত', কলিকাতা ১৮৯৮।

দত্ত, বিজিতকুমার : 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', কলিকাতা ১৯৬৩।

দত্ত, মধুসূদন : 'গ্রন্থাবলী', কলিকাতা ১৯০৪।

দাসগুপ্ত, শশীভূষণ : 'বাংলা সাহিত্যের এক দিক', কলিকাতা, ১৯৬০ (তৃতীয় সংস্করণ)।

দাস, শ্রীশচন্দ্র : 'সাহিত্য সন্দর্শন', কলিকাতা, ১৯৫৭।

দে, অধীর : 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা', কলিকাতা, ১৯৬২।

দে, সুশীলকুমার : 'বাংলা প্রবাদ', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫২।

: *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetics*, Loz Angeles, 1963.

: *Bengali Literature in the 19th Century*, 2nd ed., Calcutta, 1962.

নামদার, মুন্সী : 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প', কলিকাতা, ১৮৬৩।

: 'দুই সতীনের ঝগড়া', কলিকাতা, ১৮৬৮।

: 'কলির বউ হাড়জ্বালানী', কলিকাতা, ১৮৬৮।

: 'কলির বউ ঘরভাঙ্গানী', কলিকাতা, ১৮৬৯।

: 'ননদ ভাজের ঝগড়া' ও 'বাঞ্ছারামের গল্প', কলিকাতা, ১৮৬৭ ; চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৬৮।

: 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা', কলিকাতা, ১৮৬৭।

: 'মনোহর ফেঁসেড়া', কলিকাতা, ১৮৬৮।

: 'নারীর ষোলকলা' ও 'খেলারামের গীত', কলিকাতা, ১৮৬৮।

: 'নূতন ঝড়', কলিকাতা, ১৮৬৭।

: 'খেদের গান', কলিকাতা, ১৮৬৮।

নিকল, এ. : *The Theory of Drama*, London, 1931.

নিকলসন, আর. এ. : *A Literary History of the Arabs*, Cambridge, 1930.

নীল্ড, জোনাথান : *A Guide to the best Historical Novels and Tales*, 5th ed., London, 1929.

পোদ্দার, অরবিন্দ : 'বঙ্কিম মানস', কলিকাতা, ১৯৫১।

ফিলিপ্স, সি. এইচ. : (সম্পাদিত), *Historians of India, Pakistan and Ceylon*, London, 1961.

বসু, অনাদিনাথ : 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ', কলিকাতা, ১৯২০।

: (সম্পাদিত), *Adam's Report on Education*, Calcutta University, 1941.

বসু, সোমেন : 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', কলিকাতা, ১৯৫৬।

বসু, রাজনারায়ণ : 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', কলিকাতা, ১৮৭৮।

বসু, রাজশেখর : (অনুবাদ), 'মহাভারত', কলিকাতা, ১৯৬২।

বসু, শুদ্ধসত্ত্ব : 'অলংকার জিজ্ঞাসা', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ : 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত', কলিকাতা, ১৯০৫।

বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ : 'কারবালা', ঢাকা, ১৯৫৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ৮ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪০-১৯৫২।

: 'মীর মশাররফ হোসেন', কলিকাতা, ১৯৪৩।

: 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৫।

: 'বাংলা সাময়িক পত্র', (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৩৯, ১৯৫২।

: 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ১৯৩২ ; ২য় খণ্ড, ১৯৩৩ ; ৩য় খণ্ড, ১৯৩৫, কলিকাতা।

: 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৩৩।

বন্দোপাধ্যায়, শ্রী কুমার : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২।

বাকল্যাণ্ড, চার্লস এডওয়ার্ড : *Bengal Under the Lieutenant Governors*, 2 vols., Calcutta, 1901.

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র : 'গ্রন্থাবলী', (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৩৮।

বিশি, প্রমথনাথ (ও বিজিতকুমার দত্ত) : সম্পাদিত, 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫।

ব্রাউন, ই. জি. : *A Literary History of Persia*, vol. 1 & 2, London, 1919, 1920.

: *A History of Persian Literature*, vol. 3 & 4, Cambridge, 1920, 1924.

ব্রাউন, জোসেফ ই. : *The Critical Opinions of Samuel Johnson*, New York, 1961.

ব্রাডলি, এ. সি. : *Shakespearian Tragedy*, 2nd ed., reprint, London, 1908.

ব্রুকস, সি. ও হাইলম্যান, আর. বি. : *Understanding Drama*, London, 1946.

বুকানন, ফ্রান্সিস : *An Account of the District of Bhagalpore in 1810-11*, Patna, 1839.

ভট্টাচার্য, আশুতোষ : 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', ২ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০।

: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮।

: 'বাংলার লোকসাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৭।

: 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন', কলিকাতা, ১৯৬৪।

ভট্টাচার্য, সাধনকুমার : 'এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব', কলিকাতা, ১৯৫৬।

মজুমদার, কেদারনাথ : 'ময়মনসিংহের বিবরণ', কলিকাতা, ১৯০৪।

: দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৭।

মজুমদার, মোহিতলাল : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৫১।

: 'সাহিত্য কথা', কলিকাতা, ১৯৩৮।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র : (সম্পাদিত), *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Pt. I, Bombay, 1963.

মনসুরুদ্দিন, মুহম্মদ : 'হারামণি', ঢাকা, ১৯৫৯।

মল্লিক, কুমুদনাথ : 'নদীয়া কাহিনী', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯১২।

: 'সতীদাহ', কলিকাতা, ১৯১৪।

মান্নান, কাজী আবদুল : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', রাজশাহী, ১৯৬১।

মার্শম্যান, জে. সি. : *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, 2 vols., London, 1859.

ম্যাথুজ, বি. : *Shakespeare*, London, 1917.

ম্যাকডোনেল, এ. এ. : *A History of Sanskrit Literature*, London, 1900.

মিত্র, দীনবন্ধু : 'নীলদর্পণ', ঢাকা, ১৮৬০।

: 'গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, ১৯০৯।

মিত্র, হরপ্রসাদ : 'বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ', কলিকাতা, ১৯৬৩।

মিত্র, প্যারীচাঁদ : 'আলালের ঘরের দুলাল', কলিকাতা, ১৮৫৭।

মিত্র, সতীশচন্দ্র : 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪।

মিত্র, শিবরতন : 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক', কলিকাতা, ১৯০৮।

মুইর, ডাবলু. : *The Caliphate*, London, 1912.

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৬৫।

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব : 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', হুগলী, ১৮৬২।

মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন : 'বঙ্গভাষার লেখক', কলিকাতা, ১৯০৫।

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন : 'কলিকাতা সেকালের ও একালের', কলিকাতা, ১৯১৫।

মুহম্মদ, কাজী দীন : 'সাহিত্য সম্ভার', ঢাকা, ১৯৬৫।

মুলেন্স, হানা কাথারিন : 'ফুলমণি ও করুণার কাহিনী', কলিকাতা, ১৮৫২।

– মোস্তফা, গোলাম : 'আমার চিন্তাধারা', ঢাকা, ১৯৬১।

মৌলিক, অক্ষয়কুমার : 'আটিয়া পরগণার ইতিহাস', ঢাকা, ১৯১৭।

রায়, অন্নদাশঙ্কর ও লীলা : *Bengali Literature*, Bombay, 1942.

রায়, চৌধুরী সতীশচন্দ্র : 'বঙ্গীয় সমাজ', কলিকাতা, ১৮৯৯।

রায়, রামমোহন : 'গ্রন্থাবলী', কলিকাতা, ১৯০৫।

রাব্বি, কে. এম. : *The Origins of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895.

রায়ল্যাণ্ডস, জি. এইচ. ডাবলু : *Words and Poetry*, London, 1928.

রিচার্ডস, আই. এ. : *Principles of Literary Criticism*, London, 1960.

রীড, হার্বার্ট : *English Prose Style*, London, 1949.

সমাদ্দার, যোগীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য পঞ্জিকা', কলিকাতা, ১৯১৫।

সাকসেনা, রামবাবু : *A History of Urdu Literature*, Allahabad, 1927.

শাহা, রাধারমন : 'পাবনা জেলার ইতিহাস', ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৭-১৮।

সিদ্দিকী, খন্দকার সামসুদ্দিন : 'উচিৎ শ্রবণ', কলিকাতা, ১৮৬০।

সেন, জলধর : 'কাঙ্গাল হরিণাথ', ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১৪।

সেন, দীনেশচন্দ্র : *A History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911.

: 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯২৮।

: *Eastern Bengal Ballads*, Calcutta.

: 'ময়মনসিংহ গীতিকা', কলিকাতা, ১৯২৩।

সেন, নবীনচন্দ্র : 'আমার জীবন', ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৮-১৩।

সেন, প্রিয়রঞ্জন : *Western Influence in Bengali Literature*, Calcutta, 1947.

সেন, শশাঙ্ক মোহন : 'মধুসূদন', ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৯।

সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৪ খণ্ড।

: ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪৮।

: ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬২।

: ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২।

: ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮।

: 'ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য', বর্ধমান, ১৯৫৭।

সেনগুপ্ত, অর্পণাপ্রসাদ : 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস', কলিকাতা, ১৯৬০।

সেনগুপ্ত, প্রমোদ : 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ', কলিকাতা, ১৯৬১।

সেণ্টস্‌ব্যারি, জি. : *A History of English Criticism*, London, 1962.

সিংহ, কালীপ্রসন্ন : 'হুতোম পঁ্যাচার নকশা', কলিকাতা, ১৮৬০।

সাইক্‌স্‌, স্যার পারসি : *The History of Persia*, London, 1958.

শরীফ, আহমদ : (সম্পাদিত), 'পুঁথি পরিচিতি', ঢাকা, ১৮৬০।

শর্মা, প্রমথনাথ : 'নববাবু বিলাস', কলিকাতা, ১৮২৮।

শিকদার, তারাচরণ : 'ভদ্রার্জুন', কলিকাতা, ১৮৫২।

লতিফ, (নওয়াব) আবদুল : *The Hoogly Madrasa*, Calcutta, 1860.

লং, রেভারেণ্ড জে. : *Evidence Explanatory of the Indigo System in Lower Bengal*, Calcutta, 1860.

লোয়েনথাল, লিও : *Literature and the Image of Man*, Bostan, 1957.

যাভিতাল, দুসান (Zbavital Dusan) : *Bengali Folktales from Mymensingh*, Calcutta, 1967.

হক, মুহম্মদ এনামুল : 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৫৭।

: *Muslim Bengali Literature*, Karachi, 1957

: 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম', ঢাকা, ১৯৪৯।

হক, মোজাম্মেল : ফেরদৌসী চরিত', কলিকাতা, ১৮৯৮।

: 'মহর্ষি মনসুর', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৮।

হ্যামিল্টন, সি. : (অনূদিত), *The Hedaya, Commentary on the Musalman Laws*, 2nd ed., London, 1870.

হাই, মুহম্মদ আবদুল ও
আহসান, সৈয়দ আলী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৬, ২য় সং, ১৯৬৪।

হাণ্টার, ডাব্লু ডাব্লু : *The Indian Musalmans*, London, 1871.

হাডসন, ডাব্লু. এইচ. ঃ *An Introduction of the Study of Literature*, 2nd ed., London, 1927.

হিট্টি, পি. কে. ঃ *History of the Arabs*, 6th ed., London, 1958.

হোসেন, গোলাম ঃ 'কলির বউ হারজ্বালানী', কলিকাতা, ১৮৬৭।

হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াৎ ঃ 'মতিচুর', কলিকাতা, ১৯০৫।

হোসেন, এস. এস. ঃ (অনূদিত), *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts*, Dacca, 1960.

২। সাময়িক পত্র

'ইসলাম দর্শন', কলিকাতা, ১৯১৯, ১৯২১।

Imperial Gazetteer of India, New Edition, Oxford, 1908.

The Englishman, Culcatta, May, 1885.

The District Gazetteer, Nadia, 1910, Jessore.

The Calcutta Review, Calcutta, 1858, 1860, 1870.

Journal of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1874.

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', কুমারখালী, ১৮৬৫।

'বান্ধব', ঢাকা, ১৮৭৬।

'বঙ্গদর্শন', কলিকাতা, ১৮৭৩-৭৪।

'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ঢাকা, ১৯৫৭, ৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬১, ৬৩।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', কলিকাতা, ১৯১৯।

Bombay Gazetteer, vol. 1.

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London, 1956, 59.

'তত্ত্ববোধনী পত্রিকা', কলিকাতা, ১৮৫৮।

'মাহেনও', ঢাকা, ১৯৬০।

Muhamedan Literary Society, A resume, Calcutta, 1885.

'মোসলেম ভারত', কলিকাতা, ১৯২৬।

Moslem Chronicle, Calcutta, 1895.

'সম্বাদ প্রভাকর', কলিকাতা, ১৮৬৫।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', কলিকাতা, ১৯০৮, ১৯২১।

'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ৬০, ৬২।

The Statesman and Friend of India, Calcutta, 1885.

The Hindoo Patriot, Calcutta, 1860, 84, 85, 88.

৩। হস্তলিখিত দলিল, রেকর্ড, পাণ্ডুলিপি, গবেষণা, নিবন্ধ ইত্যাদি

আলী, মোহাম্মদ মোহর : *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. থিসিস, ১৯৬৩।

এডাম, উইলিয়াম : *State of Education in Bengal*, Calcutta, 1835-38.

: *Education in India : A Collection of Despatches*, 1854-58.

: *Education of Mahomedan Community*, Calcutta, 1886.

: *Indian Education Commission Report*, 1882-83.

: *The Indigo Commission Report*, Calcutta, 1860.

: *Papers Relating to the Cultivation of Indigo*, 1860.

: *Papers Relating to the Dispute between Planters and Ryots of Lower Bengal*, Calcutta, 1860.

: *The Encyclopedia of Islam*, 4 volumes, Ed. A. Houtsma and others, London, 1913-36.

: *Shorter Encyclopedia of Islam*, H. A. R. Gibb & J. H. Kramers, Lieden, London, 1953.

: *A Dictionary of Islam*, T. P. Hughes, London, 1885.

: *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Hans Wehr, ed. by J. M. Cowen, Wissbaden, 1961.

: *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English*, J. T. Platts, London, 1884.

Gastrell, J. E. : *Geographical & Statistical Report of the Jessore, Faridpore, Backerganj District*, Calcutta, 1868.

চট্টোপাধ্যায়, এ. কে. : *Slavery in the Bengal Presidency under East India Company Rule*, 1772-1843, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪ সালের Ph. D. থিসিস।

গিডিয়ন, জি. এস. : *The Ashura Ceremonies in Lebanon*, Ph. D. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

করিম, এ. কে. এন. : *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, Ph. D. Thesis, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

দাস, এস. কে. : *Early Bengali Prose*, Carey to Vidyasagar Ph. D. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪ (পরে মুদ্রিত)।

মল্লিক, এ. আর. : *The Development of the Muslims of Bengal and Bihar* (1813-56), Ph. D. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩।

মান্নান, কাজী আবদুল : *The Emergence and Development of Dobhasi Literature in Bengal*, Ph. D. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

মুখোপাধ্যায়, টি. : *Brajabuli Literture, its Content &*

Language, Ph. D. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

রহমান, এম. এফ, : *The Bengali Muslims and English Education*, এম. এ. থিসিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।

A Glossary of Judicial and Revenue terms of British India, M. H. Wilson, London, 1855.

Selections from the Records of Government of India, Bengal, Calcutta, 1860.

Suttees in 1821, (হস্তলিখিত দলিল), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

Private Letters : From Canning to Wood (হস্তলিখিত পত্রাবলী), 1860.

Vernacular Education in Bengal and Bihar, J. Long, Calcutta, 1868.

পরিশিষ্ট—খ

রচনা-নিদর্শন

রত্নবতী

(প্রথম সংস্করণ, ১৮৬৯)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল। রাজপুত্রের নাম সুকুমার এবং মন্ত্রিপুত্রের নাম সুমন্ত। সুমন্ত বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা বাল্যকালাবধি যৌবন-কাল পর্যন্ত একত্রভোজন; একত্রশয়ন এবং একসঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য গতি। মনুষ্যের সৌভাগ্যশশী কখনই সমভাব থাকে না। সময়ে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার সুকুমার এবং মন্ত্রিকুমার সুমন্তের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।

একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাবৃত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন; এমন সময় রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনয় অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রাজনন্দন সুকুমার মৃদুমধুর সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সখে। বল দেখি, ধন শ্রেষ্ঠ কি বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? মন্ত্রিপুত্র হাস্য করিয়া বলিলেন, বন্ধো। ইহা আর জিজ্ঞাস্য কি? ধন অপেক্ষা বিদ্যা সহস্র অংশে শ্রেষ্ঠ। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন বিরক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, না তাহা কখনই হইতে পারে না। আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানেরা জগজ্জন মধ্যে বিশেষ গণ্য ও আদরণীয় হন। তাঁহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তা-জ্বরে জর্জরীভূত হন না, বিপদেও চিত্তসুখ সম্ভোগ করিয়া নিশ্চিন্তে কাল-যাপন করেন। এমনকি তিলার্ধকালের জন্যও দুঃখিত থাকেন না। নির্ধন ব্যক্তি যতই কেন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হউক না, তাহাদিগকে চিরদিন ধনী-দিগের পদানত ভৃত্য থাকিতে হয়। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, ধনহীন

ব্যক্তির জন্মই বৃথা। ধনীরা বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে ধন দ্বারা নিরাপদ করিয়া আশ্রয়প্রদান করিতে সমর্থ হন। পরিবারদিগকে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করেন এবং সমুদয় ধর্মই তাঁহাদের আয়ত্তে থাকে। সুতরাং ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুমন্ত অতি বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য; সুতরাং রাজনন্দনের এই অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, বন্ধো। পরম কারুণিক পরমেশ্ব. যে সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়া মানবকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, বিদ্যা ভিন্ন তাহা পরিমার্জিত হয় না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যেরা সকল প্রকার জীবজন্তুর উপর একাধিপত্য স্থাপন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাও বিদ্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই। আপনি কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিদ্যা দ্বারা সকল কার্যই সাধিত হইতে পারে। অভাবনীয় ও আশ্চর্য আশ্চর্য কার্যসমূহ কেবল বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। যে কার্য বিদ্যাহীন লোক প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াও সমাধা করিতে পারে না, তাহা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সাধন করিয়া আপামর সাধারণের হিত সাধন করেন। মিত্র! বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিত্তসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। ধনীদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই অসুখী; কেননা, তাঁহারা কুসংস্কারের ক্রীতদাস। সামান্য বিষয়েই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হন। আপনি কি বিবেচনায় বিদ্যা অপেক্ষা ধনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন বুঝিতে পারি না। বোধ হয় প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

আপন সিদ্ধান্তের বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সক্রোধ লোচনে বলিলেন, কি বৃথা তর্কবিতর্ক করিতেছ? আমি চিরকালই জানি; তুমি আমার বাক্য খণ্ডন করিতে সাধ্যমত ত্রুটি কর না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে পৃথিবীর কেহই আমার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি নিস্তব্ধ হও; ধনই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুমন্ত কহিলেন, যুবরাজ। অকারণ ক্রোধ করেন কেন। এ তর্কের মীমাংসা স্বদেশে হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দেশ উভয়েরই সম্বন্ধশূন্য এবং যে দেশ উভয়েরই অপরিচিত এমন এক দেশে গমন করা যাউক, তাহা হইলে দেখা যাইবে ধন দ্বারাই বা কি কার্য সিদ্ধ হয় এবং বিদ্যা দ্বারাই বা কি কর্ম সম্পন্ন হয়। রাজকুমার তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর ভিন্ন দেশে গমন করাই স্থির হইল। সেইদিনই রাজনন্দন পশ্চিমাভিমুখে এবং মন্ত্রিনন্দন পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজনন্দন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বন পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহকাল নিবিড় বন পর্যটন করিয়া এক দিবস প্রভাকরের প্রখর কিরণে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও জলপ্রাপ্ত হইলেন না। একে মার্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর, আমি আপন দোষে আপনি বিপদে পড়িয়াছি; ঘোরতব পিপাসা আমার জীবননাশিনী হইয়াছে, আর সহ্য হয় না। এই তৃষ্ণার্ত নরাধম সন্তানের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ জীবনদানে জীবন রক্ষা করুন। রাজপুত্র এবম্প্রকার আক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর অতি কষ্টে গমন করিয়া হঠাৎ এক মনোহর উদ্যান-মধ্যস্থিত একটি সুরম্য সরোবর দৃষ্ট হইলে রাজকুমার ত্রস্তভাবে তাহার তটবর্তী হইলেন। রাজপুত্রের পিপাসা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি আর এক আশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই জলাশয়ের সোপানপার্শ্বে একটি কপিবর তপস্বী বেশে করে অক্ষমালা ধারণ করিয়া নয়ন মুদিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিল। যুবরাজ বঙ্কিমচক্ষে তাহাকে দর্শন করিতে করিতে সরোবরে অবরোহণপূর্বক হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদভ্রষ্ট একবিন্দু বারি কপিবেশধারী তপস্বীর গাত্রে পতিত হইবা মাত্র কপিদেহ পরিবর্তন হইয়া মনুষ্যদেহ হইল। তখন তিনি অতি ভয়াবহ গভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন, ওরে নরাধম পাপীষ্ঠ [মুদ্রণপ্রমাদ—শুদ্ধ বানান—পাপিষ্ঠ] কে তুই? তুই কি জন্য আমার সমাধি ভঙ্গ করিলি? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, প্রতিফল প্রদান করিতেছি। রাজনন্দন সুকুমার তাঁহার তর্জনে কম্পিত কলেবর হইয়া কহিলেন, হে তাপস শ্রেষ্ঠ! আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিন্দু আপনার গাত্রে পতিত হইয়াছে। অতএব কৃপা করিয়া আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি বহু সহ্য করিয়া ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। রাজতনয়ের এবম্ভূত সকাতর স্তুতিবাক্যে তপস্বী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, তুমি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কি নিমিত্ত এই তরুণবয়সে বন পর্যটন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছ? সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর, শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। রাজনন্দন আত্মবিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। উদাসীন হাস্য করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন

করিয়া রহিলেন। সুকুমার কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া আপন করস্থিত অ'রীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন। কহিলেন, বৎস এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। ইহার নিকট তুমি যখন যাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তুমি এই অরণ্যানীর উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব প্রদেশ পরিভ্রমণ করিও; পশ্চিম প্রদেশে কদাচ গমন করিও না। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। সুকুমার অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীর পদচুম্বনপূর্বক পুনরায় স্তব করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে বিদায় করিয়া পূর্ববৎ বানরাকৃতি হইয়া আপন ইষ্ট দেবতাতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজনন্দন আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন।

পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর এই তিনদিক ভ্রমণ করিয়া রাজকুমার চিন্তা করিলেন, যোগী পশ্চিমে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কি জন্য নিষেধ করিলেন? পরে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল, পশ্চিম দিকে কোন আশ্চর্য পদার্থ থাকিতে পারে, অতএব তাহা অবলোকন করা কর্তব্য। আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা কি আছে। তপস্বীদত্ত অঙ্গুরীয়কের নিকট যাহা প্রার্থনা করিব তাহাই পাইব। এক্ষণে পশ্চিম প্রদেশেই গমন করা বিধেয়। এই ভাবিয়া তিনি একাদিক্রমে পশ্চিমাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বিংশ দিবস নানা বন উপবন ও পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে একটি অপূর্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য অভিনব বস্তু, মানবমণ্ডলী ও নগরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দেখিলেন, সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে, "এই রত্নপুর সাম্রাজ্যশ্বরের দুহিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। যিনি উক্ত সাতদিন অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিতে পরাঙমুখ হইবেন, তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিতে হইবে।"

নৃপনন্দন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য অন্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কপিরূপী তপস্বীদত্ত যে অমূল্য রত্ন আমার নিকটে আছে, তাহার সহায়তায় রাজকুমারীর অভীষ্ট সমুদায় পাণি-পীড়নে যে আমি সমর্থ হইব তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ কল্পনা-পথবর্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পার্শ্ববর্তী ডঙ্কাধ্বনি করিলেন।

তৎক্ষণাৎ কতিপয় পরম সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজনন্দনের হস্ত ধারণ-পূর্বক নৃপতি সন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল। রাজা যথোচিত সমাদরে নিকটবর্তী অপূর্ব আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। রাজনন্দন ভূপতিকে সবিনয় সম্ভাষণ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃপতি যুবরাজের ভুবন-মোহন রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন; কিন্তু আমার কন্যা কি দুর্ভাগ্যবতী, এরূপ সুকুমারের অঙ্কলক্ষী না হইয়া বরং যথাসর্বস্ব হরণপূর্বক ইহাকে বিপদে পতিত করিবে।

... ...

নৃপদুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে, সুতরাং চিত্তবারণ ধর্যাঙ্কুশেও বারণ না মানিয়া সেই পদ্মিনী গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা-সরোবরে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ। আপনকার অমৃতময় উপদেশ আমার শিরোধার্য, তথাচ এই নিবেদন করিতেছি, আমি অশেষ যাতনা সহ্য করিয়া যখন এ পর্যন্ত আসিয়াছি তখন অভিলষিত রত্ন লাভ করিতে পারিব না বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিব না। যাহা ভবিতব্যে লিখিত আছে তাহাই ঘটিবে। আমি আপনকার অনুজার মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা ইহা আপনি কিরূপে বুঝিতে পারিলেন? আমার সহিত ধনরত্ন ও রথগজ নাই বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যেহেতু সকল মনুষ্য এক ভাবের নহে। আমি যে একাকী এই অপরিচিত দূরদেশে আসিয়া শত শত রাজপুত্র যে কার্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই তাহা সিদ্ধ করিতে সাহস প্রকাশ করিতেছি ইহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনকার দুহিতার নিকট দূত প্রেরণ করুন; তাহার কি বাঞ্ছা জানিতে পারিলেই অবিলম্বে পূর্ণ করিব। রাজা সুকুমারের এই সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে গদগদ চিত্ত হইয়া সভাসদদিগকে বলিলেন, ইহার সাহস দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অনায়াসে রাজকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে কন্যার নিকটে প্রেরণ করা কর্তব্য। এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন।

ভূপতি রাজনন্দন সুকুমারকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া ভোজনাদি করাইলেন এবং তাহার বিশ্রামার্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিরূপিত করিয়া দিলেন। রাজনন্দন তথায় বিশ্রামসুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা শয়নমন্দিরে উপস্থিত

হইয়া মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে, অদ্য তরুণবয়স্ক একটি রাজপুত্র তোমার হৃদয়নন্দিনীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অতিশয় রূপবান। তাহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয়াম্বুধি আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার সহিত ধনজন মাত্র নাই। তথাচ তিনি কন্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অভূতপূর্ব সাহস প্রকাশ করিতেছেন। তুমি কন্যাকে সংবাদ প্রদান কর; আমি রাজকুমারকে এইস্থানে আনয়ন করিতেছি।

... ...

এদিকে সূর্য অস্ত হইল। নিশানাথ সহচরগণে বেষ্টিত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করিতে করিতে পূর্বদিক হইতে উদিত হইলেন। ভূপতি সমস্ত রাত্রি চঞ্চলভাবে জাগিয়া কাটাইলেন। নিদ্রা মহারাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার নেত্রাসনে উপবেশন করিলেন না। দুঃখের রজনী এত দীর্ঘ যে, কোনমতেই অবসান হইতে চাহে না। মহারাজ ক্ষণে ক্ষণে নির্দিষ্ট নক্ষত্র দর্শন করিয়া নিশার শেষ বিবেচনা করেন। কিন্তু মন কোনরূপেই সুস্থির থাকে না। একবার বোধ করেন যেন তমোনাশিনী ঊষা পূর্বদিক হইতে আগমন করিল; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। একবার বিবেচনা হয় যেন, বিহঙ্গমগণ স্ব স্ব কুলায়ে বসিয়া সুমধুর স্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিয়া উঠিল। আবার ক্ষণকালের পর সে ভাবের কিছু থাকে না। রাজা এইরূপে চঞ্চল হইতেছেন এমন সময়ে বিহগনিচয় দিনপতির আগমনবার্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল। ভূপতি বিহঙ্গমুখে এতদ্‌বার্তা শ্রবণে মহাহর্ষচিত্তে সঙ্গিগণকে বলিলেন, আর বিলম্বে কাজ নাই, রজনী শেষ হইল। ইহাদের মুক্তির চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য। এদিকে নিশাপতি আগমনকাল অতি নিকটবর্তী জানিয়া চারুবর্ণ লুক্কায়িত করিতে লাগিলেন। আগমনকাল নিকটবর্তী বটে, কিন্তু এ আগমন কাহার? দিনপতির?

রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে কমলবন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। কুমুদিনী কান্ত বিরহে মলিনী হইয়া সলিলে ডুবিল।

... ...

সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ। তোমার যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তবে যথার্থই আমারে অর্ধরাজ্য যৌতুক দিয়া রত্নবতী দান করিতে হইবে। রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী

কয়েকটি কৃত্রিম মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থ বারি প্রক্ষেপপূর্বক বানরী রাজ-কুমারীকে মানবী করিলেন। রাজা ও রাজপুরীস্থ সকলে তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। রাজপুরী আনন্দময় হইল। রাজা বাহু প্রসারণপূর্বক তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রু-ধারে তাঁহার সর্বশরীর সিক্ত করিতে লাগিলেন। রত্নবতী পূর্ববৃত্তান্ত কিছুই জানেন না; অথচ অন্তঃপুর লোকাকীর্ণ দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পিতৃক্রোড়ে মস্তক নত করিলেন। রাজা অঙ্গুলী দ্বারা কন্যার চিবুক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, বৎসে। পুনর্বার তোমারে ক্রোড়ে লইব এ আশা ছিল না। পরমেশ্বরের কৃপায়, আর এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম; এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীর দিগে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। রত্নবতী এই কথা শুনিয়া সেই ভুবনমোহন কটাক্ষ সন্ন্যাসীর দিকে একবার চোখ ফিরাইলেন। ছদ্মবেশী যোগীরূপী সুমন্ত রাজকন্যার রূপমাধুরী দর্শন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, পরমেশ্বর এই স্বর্ণ লতাটি কোন ভাগ্যবান তরুর আভরণ করিবার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন? প্রিয় বন্ধু সুকুমারের অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন। এই সৌন্দর্য সরোবরের পদ্মফুলটি আজ তাঁহার হৃদয়সরোবরে শোভা সম্পাদন করিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে কহিলেন, মহারাজ আমি বিষয়ত্যাগী যোগী, গৃহী হইতে আমার অভিলাষ নাই। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, অর্ধেক রাজ্যসহ এই কন্যারত্ন আমারে দান করিবে; কিন্তু আমি তাহা লইয়া কি করিব? আমি কহিতেছি যে, সুকুমার রাজকুমার আপনার দুহিতার জন্য সুদীর্ঘকাল কারাবাস করিলেন; তাঁহারেই দান কর। রাজা তচ্ছ্রবণে উল্লসিত হইয়া শুভদিনে শুভলগ্নে সুকুমারকে রত্নবতী দান করিলেন। নগর উৎসবময়, রাজবাটী মঙ্গলময়, এবং রাজপথ আনন্দধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এদিকে বাসরগৃহে মহিলাগণ বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ গবাক্ষদ্বারে বদনার্পণ করিয়া, কেহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা অগ্রগামিনী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ বাসন্তী তরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ওদিকে সন্ন্যাসী অমাত্যকে কহিলেন, মন্ত্রি মহারাজকে বল, আমি অদ্য রাজপুত্রের সহিত বাসরগৃহে যামিনী যাপন করিব। মন্ত্রি এই কথা রাজাকে বলিবা মাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মন্ত্রি সুকুমারের সহিত সন্ন্যাসীরে বাসরে

লইয়া গেলেন। রাজকুমার সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পূর্বাবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই সকল বিপদের কথা তখন স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বন্ধুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল। এই অবসরে সন্ন্যাসী নিজরূপ ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যবদনে সুকুমারকে কহিলেন, বয়স্য। চিনিতে পার? এখন বল দেখি, ধন বড় কি বিদ্যা বড়? যুবরাজের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই আশৈশব পরিচিত বন্ধু সুমন্ত সম্মুখে উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষবিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া সাশ্রু নয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আনন্দে তাহার মন এমনি বিহ্বল হইয়াছিল যে, পুনঃপুনঃ বন্ধু বন্ধু শব্দ উচ্চারণ করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অনিমিষ লোচনে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দৃষ্টি আর ফিরিল না। উভয়ের চিত্তে জলধি তরঙ্গের ন্যায় প্রণয়হিল্লোল বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ুপ্রতিঘাতে বেলাকে আঘাত করে, সেইরূপ তাহাদিগের দুঃখজলধি চিন্তাবায়ুর প্রতিঘাতে স্ফীত হইয়া হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল।

কন্যা-জামাতা বাসরগৃহে কিরূপ প্রেমালাপ করে পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিনী হন. তাহাতে আবাব বাসরগৃহে সন্ন্যাসী আছে, এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিবার জন্য তাহাদের কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাঁহারা গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহমধ্যে হঠাৎ সন্ন্যাসীর রূপ পরিবর্তন, জামাতার সহিত আলিঙ্গন, জামাতার ক্রন্দন এবং পরস্পরে সস্নেহে সম্ভাষণ দর্শন করিয়া বিস্ময়াকুল মনে দ্রুতপদে রাণীকে সংবাদ দিলেন। রাণী সেই ব্যাপার দর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়াই শয়নগৃহে গিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ এক অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করুন। সন্ন্যাসীকে বাসরগৃহে রাখিয়াছেন বলিয়া কন্যাগণ কেহই তথায় যান নাই। জামাতা, রত্নবতী, আর সেই সন্ন্যাসী এই তিনজনেই বাসরে আছেন, ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী যুবারূপ ধারণ করিয়াছেন। জামাতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা এই আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য বাক্য শ্রবণে অতি ব্যস্ত হইয়া বাসরগৃহাভিমুখে চলিলেন। ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী নাই, একটি দিব্য পুরুষের সহিত জামাতার কথোপকথন হইতেছে, রত্নবতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রাজা রত্নবতীকে দ্বার খুলিতে বলিলেন। রাজার স্বর শুনিয়া সুকুমার আপনিই দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ

করিয়াই "সন্ন্যাসী কোথায়? এই সুপুরুষ যুবাপুরুষ কে?" এই প্রশ্ন করিলেন। সুমন্ত নতশিরে উত্তর করিলেন, মহারাজ, আমিই সেই সন্ন্যাসী। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কহিলেন, এই আশ্চর্য ঘটনার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। সুমন্ত প্রথমে তাহাদিগের বাল্যসখ্য, উভয় বন্ধুতে তর্ক, মীমাংসার্থ দেশভ্রমণে বহির্গমন এবং কপিরূপী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ ও বরপ্রাপ্তি অবধি পরস্পর বিচ্ছেদ ও রত্নপুরে আগমন; পরিশেষে এই বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা অভিনিবেশপূর্বক এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুমন্তের বিদ্যাবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কহিলেন, বৎস সুমন্ত। তুমি বলিয়াছিলে ধনাপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, তাহা যথার্থ, তোমরাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে। এইরূপ নানা কথা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ তথায় থাকিয়া রাজা শয়নগৃহে গমন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে রাজা সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রিকন্যার সহিত সুমন্তের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। সুকুমার ও সুমন্ত কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া সস্ত্রীক স্বদেশে গমন করিলেন।

বসন্তকুমারী নাটক

(প্রথম সংস্করণ, ১৮৭৩)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় রঙ্গভূমি

পথমধ্য

(জলকলস কক্ষে সরমা এবং অন্যদিক হইতে বিমলার প্রবেশ)

সরমা। দিদি ভাল আছিস ত। আজ যে ভারী ফিটফাট। সেজেগুজে কোথা গিয়েছিলে? আবার কি দিন ফিরেছে?

বিমলা। (হাস্যমুখে) তুই যে অবাক কল্লি। দিনকাল নেই বলে কি সাধও নেই? দাঁত পড়ে, চুল পাকে কত লোকের প্রাণ যেমন তেমনই

থাকে। লোকে নিন্দা করবে বলে বুড়ীরা ছুঁড়িদের মত সাজগোজ করে না বটে, কিন্তু আশাটুকু সমানই আছে।

সরমা। দিদি। কাঞ্চনের ত কিছু হয় নাই?

বিমলা। (মস্তক বক্র করিয়া) হয়েছে।

সরমা। ক'মাস হলো?

বিমলা। এই সেদিনে সাধ খেয়েছে।

সরমা। ওমা। সেদিনের মেয়ে দেখতে দেখতে ছেলের মা হতে গেল।

বিমলা। একালে ছুঁড়ী বুড়ী কিছুই চেনা যায় না। আর এক কথা শুনেছ?

সরমা। কি কথা দিদি?

বিমলা। বলবো কি, কিছুদিন হলো, শুনেছিলেম যে, যুবরাজ নরেন্দ্রের বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, মহারাজ স্থানে স্থানে ঘটক পাঠিয়েছেন।

সরমা। হ্যাঁ, আমিও শুনেছিলেম। দিদি। যুবরাজ নরেন্দ্রের মতন আর ছেলে নেই। রাজা রাজড়ার ঘরের ছেলে যে এমন লাজুক হয় তা বোন কখনও শুনিনি। পাড়াপড়শীর মেয়েছেলে নজরে পোড়লে অমনি মাথাটি হেঁট করে চোলে যান। এতবড় হয়েছেন, তবু উঁচুনজরে কারো পানে চান না।

বিমলা। সে যাহোক, আমরা পাড়ায় পাড়ায় যুবরাজের বিয়ের কথাই বলাবলি কর্তুম। সকলেই আশা কোরে রয়েছি যে যুবরাজের বিয়ে দেখবো। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনলেম মহারাজ আপনিই বিয়ে কোরেছেন।

সরমা। (আশ্চর্য হইয়া) অবাক। বলিস কি রে? (জলকলস কক্ষ হইতে নামাইয়া) দিদি বলিস কি? —মাইরি? বুড়ো রাজার—বিয়ে হয়েছে?

বিমলা। আমি কি মিছে বলছি?

সরমা। মাগো কোথা যাব। আমরা ত কিছুই টের পাইনি। যুবরাজের বিয়ে হবে তাই জানি। এর মধ্যে বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল। দিদি তুই যা বল্লি, যথার্থ। একালে বুড়োও চেনা যায় না ছেলেও চেনা যায় না। কৈ রাজবাড়ীতে ত কোনো ধূমধাম হয়নি।

বিমলা। এ কাজটি চুপে চুপে সারা হয়েছে। ধূমধামে বিয়ে কোরতে অবশ্যই কিছু লজ্জা হয় সেই বিবেচনা কোরেই বোধ হয় কাকেও জানাননি।

সরমা। (মুখভঙ্গী করিয়া) কি লজ্জা। আরে আমার লজ্জা। বিয়ে কোরে ঘরে আনতে পাল্লেন তাতে লজ্জা হলো না, লোক জানলেই—লজ্জা হতো। এ কথা গোপন থাকবে কিনা? ছি ছি। মহারাজ বড় অন্যায় কাজ কোরেছেন। এই বয়সে লজ্জার মাথা খেয়ে বর সাজল্লেন কি কোরে? চুলে গোঁফে বুঝি কলপ দিয়েছিলেন? ছি ছি। বড় লজ্জার কথা।

বিমলা। আরো শোনো, আরো মজা আছে। সেদিন শুনে নূতন রাজরানী দেখতে বড় সাধ গেল; তাই আজ দেখতে গিয়ে একেবারে অবাক হয়েছি। দেখতে শুনতে বড় সুন্দরী; এলোচুলে বোসে সখীদের সঙ্গে কথা কোচ্ছিলেন, চুলগুলি পিঠের উপর দে পোড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেদিকে তাকাচ্ছেও না, নাক, কান, আর সেই জোড়া ভুরুতে মুখখানি চতুর্দশীর চাঁদের মত দব দব করছে। ঠিক ভুরুর মাঝখানে একটি ছোট টিপ কেটেছেন। থেকে থেকে চাঁদের আলো ফুটে সেইটি যেন তারার ন্যায় টিপটিপ কোরছে। চক্ষের ভাবভঙ্গী আর থেকে থেকে মুচকে মুচকে হাসি দেখে আমি একেবারে অজ্ঞান হয়েছি। ঠোঁট দু'খানি জবা ফুলের মত লাল। দাঁতগুলি বড় পরিপাটি, কথাও বড় মিষ্টি, বয়স অতি অল্প, এখনও ১৪ পেরোয়নি। রাজার সঙ্গে ছাইও মানায়নি। যদি যুবরাজের সঙ্গে এই বিবাহটি হতো, তাহলে সুখের সীমা থাকতো না। যেমন বর; ঠিক তেমনই কনে হতো।

সরমা। দিদি। রাজাকে বিয়ে কোত্তে কে পরামর্শ দিয়েছিল?

বিমলা। রাজার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা পাগলা গোছের বামুন থাকে, সেই নাকি এর ঘটক।

সরমা। তার কি? সে পেট পুরে খেতে পেলেই বড় খুশী। রাজার ত চোক ছিল?

বিমলা। চোক থাকলে কি হবে? মন যে এখনও হামাগুড়ি দেয়, তা ত আগেই বোলেছি।

সরমা। দিদি। রাজার বিয়ে কোরতে যদি এত সাধই হয়েছিল, কিছুদিন খুঁজে একটি বড় দেখে কেন বিয়ে কোল্লেন না? এ বিয়ে কেবল তাঁর মনস্তাপের কারণ হবে। বুড়ো বয়সে এমন মেয়েকে বশে

রাখা বড় ছোট কথা নয়। শত শত জায়গায় দেখতে পাচ্ছি, বয়সের মিল না হলে কোন কালেই মনের মিল হয় না। তুমি দেখো, রাজা আমাদের নতুন বোয়ের মন যোগাতে যোগাতে একেবারে নাজেহাল হবেন। তবুও তার মন উঠবে না। রাজাই হোক আর প্রজাই হোক, যুবতী নারী যে বুড়োর ঘরে সে মুখ ফুটে বোলতে পারবে না যে আমার স্ত্রী আমাকে বড় ভালবাসে। যিনি এ কথা বলেন, তিনি পাগল।

বিমলা। সত্যি কথা, বুড়ো বয়েসে কখনই সোমত্ত মেয়ের ভালবাসা পায় না। বুড়োরা কত কোরে মন যোগায়, তাতে কি সে ভোলে? শুধু কথায় কি হয়? পোড়া কপাল, কথা বোলতেও থুথু পড়ে।

(দূরে যুবরাজ নরেন্দ্র ও শরৎকুমারের প্রবেশ)

সরমা। চুপ কর দিদি। চুপ কর। ঐ যুবরাজ আসছেন। মন্ত্রিপুত্র শরৎ-কুমারও সঙ্গে আছেন। আমরা যে সকল কথা বলাবলি করেছি, বোধ হয় আড়াল থেকে ওঁরা সকলই শুনতে পেয়েছেন।

বিমলা। (পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিয়া জিহ্বা দংশন এবং ঘোমটা দিয়ে বেগে প্রস্থান, সরমাও জলকলস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

শরৎ। যুবরাজ। শুনলেন ত। পাড়ার মেয়ে দু'টি কি বোলে গেল। শুধু আমিই যে বলি তা নয়, মেয়েরাও মহারাজকে ধিক্কার দিচ্ছে। রাজ্যের অপর সাধারণ সকলেই মহারাজের নিন্দা কোচ্ছে।

নরেন্দ্র। মিত্র। গুরুলোকের কথা কওয়া—আমাদের ভাল দেখায় না, পিতা অবশ্যই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা কোরেই পুনরায় দারপরিগ্রহ কোরেছেন। সামান্য লোক তার ভাব কি বুঝবে? আর আমরাই বা কি বুঝতে পারি?

শরৎ। না, না, আমি যে কেবল বিবাহের জন্যেই বলছি তা নয়। দেখুন। অমাত্যগণ, সভাসদগণ, প্রজাগণ সকলেই মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। মহারাজ মাসাবধি রাজকার্য একবারে পরিত্যাগ কোরেছেন। প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় না। সিংহাসন শূন্য থাকলে যে রাজ্যের কি দশা ঘটে, তা বুঝতেই পাচ্ছেন, দুর্জনেরা নিরীহ প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করে তাদের সর্বস্বান্ত কোরছে। কর্মচারীরা

খোলা মহল পেয়ে দেদার লুট আরম্ভ কোরছে। প্রভুত্ব প্রকাশ কোত্তে কেউই ত্রুটি কোরছে না। প্রজাগণ কাতর হয়ে বিচারের প্রার্থনায় রাজবাটীতে প্রত্যহই আসছে, সমস্ত দিন অনাহারে থেকে ম্লানমুখে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জেনেছি, বিপক্ষ রাজারা যুদ্ধসজ্জার উপক্রম কোরেছেন। রাজা সর্বদাই অন্তঃপুরে নববিবাহিতা রানীর মন্দিরে থাকেন, রাজকার্যে মনোযোগ নাই, দেশে দেশে এই ঘোষণা হয়েছে। অন্য অন্য রাজারা মহারাজের রহস্য নিয়েই আমোদ কোরছেন।

নরেন্দ্র। মিত্র। এতদূর হয়েছে? আমি এর কিছুই শুনতে পাইনি। শুনবোই বা কি কোরে? আমি ত প্রায় মাসাবধি রাজধানীতে ছিলেম না।

শরৎ। বড়ই অন্যায় হয়েছে।

নরেন্দ্র। প্রধান মন্ত্রীবর কেন এ সকল বিষয় রাজাকে জানান না।

শরৎ। মহারাজ সর্বদাই অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁর নিকটে যেতে কারো অনুমতি নাই।

নরেন্দ্র। তবেই ত বিভ্রাট।

(কয়েকজন প্রজার প্রবেশ)

১ম প্রজা। বলি ও বেয়াই। রাজা বেটা বুড়োকালে বিয়ে কোরে একেবারে যাচ্ছে-তাই হয়ে গেছে। রাতদিন অন্তঃপুরেই থাকে; আর কদ্দিন আসবো; প্রত্যহই আসছি, একদিনও বেরোয় না, তা বিচার কোরবে কি? যেতে আসতে পায়ের নলা চিঁড়ে গেল। প্রত্যহ দিনের বেলা না খেয়ে থাকতে হয়, আর বাঁচি না। বেটা উচ্ছিন্ন যাক্‌। এমন মাগী-পাগলা রাজার রাজ্যে কি থাকতে আছে? যে মানুষ মেয়ে মানুষের গোলাম, সে কি মানুষ?

... ...

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় রঙ্গভূমি

[ইন্দ্রপুর, রেবতীর শয়নমন্দির, রেবতী, মালতী, বীরেন্দ্র সিংহ, বৈশম্পায়ন, নরেন্দ্র, বসন্তকুমারী, নগরপাল, প্রতিহারী প্রমুখ উপস্থিত।]

বীরেন্দ্র। (ক্রোধযুক্ত স্বরে) রে দুরাত্মা। রে কুলাঙ্গার। তুই এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস? তুই না পণ্ডিত হয়েছিলি? নানা শাস্ত্রে বিশারদ হয়েছিলি? তার ফল বুঝি এই ফল্লো? তোর এতবড় আস্পর্ধা, ধর্ম বলেও তোর ভয় হলো না? রে পাপাত্মা। তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়। এ অসি দ্বারা (অসি প্রদর্শন) স্বহস্তেই তোর মস্তক ছেদন করতেম; তা কোরব না। তুই যে পাপ করেছিস, তোর মাথা কেটে কি পবিত্র হস্তকে অপবিত্র কোরব? তোর শোণিতাক্ত শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয়ে কি ইন্দ্রপুরের গৌরব লোপ কোরবে? বীরেন্দ্র সিংহের রাজপুরীর মহত্ত্ব যাবে? তোর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞা যে ঐ অনলে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন কর। যদি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিস, তবে এই দণ্ডেই তোর হস্তপদ-বন্ধন ক'রে এই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবো।

নরেন্দ্র। পিতা। আমার হস্তপদ বন্ধন করে আগুনে ফেলতে হবে না। আপনি যখন আজ্ঞা করেছেন, তখন সে আজ্ঞা শিরোধার্য। তবে আসন্নকালে এই নিবেদন, আমি কি অপরাধে অপরাধী, সেইটি শুনতে চাই। যদি কোন অপরাধও না করে থাকি, আপনি ইচ্ছা করে আমায় অনলে আত্মসমর্পণ কোত্তে অনুমতি করছেন, তাও বলুন। আমি সন্তোষ-হৃদয়ে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করে পুত্রের কাজ কচ্ছি।

বৈশ। যুবরাজ। আপনি রাজমহিষীর পবিত্র সতীত্বের নিকট অপরাধী; সুতরাং আপনি দণ্ডনীয়। মহারাজ রানীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছেন; অদ্যই আপনার প্রাণ বিনাশ করে সমুচিত দণ্ড বিধান করবেন।

নরেন্দ্র। (নিস্তব্ধ) হা ভগবান। (বসন্তকুমারীর প্রতি) প্রিয়ে আর কেঁদো না। এ কাঁদবার সময় নয়। কাঁদলে আর কি হবে? পিতার আজ্ঞা। তুমি আমায় জন্মশোধ বিদায় দেও। পিতা। আমি বিদায় হলেম। মা রেবতি। আমারে জন্মের মত বিদায় দিন।

বসন্ত। (সরোদনে) নাথ। আমি যে চিরসঙ্গিনী, যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। (রোদন)

নরেন্দ্র। প্রিয়ে সে কি কথা? তুমি এখনও বুঝতে পার নাই? আমি জন্মের মত বিদায় হোচ্ছি।

বসন্ত। (উচ্চরোদনে) তা কখনই হবে না। —বসন্তকুমারী তোমারে কখনই প্রাণ থাকতে অসহায় হয়ে অনলে প্রবেশ কোত্তে দেখবে না। আমি আগেই আগুনে ঝাঁপ দিব। এ-ও কি কখনও হয় যে পতির মরণ স্বচক্ষে দেখে সতী স্ত্রী জীবন-ধারণ করে থাকে। নাথ! এই দেখুন; সেই বিবাহের রাত্রের অলঙ্কার সঙ্গেই আছে, পায়ের আলতা পায়েই আছে, সিঁতার সিঁদূরও মলিন হয়নি; এই বেশেই পতির সঙ্গে অনলে প্রবেশ করবো। মিনতি করে বলছি, চিরসঙ্গিনী অভাগিনীর চক্ষের পথে একবার দাঁড়াও; আমি তোমার সম্মুখে ঐ জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি।

নরেন্দ্র। তবে প্রস্তুত হও।

বসন্ত। আমি প্রস্তুত আছি। কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা।

নরেন্দ্র। (পিতৃচরণে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া) পিতঃ! বিদায় হলেম।

বীরেন্দ্র। পামর! তুই আমায় স্পর্শ করিস না। কখনই করিস না।

নরেন্দ্র। (ম্লানমুখে) মন্ত্রিবর! নরেন্দ্র জন্মের মত বিদায়প্রার্থনা করছে। মন্ত্রিবর! আপনি শৈশবকাল হতে আমায় যে স্নেহ করেছেন, হতভাগা দ্বারা প্রতিশোধ কিছুই হলো না। সমস্ত অপরাধ মার্জনা করবেন; আর প্রিয় বন্ধু শরৎকুমারকে বলবেন, নরেন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনে অনলে আত্মবিসর্জন করেছে। (শরৎকে উদ্দেশে) প্রিয় মিত্র শরৎ! মরণ-সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। মনের কথাও তোমার সঙ্গে বলতে পাল্লেম না। মিত্র! যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকি, মার্জনা কর। বন্ধু ভেবে কোনদিন যদি রূঢ় কথা বোলে থাকি; মার্জনা করো। পুরবাসিগণ! জানি মৃত্যুসময় তোমাদের কিছুই উপকার করতে পাল্লেম না; মার্জনা করো। মা রেবতি! বিদায় হই। জন্মের মত বিদায় হই। পিতঃ! মাতৃহীন নরেন্দ্র আজ জন্মশোধ বিদায় হলো। (পদদ্বয় গমন এবং পুনরায় পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া রাজার প্রতি) পিতঃ! (বস্ত্র হইতে পত্র লইয়া) এই পত্রখানা একবার পাঠ করবেন। (পত্র দান)

(বসন্তকুমারীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে অনলে প্রবেশ)

বীরেন্দ্র। (পত্র হস্তে ধরিয়া) নরাধমের পত্র পড়বো? না পড়বোনা। ও পাপাত্মার পত্র হাতে করাই অন্যায় হয়েছে। (ছিন্ন করিতে উদ্যত)

বৈশ। (করজোড়ে) মহারাজ। পত্রখানা নষ্ট করবেন না। যুবরাজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে অনলে আত্মসমর্পণ কল্লেন। তাঁর প্রতি আর কোপ কেন? তাঁর পত্র পড়তে হানি কি। একবার দৃষ্টি করুন। অবশ্যই কোন কারণ থাকতে পারে।

বীরেন্দ্র। (পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠান্তে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত) মালতি।

মালতী। (ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার পদ ধারণ) দোহাই ধর্মাবতার। আমি কিছু জানি না। আমার কোন অপরাধ নাই। রানী এই পত্র লিখে যুবরাজের হাতে আমায় দিতে বলেছিলেন, তাই আমি দিয়েছি। দোহাই ধর্মের। আমি আর কিছু জানি না। যেদিন রানী পত্র লেখেন, সেইদিন আপনি এই পত্র রানীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আবার আপনিই ফিরিয়ে দিলেন। আমি আর কিছু জানি না। আজ যুবরাজ রানীর সঙ্গে কোন কথা কওয়া দূরে, অন্তঃপুরেই আসেন নাই। মিছেমিছি একটি ছল করে গায়ের গয়না খুলে মাটিতে পড়ে ছিলেন।

রাজা। (আর্তস্বরে) নরেন্দ্র! —আমার নরেন্দ্র! —বিনা অপরাধে — আমার নরেন্দ্র। —নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই। হায়। হায়। দুশ্চারিণী রেবতীর ছলনায় আমার—নরেন্দ্রকে। —প্রাণের নরেন্দ্র।—ওরে পাপীয়সি। রে পিশাচি। —তোর শাস্তি— (সজোরে তরবারি আঘাত)

রেবতী। (ভূতলে পতিত) যুবরাজ। আমিই তোমার জীবননাশের মূল। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। —হ—য়ে—ছে—যু—ব—রা—জ। (প্রাণত্যাগ)

বীরেন্দ্র। (সরোদনে) মন্ত্রিবর। পিশাচিনীর শাস্তি হয়েছে। হায়। হায়। আমার কি হলো। আমি কোথা যাব। আমার নরেন্দ্র। নরেন্দ্র॥ আমি তোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি। হায়। হায়। কি অধর্মের কাজ করেছি। বিনা অপরাধে বিনা দোষে আমার কুল-তিলককে —আমার বংশের শিরোমণিকে,—আগুনে পুড়িয়ে মাল্লেম। হায়। হায়। আমি কি পাষণ্ড,—কি নিষ্ঠুর,—প্রাণাধিকা বসন্তকুমারীর প্রতি ফিরেও চাইলাম না। মা আমার নরেন্দ্রের সঙ্গেই অনলে প্রবেশ কল্লেন। আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না। ধিক

আমার জীবনে। (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মন্ত্রিবর। আমার কি হবে? আমি কোথা যাব? আমি দুর্মতি রেবতীর কথায় ভুলে প্রাণাধিক সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কল্লেম। মায়াবিনীর মায়ায় ভুলে পুত্রের মায়া বিসর্জন কল্লেম। হায়। হায়। দুশ্চারিণীর হাত থেকে পত্রখানা কেড়ে নিয়েও পড়ি নাই। আমার মত নরাধম নির্বোধ আর কে আছে? আমার মত পামরের মুখ দেখতে নাই। মন্ত্রিবর। আমার নরেন্দ্র যথার্থই আগুনে পুড়েছে। নরেন্দ্র। হা নরেন্দ্র॥ (পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। (জল সেচন) এখন দুঃখ কল্লে আর কি হবে?

বীরেন্দ্র। (কিঞ্চিৎ পরে চেতন পাইয়া) হা, আমার প্রাণ এখনও পাপদেহে রয়েছে। নরেন্দ্রই যদি প্রাণ ত্যাগ কল্লে তবে আমার জীবনে ফল কি? এ পাপাত্মার জীবনে ফল কি? হায় হায়। কি বলেই বা দুঃখ করি। কোন্ মুখেই বা নরেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করি। মন্ত্রিবর। 'যথার্থই' আমার নরেন্দ্র জীবিত নাই। সত্য সত্যই আগুনে পুড়ে মরেছে। আমি সেই আগুন দেখব। আর সহ্য হয় না। (শিরে করাঘাত করিতে করিতে গমন) হায়। হায়। এই আগুনে পুড়ে আমার নরেন্দ্র মরেছে। (অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) নিরপরাধী শিশু। আমার নরেন্দ্রকে ফিরিয়ে দাও। নরেন্দ্র। আমার প্রাণের নরেন্দ্র। আমার কোলে আয়। আমার প্রাণ গেল। নরেন্দ্র। আমার নরেন্দ্র। এসো কোলে করি। (লম্ফপ্রদানে অনলে প্রবেশ) সকলে—হায়।—হায়। সর্বনাশ হলো। হায়। হায়। একি হলো।

যবনিকা পতন।

জমীদার দর্পণ

(প্রথম সংস্করণ, ১৮৭৩)

প্রস্তাবনা

(নটের প্রবেশ)

নট। একা একা পাগলের মত কি বলছেন।

সূত্র। কেন? অন্যায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি?

নট। আমি সত্য-অসত্যের কথা বলছিনে, ভয়ের কথাও বলছিনে, বলি কথাটা কি?

সূত্র। কথা এমন কিছু নয়। কলিকালের প্রজারা মহাসুখে আছে। কলি-রাজও প্রজার সুখচিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরি সন্ধান করছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য করছে তার খোঁজখবর নেই।

নট। কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধন, সুখী দুঃখী সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন-দুঃখীদের প্রতি বেশ টান।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা, মফঃস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফঃস্বলে ঠাকুর। শহরে তাদের কেউ চেনে না; মফঃস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, মনে দ্বিধা নেই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফঃস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জান্ওয়ার নয়?

সূত্র। আপনি বুঝতে পারেননি। এ জানওয়ারদের চারখানা পা'ও নেই আর ল্যাজও নেই। এরা খাসা পোশাক পরে, দিব্বি সরু চেলের

ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোশামোদে কুকুররাও গদীর আশেপাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নেই, যা মনে হচ্ছে তাই করছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান-ভয়ে নিজে কোন কার্যই করে না। ভগবান তাদের হাত-পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নেই। দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাদ্যসামগ্রী হাতে কোরে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায়ই চাকরেই চিবিয়ে দেয়। এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট। থাক ও সকল কথা, আর বলে কাজ নেই; কি জানি—

সূত্র। কেন বলব না? আপনি তো বলেছিলেন, যদি কোনদিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা বলবো। আজ আমাদের সেই শুভদিন হয়েছে।

নট। কি করে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না।

নট। (চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য।

সূত্র। আর বিলম্বে কাজ নেই। আমাদের চির মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো। যত কথা মনে আছে সকলি বলবো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্‌শা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে।

নট। তাই তো ভাবছি; কোন্ নক্‌শা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে।

সূত্র। আপনি শুনেন নাই, "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্‌শাটি এঁকেছে তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।

নট। তবে আর কথা নেই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ)

নটী। বেশ, ইনি তো মন্দ নন। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই। তা যাক্, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই অবসরে মালা গেঁথে নেই

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)

(রাগিনী মল্লার—তাল আড়া)

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্ন ভাব অন্য মতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত কথা বলে, মজায় অবলা জাতি।
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষষ্ঠপদগুণ, কি হবে এদের গতি। ... ...

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ কোরবো।

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম। এখন আর বিলম্ব কি, আর কথাই বা কি?

নটী। না, আমার কোন কথা নেই। আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে বাধা দেই? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালা ছড়াটি গেঁথেছি। এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে।

নট। (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী। (মৃদুহাস্যে) এ-ও এক সুখ।

নট। প্রিয়ে মালাতো পরালে, এখন একটি গান গাও।

নটী। আর কি গান গাইব। মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে, আমি বলবো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি।

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[দায়রা বিচার]

[জজ, উকিল, ব্যারিস্টার—আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ]

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

পেস্কা। (জজের নিকট গিয়া) হুজুর জুরীর সংখ্যা পূর্ণ নাই, একজন গরহাজির।

জজ। ডেকে আনতে পারো।

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সঙ্কেতে ডাকেন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শক। (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। আপনি জুরী হতে পারেন?

জজ। আপনি কে আছে?

দর্শক। খোদাবন্দ—আমি—আমি (জোড় হাত) না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই, আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে মুড়কি পতন।)

জজ। নেই টুমার জুরি হ'টে হোবে।

দর্শক। দোহাই ধর্মাবতার আমার কোন কসুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই, আমি কোট্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলাম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনী বিচার হচ্ছে। হুজুর, তাই আমি দেখতে এয়েছি। ধর্মাবতার। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর। দোহাই ধর্ম—

জজ। নেই নেই হাম টুমকো জুরী করেগা। টোমারা ক্যা নাম?

(গাত্রোত্থানপূর্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গী করিয়া নৃত্য)

দর্শক। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই কর্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমারা নাম ক্যা হ্যায়?

দর্শক। (সরোদনে করজোড়ে) আরজান ব্যাপারী হুজুর। খোদাবন্দ—

জজ। টোম ঐ চেয়ার সে বয়ঠো।

আর। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকড়ো, পাকড়ো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)

আর। (চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর। আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপ রাও।

আর। এইবারই গেলুম (নিস্তব্ধ)

পেস্কা। (জজ সাহেবের নিকট করজোড়ে) হুজুর। ছাপাই সাক্ষী আরও দু'জন আছে।

জজ। লে আও।

পেস্কা। (আরদালী প্রতি) জীতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক। (আদালত রীতিমত আরদালী দ্বারা তিনবার ফোকরান।)

জীতু। আমার নাম জীতু মোল্লা, বাপের নাম ফেদু মোল্লা, বয়স ৬০/৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি ?

জিতু। কোরান পড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরের কথা কই যাতে দীন দুনিয়ার ভালাই হবে। বিয়ে শাদীর কলমা পড়াই, মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ। (গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে ?

জীতু। হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খানকা ঘরে বসে সারা-রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি ; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। টুমি ঘুম পাড়ো না তবে কি কর ?

জীতু। সারা-রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।

ব্যারি। নেই, ও বাত নেই, টুম কুচ গোলমাল শুনা হ্যায় ?

পেস্কা। হাকিম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে ?

জীতু। সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে করে আবু মোল্লা এদের রটিয়েছে।

ব্যারি। টুমি মক্কা মে গিয়া ?

জীতু। জনাব। গেছলাম। আমি চারবার অজ্‌ করেছি।
ব্যারি। মোল্লার জরু কি রকম মরেছে টুমি তার কিছু জান?
জীতু। জানবো না ক্যা? আবুই মারতে মারতে এহেবারে খুন করছে।
ব্যারি। আবু কেঁউ মারা?
জীতু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কইল।
ব্যারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—
জীতু। (তসবি কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা, অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই। বড় দীনদার, বড় দাতা, মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।
ব্যারি। হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহারকে মারিয়াছে?
জীতু। (দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা। সে কি এমন কাজ কত্তে পারে, তা কহনো হবার নয়।
ব্যারি। আচ্ছা তুমি যাও।

[কলম ছুইয়া জীতুর প্রস্থান]

[নামাবলী গায় কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান। সর্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরি নাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ ও পূর্বমত হলফ পাঠ।]

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস, বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।
ব্যারি। আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন করিয়াছে টুমি কিছু জানে?
হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানিনে হরিবোল। হরিবোল। শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ। হরিবোল। হরিবোল।
ব্যারি। আবু মোল্লা কেমন লোক?
হরি। হুজুর সে বড় ফেরববাজ একদিন আমি—
জজ। তুমি কি? ফেরেব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ববৎ তুড়ি ও শিশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টি করতঃ লাস্যপূর্বক উপবেশন) তুমি—একদিন তুমি কি—?
হরি। হুজুর। একদিন আমি ভিক্ষা কত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি

দিয়ে আমার ঝোলা দেখি বলে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিল ; শেষে ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মলো। রাধেকৃষ্ণ। রাধেকৃষ্ণ।

ব্যারি। মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিল ?

হরি। (দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ। আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবে না— (দীর্ঘশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু।

ব্যারি। এই আসামীরা কেমন লোক ?

হরি। বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্মিক। গরীব লোকের প্রতি তার ভারী দয়া।

আর বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন।

বা. উ। তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি ?

হরি। কৃষ্ণমণি।

বা. উ। হুজুর, সেই কৃষ্ণমণি।

জজ। হাঁা হাঁা। আমি জানে।

(ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। How are you.

ডাক্তা। Thanks ! Quite well.

জজ। Please take your seat. How is Mrs. Cunningham ? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তা। Thanks ! She is in delicate state and this is the seventh months.

জজ। Oh ! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত) Do you like to go to soon ?

ডাক্তা। Yes ; she is alone.

জজ। (আসামীর ব্যারিস্টারের প্রতি) Dr. Cunningham is in hurry and I think it is better to take his disposition first.

ব্যারি। Yes ; I have no objection.

বা. উ। (দণ্ডায়মানপূর্বক) হুজুর। হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে।

জজ। Wait, Wait (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo can't you wait (মৃদুস্বরে) natives? Let me take Dr. Cunningham's deposition first.

(বাদীর উকিলের নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তা। (বাইবেল চুম্বনপূর্বক) My name is F. B. Cunningham; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the post-mortem examination of the body of Nooren-Nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmashala police station. No marks of external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from the said part; the lungs highly congested on digesting away the skin of throat, extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of senguineous apoplexy of the brain.

জজ (মৃদুস্বরে) Must be brain disease; (বাদীর উকিলের প্রতি) টোমার কুছ আছে? ··· ···

বা, উ। ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল, ঐ কারণে কি "ব্রেন ডিজিজে" মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

জজ। হ্যাঁ। কেন হোবে না। ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন; হোবে হোবে।

বা, উ হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট। (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the abdomen and extravasation of blood beneath the skin of the throat can produce sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তা। (উচ্চ হাস্যপূর্বক) হা হা হা। If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sof of blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ। আর কিছু ছওয়াল আছে ?

বা, উ হুজুর আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। উপবেশন। (উপবেশন)

জজ। (ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. Cunningham ?

ব্যারি। (আশ্চর্যে) To whom ? To Dr. Cunningham ?

জজ। Yes.

ব্যারি। Certainly not ; he is perfectly right.

জজ। (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go ; give my compliments to Mrs. Cunningham.

ডাক্তা। Thanks.

[প্রস্থান]

ব্যারি। (হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ ?

হরি। গয়া কাশী পেড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। (ঈষৎ হাস্যপূর্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হরি। নাম সই কর্ত্তে পারি।

জজ। আচ্ছা দস্তখত কর।

(বাদীর উকিলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

(পাঁচ মিনিটকাল উকিলের বাঙ্গালা বক্তৃতা)

আবু। দোহাই ধর্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি। টুমি চোপরাও—

আবু। আমার বাড়ীঘর সব গেছে; জাতও গেছে হুজুর; আমার কিছু নাই; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ। চুপরাও।

আবু। দোহাই ধর্মাবতার। আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরীব।

জজ। চুপরাও। (কিঞ্চিৎ পরে জুরিগণের প্রতি) Is this case guilty or not.

জুরি। (যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি। (হো হো শব্দে হাস্যপূর্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে করণ এবং জজের একটু খোশামোদ)।

জজ। (রায় লিখতে আরম্ভ; ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিসমিস—আসামীগণ খালাস। (হাতে তুড়ি দিয়া নৃত্য)।

ব্যারি। (হাস্য করিয়া) সেকহ্যাণ্ড।

বিষাদ-সিন্ধু

(মহরম পর্ব, প্রথম সংস্করণ, ১৮৮৪)

ষোড়শ প্রবাহ

মায়মুনার সহিত জায়েদার কথোপকথন হইতেছে। জায়েদা বলিতেছেন, "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই। মানুষের পেটে বিষ হজম হয়; একবার নয়, কয়েকবার। আমি কেন জয়নাবের সুখের তরী ডুবাইতে আসিয়াছি? আমি কেন জয়নাবের সর্বনাশ করিতে গিয়া আপন হাতে স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিতে দাঁড়াইয়াছি? যে চক্ষু সর্বদাই যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত; জয়নাবের চক্ষু পড়িয়া সেই চক্ষু আর তাহাকে দেখিতে চায় না। সেই প্রিয় বস্তুকে একেবারে চক্ষের অন্তর করিতে, জগৎ-চক্ষুর অন্তর করিতে—কতই যত্ন, কতই চেষ্টা করিতেছি। যে হস্তে কতই সুখাদ্য দ্রব্য খাইতে দিয়াছি, এখন সেই হস্তে বিষ দিতেও একটু আগুপিছু

চাহিতেছি না।—কিন্তু কাহার জন্য? যে স্বামীর একটু অসুখ হইলে যে জায়েদার প্রাণ কাঁদিত, এখন সেই স্বামীর প্রাণ হরণ করিতে না পারিয়া সেই জায়েদা আজ বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু কাহার জন্য? মায়মুনা! আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম, হাসানের মরণ নাই। জায়েদারও আর সুখ নাই।"

মায়মুনা কহিল, "চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। একবার, দুইবার, তিনবার না হয় চারবার—পাঁচবারের বার আর কিছুতেই রক্ষা নাই। হতাশ হও কেন? এই দেখ, এজিদ এই সকল কথা শুনিয়া এই ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে আর নিস্তার নাই।" এই কথা বলিয়াই মায়মুনা আপন কটিদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি বাহির করিয়া জায়েদাকে দেখাইল। জায়েদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?"

"মহাবিষ।"

"মহাবিষ কি?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "এ সর্পবিষ নয়, অন্য কোনও বিষ নয়,—লোকে ইহা মূল্যবান জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল্য অধিক, দেখিতেও অতি উজ্জ্বল। আকার পরিবর্তনের অণু মাত্র পেটে পড়িলেই মানুষের পরমায়ু শেষ করে।"

"কি প্রকারে খাওয়াইতে হয়?"

মায়মুনা কহিল, "খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলেই হইল। পানিতে মিশাইয়া খাওয়াইতে পারিলে ত কথাই নাই। অন্য অন্য বিষ পরিপাক হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকযন্ত্রের নাই, এ একটি চূর্ণ মাত্র। পেটের মধ্যে যেখানে পড়িবে—নাড়ী পাকযন্ত্র. কলিজা সমস্তই কাটিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে।"

"এ ত বড় ভয়ানক বিষ। ছুঁইতেও যে ভয় হয়।"

ছুঁইলে কিছুই হয় না। হাতে করিয়া রগড়াইলেও কিছু হয় না, হল্‌কুমের (অন্ননালীর) নীচে না নামিলে কোন ভয় নাই। এ ত অন্য বিষ নয়, এ হীরক চূর্ণ।"

"হীরার গুঁড়া? আচ্ছা দাও।"

মায়মুনা তখনি জায়েদার হাতে পুঁটুলি দিল। পুঁটুলি হাতে লইয়া জায়েদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার ঘরে যে আসিবেন, সে আশা আর নাই। যেরূপ সতর্কতা, সাবধানতা দেখিলাম, তাহাতে খাদ্য-সামগ্রীর

সহিত মিশাইবার সুবিধা পাইব কোথায়? হাসনেবানু কিংবা জয়নাব দু'য়ের একজন না মিশাইলে আর কাহারও সাধ্য নাই।"

"সাধ্য নাই কি কথা? সুযোগ পাইলে আমিই মিশাইয়া দিতাম। খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি; অন্য আর একটি উপায় আছে।"

"কি উপায়?"

"ঐ সোরাহীর জলে।"

"কি প্রকারে?—সেই সোরাহী যে প্রকারের সীলমোহরে বাঁধা, তাহা খুলিতে সাধ্য কার?"

"খুলিতে হইবে কেন? সোরাহীর উপরে যে কাপড় বাঁধা আছে, ঐ কাপড়ের উপরে এই গুঁড়া অতি অল্পপরিমাণে ঘষিয়া দিলেই আর কথা নাই। যেমন সোরাহী তেমনি থাকিবে। যেমন সীলমোহর, তেমনি থাকিবে; পানির রং বদল হইবে না, কেহ কোন প্রকারে সন্দেহও করিতে পারিবে না।"

"তাহা যেন পারিবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে যাওয়া ত চাই? যদি কেহ দেখে?"

"দেখিলেই বা। ঘরের মধ্যে যাওয়া ত তোমার দোষের কথা নয়। তুমি কেন গেলে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি ঘরের মধ্যে যাইতে কোন বাধা না থাকে, তবে দেখিবে সুযোগ আছে কি-না। যদি সুযোগ পাও, সোরাহীর কাপড়ের উপরে ঘষিয়া দিও। এই মাত্র আসিয়াছ. এখন আর যাওয়ার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হউক, রোগীও নিদ্রাবশে শয়ন করুক। যাহারা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, তাহারাও বিশ্রামের অবসর পাউক। একটু রাত্রি হইলেই যাওয়া ভাল।"

মায়মুনা তখন জায়েদার গৃহেই থাকিল, জায়েদা গোপনে সন্ধান লইতে লাগিলেন। হাসানের নিকট কে কে রহিয়াছে, কে কে যাইতেছে, কে কে আসিতেছে, কে কি করিতেছে, প্রতি মুহূর্তেই জায়েদা গুপ্তভাবে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। সন্ধান ও পরামর্শ করিতে করিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইল। জায়েদা আজ অত্যন্ত অস্থির। একবার আপন ঘরে মায়মুনার নিকটে, আবার বাহিরে। আবার সামান্য কার্যের ছল করিয়া হোসেনের গৃহসমীপে—হাসনেবানুর গৃহের নিকটে—জয়নাবের গৃহের দ্বারে। কে কোথায় কি

বলিতেছে, কি করিতেছে; সমুদয় সন্ধান লইতে লাগিলেন। বাড়ীর লোক —বিশেষতঃ হাসানের স্ত্রী; শতশতবার আনাগোনা করিলেও কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু হাসনেবানুর চক্ষে পড়িলে অবশ্যই তিনি সতর্ক হইতেন। স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় হাসনেবানু সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত; আহার নিদ্রা একেবারে ছাড়িয়াছেন। জীবনে নামাজ (উপাসনা) কাজা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ, সে নামাজ এখন আর সময়মত হইতেছে না। নানা প্রকার সন্দেহ ও চিন্তায় হাসনেবানু একেবারে বিহ্বলপ্রায় হইয়াছেন। স্বামীর কাতর শব্দে, প্রতি বাক্যে তাঁহার অন্তরের গ্রন্থিসকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যখন একটু অবসর পাইতেছেন, তখনই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেছেন। জয়নাব মনের দুঃখ মনেই রাখিতেছেন; হাসনেবানুর কথাক্রমেই দিবানিশি খাটিতেছেন। বিনা কার্যে তিলার্ধকালও স্বামীপদ ছাড়া হইতেছেন না। নিজ প্রাণ ও নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার মায়া-মমতা নাই। হাসানের চিন্তাতে বাড়ীর সকলেই (জায়েদা ছাড়া) মহাচিন্তিত ও মহাব্যস্ত।

জায়েদার চিন্তায় জায়েদা ব্যস্ত। জায়েদা কেবল সময় অনুসন্ধান করিতেছেন, সুযোগের পথ খুঁজিতেছেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রিও অধিক হইয়া আসিল। সকলেই আপন আপন স্থানে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। হাসনেবানু প্রতি নিশিতেই প্রভু মোহাম্মদের (সঃ) "রওজা শরীফে" যাইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেন। আজও নিয়মিত সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে তসবিহ্ হস্তে করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। জায়েদা জাগিয়া ছিলেন বলিয়াই দেখিলেন যে, হাসনেবানু রওজা মোবারকের দিকে যাইতেছেন। গোপনে গোপনে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া আরও দেখিলেন যে, হাসনেবানু উপাসনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া আসিয়াই মায়মুনাকে বলিলেন, "মায়মুনা। বোধ হয়, এই উত্তম সুযোগ। হাসনেবানু এখন ঘরে নাই, রওজা হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব আছে। এখন একবার যাইয়া দেখি, যদি সুযোগ পাই, তবে এই-ই উপযুক্ত সময়।"

জায়েদা বিষের পুঁটুলি লইয়া চলিলেন। মায়মুনাও তাহার অজ্ঞাত-সারে পাছে পাছে চলিল। অন্ধকার রজনী—চন্দ্রমাস রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ। চন্দ্র উঠিয়াই অমনি অস্ত গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার। জায়েদা সাবধানে সাবধানে পা ফেলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর শয়ন-গৃহের

দ্বারের নিকটে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গৃহ মধ্যস্থিত সকলেই জাগরিত কি নিদ্রিত তাহা পরীক্ষা করিলেন। গৃহদ্বার যে বন্ধ নাই, তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া গিয়াছেন। কারণ, হাসনেবানু স্বামীর আরোগ্যলাভার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়াই জায়েদার গৃহপ্রবেশের আরও সুবিধা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া; হাতের জোর হাতে রাখিয়া; অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জায়েদা দেখিলেন—দীপ জ্বলিতেছে। এমাম হাসান শয্যায় শায়িত,—জয়নাব বিমর্ষ বদনে হাসানের পদ দু'খানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন। অন্যান্য পরিজনেরা শয্যার চতুষ্পার্শ্বের ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন সে গৃহে যেন আর কোন শব্দই নাই।

দীপের আলোতে জয়নাবের মুখখানি জায়েদা আজ ভাল করিয়া দেখিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বাভাবিক আকৃতির শোভা যেরূপ দেখায়—জাগ্রত অবস্থায় বোধ হয় তেমন শোভা কখনই দেখা যায় না। কারণ—জাগ্রত অবস্থায় কৃত্রিমতার ভাগ অনেক অংশে বেশী হইয়া পড়ে। জায়েদা গৃহের মধ্যস্থ শায়িত ব্যক্তি ও দ্রব্যসমূহের প্রতি একে একে কটাক্ষপাত করিলেন। সোরাহীর প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সোরাহীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে ও অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার দুই-এক পদ অগ্রসর হইলেন। ক্রমে সোরাহীর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। আবার গৃহমধ্যস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া এমামের মুখের দিকে চক্ষু ফেলিলেন। বিষের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া, কি ভাবিয়া আর খুলিলেন না। হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি লইয়া সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে সোরাহীর মুখবন্ধ-বস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বারবার বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সমুদয় চূর্ণ জলে প্রবেশ করিলে জায়েদা ব্যস্তভাবে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময় স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া ফেলিতেই দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল। ঐ শব্দে এমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ

হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু চক্ষের পাতা খুলিল না। দ্বার-পূর্বমত রাখিয়া জায়েদা অতি ত্রস্তে গৃহের বাহির আসিয়া কিঞ্চিৎ ভীতা হইলেন। শেষে দেখিলেন, আর কেহ নহে—মায়মুনা। জায়েদার হাত ধরিয়া লইয়া মায়মুনা চঞ্চল পদে ব্যস্তভাবে জায়েদার গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বারে জায়েদার পদাঘাত শব্দে এমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঐ শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে সকলেই নিদ্রিত; দীপ পূর্বমত জ্বলিতেছে। যেখানে যাহা ছিল, সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। হঠাৎ শব্দে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কেবল আক্ষেপের কারণ হইল। জয়নাবকে ডাকিতে লাগিলেন। জয়নাব জাগিবামাত্রই হাসান তাঁহাকে বলিলেন, "জয়নাব শীঘ্র শীঘ্র আমাকে পানি দাও। অজু (উপাসনার পূর্বে হস্তপদ মুখাদি বিধিমতে ধৌত) করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এই মাত্র পিতামাতা এবং মাতামহকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহারা যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। একটু জল পান করিব—পিপাসা অত্যন্ত হইয়াছে।"

জল আনিতে জয়নাব বাহিরে গেলেন। হাসনেবানু তসবীহ হাতে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এমাম হাসানকে জাগরিত দেখিয়া তাঁহাকে শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই তিনি নিজেই হাসনেবানুকে স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন। "অত্যন্ত জল পিপাসা হইয়াছে, এক পেয়ালা পানি দাও।" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্ন-বিবরণ শুনিবামাত্রই হাসনেবানুর চিত্ত আরও অস্থির হইল; বিবেচনা শক্তি লাঘব হইয়া গেল; মস্তক ঘুরিয়া পড়িল। সোরাহীর বস্ত্রের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তাহা আর দেখিবার ক্ষমতা থাকিল না। হাসনেবানু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে বস্ত্রের উপরিস্থ হীরকচূর্ণ ঘর্ষণের কোন না কোন চিহ্ন অবশ্যই তাহার চক্ষে পড়িত, কিন্তু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণে এমনি বিহ্বল হইয়াছেন যে, সোরাহীর মুখবন্ধ না থাকিলেও তিনি নিঃসন্দেহে জল ঢালিয়া স্বামীকে পান করিতে দিতেন। এক্ষণে অন্যমনস্কে সোরাহী হইতে জল ঢালিয়া পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এমাম হাসানের এই শেষ পিপাসা,—হাসনেবানুর হস্তে এই শেষ জলপান।—প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলেন। জয়নাব পূর্ব-আদেশমত জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। হাসান হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসিয়া বসিয়া

জীবনের শেষ উপাসনা,—ইহজগতের শেষ আরাধনা আজ শেষ হইল; অন্তরও জ্বলিয়া উঠিল।

কাতর হইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আজ আবার একি হইল। জায়েদার ঘরে যে প্রকার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইয়া অস্থির করিয়াছিল, এ ত সেরূপ নয়। কলিজা, হৃদয় হইতে নাভি পর্যন্ত সেই কি এক প্রকারের বেদনা, যাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। ঈশ্বর একি করিলেন। আবার বুঝি বিষ। এ ত জায়েদার ঘর নহে। তবে একি।—একি যন্ত্রণা। উঃ—কি যন্ত্রণা।"

বেদনায় হাসান অত্যন্ত কাতর হইলেন—জায়েদার ঘরে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চতুর্গুণ বেদনা ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রভাবে কাসেমকে কহিলেন, শীঘ্র শীঘ্র হোসেনকে ডাকিয়া আন। আমি নিতান্তই অস্থির হইয়াছি। আমার হৃদয়, অন্তর, শরীর, সমুদয় যেন অগ্নি-সংযোগে জ্বলিতেছে, সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে। অন্তরস্থিত প্রত্যেক শিরা যেন সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে।

অতি ত্রস্তে কাসেম যাইয়া পিতৃব্য হোসেনের সহিত পুনরায় সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর আর আর সকলেও আসিয়া জুটিলেন। সকলের সহিত আসিয়া জায়েদাও একপাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হোসেনকে দেখিয়া হাসান অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই আর নিস্তার নাই। আর সহ্য হয় না। আমার বোধ হইতেছে যে, কে যেন আমার অন্তরমধ্যে বসিয়া অস্ত্রাঘাতে বক্ষ, উদর এবং শরীর মধ্যস্থ মাংসপেশী সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে। ভাই। আমি এইমাত্র মাতামহ, মাতা এবং পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। মাতামহ আমার হস্ত ধরিয়া স্বর্গীয় উদ্যানে বেড়াইতেছেন। মাতামহ ও মাতা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "হাসান। তুমি সন্তুষ্ট হও যে শীঘ্রই পার্থিব শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে। এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিদ্রাভঙ্গের সহিত স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যন্ত জল পিপাসা হইয়াছিল; সোরাহীর জল যেমন পান করিয়াছি, মুহূর্ত না যাইতেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এত বেদনা এত কষ্ট আমি কখনই ভোগ করি নাই।"

হোসেন দুঃখিত এবং কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি সকলই বুঝিয়াছি। আমি আপনার নিকট আর কিছু চাহি না। আমার এই ভিক্ষা

যে ঐ সোরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন। দেখি জলে কি আছে।" এই বলিয়া হোসেন সেই সোরাহী ধরিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। হাসান পীড়িত অবস্থাতেই শশব্যস্তে "ও কি কর? হোসেন। ও কি কর?" এই কথা বলিতে বলিতে শয্যা হইতে উঠিলেন,—অনুজের হস্ত হইতে সোরাহী কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সোরাহী শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

হস্তে ধরিয়া নিজ অনুজকে শয্যার উপর বসাইয়া মুখে বারবার চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই। আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব-আঘাত, পূর্ব-পীড়া, এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলই ভুলিয়াছি। ভাই দেখ ত,—আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্তিত হইয়াছে?"

ভ্রাতার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলেন। আর আর সকলে বলিতে লাগিল, "আহা—জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদ নীলিমা-রেখা পড়িয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, "ভাই। বৃথা কাঁদিয়া লাভ কি? আমার আর বেশী বিলম্ব নাই, চিরবিদায়ের সময় অতি নিকটে। মাতামহ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই। মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন। সেখানে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুসজ্জিত দেখিলেন। একটি সবুজবর্ণ আর একটি লোহিতবর্ণ। কাহার ঘর প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর করিল, আপনার অন্তরের নিধি, হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুত্তলী হাসান-হোসেনের জন্য এই দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী কাঁপিয়া নতশির হইল, কোন উত্তর করিল না। জিবরাইল সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনি মাতামহকে বলিলেন, 'আয় মোহাম্মদ, দ্বারবান কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইয়াছে, আমি প্রকাশ করিব। আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্ত কথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন হইবার কারণ কি? উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সবুজবর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য, লোহিতবর্ণ গৃহ কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে একদল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষ

পান করাইবে এবং মৃত্যুর সময় হাসানের মুখ সবুজবর্ণ হইবে ; তন্নিমিত্তই ঐ গৃহটি সবুজবর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্র দ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকচ্ছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিতবর্ণের কারণ।—মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে যেন পরমায়ুও আজ শেষ হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ভাই। ঈশ্বরের কার্যও অখণ্ডনীয়।"

সবিষাদে এবং সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার চিরআজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং চির আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষী—মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুন ত, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে?"

"ভাই। তুমি কি জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি তাহার প্রতিশোধ লইবে?"

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভরে দুঃখিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে, এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছে, সেই ভ্রাতাকে—আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষপান করাইয়াছে—সে কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি এমনি দুর্বল; আমি কি এমন নিঃসাহসী; আমি এমন ক্ষীণকায়, আমি কি এমনি কাপুরুষ; আমার হৃদয়ে রক্ত নাই; ভ্রাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণ-নাশক বিষ প্রদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারিব না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্য ধন সহোদর রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, যে পাপিষ্ঠ আজ তিনটি সতী স্ত্রীকে অকালে বিধবা করিল, আমি কি তাহার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোন সন্ধান জানিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চির কিঙ্করকে বলুন, আমি এখনি আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজনবনে, পর্বতগুহায়, অতল জলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই থাকুক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।"

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "ভাই, স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন; আমার কেবল এইমাত্র আক্ষেপ যে বিনা কারণে আমাকে নির্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে যে কি সুখ

মনে করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লোভেই হউক, যে আশায়ই হউক, নিরপরাধে যে আমাকে নির্যাতন করিয়া চির বন্ধুর প্রাণ বধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনই পূর্ণ করিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক ভাই, তাহার নাম আমি কখনই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ হিংসা দ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে পারিব না, সে পর্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই। ক্রমেই আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দিক যেন অন্ধকারময় দেখিতেছি।" আবুল কাসেমের হস্ত ধরিয়া হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ভাই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া আজ আমি তোমার হস্তে কাসেমকে দিলাম। কাসেমের বিবাহ দেখিতে বড় সাধ ছিল; পাত্রীও স্থির করিয়াছিলাম, সময় পাইলাম না।" হোসেনের হস্ত ধরিয়া আবার কহিলেন, "ভাই ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধ—তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিও। ভাই আমার বিষদাতার যদি সন্ধান পাও, কিংবা কোন সূত্রে যদি ধরা পড়ে তবে তাহাকে কিছু বলিও না—ঈশ্বরের দোহাই, তাহাকে ক্ষমা করিও।" যন্ত্রণাকুল এমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্যন্ত বলিয়া সস্নেহে কাসেমকে বলিলেন, "কাসেম। বৎস আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও। আর বাপ। এই কবচটি সর্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও। যদি কখনও বিপদগ্রস্ত হও, সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করিতে না পার, তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্য করিও; যাহা লেখা দেখিবে, সেইরূপ কার্য করিবে। সাবধান। তাহার অন্যথা করিও না।"

কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া, উপর্যুপরি তিন-চারিটি নিশ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, "ভাই ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও, কেবল জায়েদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুক। জায়েদার সহিত নির্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।"

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন। শয্যার নিকটে জায়েদাকে ডাকিয়া হাসান চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, "জায়েদা। তোমার চক্ষু হইতে হাসান

এখন চিরদিনের জন্য দূর হইতেছে—আশীর্বাদ করি, সুখে থাক, তুমি যে কার্য করিলে, সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম, বড়ই ভালবাসিতাম—তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ। ভাল। সুখে থাক; আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। হোসেনকেও ক্ষমা করিতে বলিয়াছি; তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ।—ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কি অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা হউক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যিনি সর্ব-সাক্ষী, সর্বময় সর্বক্ষমার অধীশ্বর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন কি-না বলিতে পারি না। তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে আমি সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্তি করাইতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।”

জায়েদা অধোমুখে অশ্রুবিসর্জন করিলেন। একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর আর সকলেই সেই গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হাসনেবানু ও জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ কৃত অপরাধের মার্জনা চাহিলেন। শেষে হোসেনকে কহিলেন, “হোসেন। এস ভাই। জন্মের মত তোমার সহিত আলিঙ্গন করি।” এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া সাশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, ভাই। সময় হইয়াছে। ঐ মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন; চলিলাম।” এই শেষ কথা বলিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় এমাম হাসান সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন; যেদিন এমাম হাসান মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন, সেই-দিন হিজরী ৫০ সনের ১লা রবিউল আউয়াল তারিখ। হাসনেবানু, জয়নাব, কাসেম ও আর আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জায়েদা কাঁদিয়াছিলেন কিনা, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

উদ্ধার পর্ব

(দ্বিতীয় প্রবাহ)

রে পথিক। রে পাষাণ হৃদয় পথিক। কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ?

এ শিরে হায়—খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার। এ শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিলেন? তুমি ত আর জয়নাবের রূপে মোহিত হও নাই? জয়নাব এমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা শির লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়িতেছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? সীমার। একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি? অর্থ? হায়রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রের শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ; কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাশ, এ সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি। কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত—মহাব্যস্ত; প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমারই জন্য—কেবলমাত্র তোমারই কারণে—কতজনে, তীর-তরবারি, বন্দুক-বর্শা, গোলাগুলি অকাতরে বক্ষ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে। তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে। পর্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে। রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর। ছলনে। তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক। কি মায়া! কি মোহিনী শক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও। কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও। কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও। তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমার জন্য প্রভু হোসেনের শির সীমারহস্তে খণ্ডিত। রাক্ষসী। তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ।

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব, তন্মধ্যে অর্থচিন্তাই প্রবল; চির অভাবগুলি আশু মোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি, লক্ষ টাকার অধিকারী আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত—যাই কোথা। বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া

নিশা যাপন করি। এ ত সকলই মহারাজ এজিদ-নামদারের রাজ্যভুক্ত। সৈনিক বেশ ; হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্য শির বিদ্ধ, মুখে ভয়ানক রোষের লক্ষণ ; কার সাধ্য—কে কি করিবে ?

সীমার এক গৃহীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশা যাপন করিবে জানাইল। স্কন্ধে বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির, অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। বুঝি রাজ-কর্মচারী হইবে মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। সাদরে সীমারকে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তি সহকারে অতিথি সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়। যদি অনুমতি করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার কহিল, "কি কথা ?"

"কথা আর কিছু নহে ; আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন ? আর এই বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের ?"

"ইহা অনেক কথা। তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাহার পিতা আলী এবং মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যাঁহার জননী, এ তাঁহারই শির। কারবালা প্রান্তরে মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্যের সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেবীর প্রতিমূর্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মোহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার সাদর অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।"

হ্যাঁ, এতক্ষণে জানিলাম আপনি কে ? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেবদেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যাহা ইচ্ছা গমন করিতেন, কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ সময়ে কৌশলে কি বল-প্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার

ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে, ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে, আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির,—আপাতত যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে; আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যুষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তি হেতু সীমারের কেবল শয়নে বিলম্ব; যেমনই শয়ন, অমনই অচেতন।

গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেবদেবীর আরাধনাতেই সর্বদা রত থাকিতেন। তাহার উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী বর্তমান। গৃহস্বামীর নাম 'আজর'।

সীমারের নিদ্রার ভাব দেখিয়া, আজর স্ত্রীপুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেবদেবীর উপাসক হউন, ইসলামধর্ম-বিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হইবে? পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেনের শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষ মাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সেও সর্বশক্তিমান ভগবানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তাহা মনে করিলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইলে, আর না হউক, জাতীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু পরম ধার্মিক, বিশেষ ঈশ্বর-ভক্ত, মহাপুরুষ মোহাম্মদের হৃদয়ের অংশ—ইহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেয়—বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না?

যে ধর্মই কেন হউক না ; পবিত্রতা রক্ষা করিতে, তৎকার্যে যোগ দিতে কে নিবারণ করিবে ? মহাপুরুষ মোহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা ? যুদ্ধে হত হয়েছেন বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য ? জগৎ কয় দিনের ? এজিদ। তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস ? জীবনশূন্য দেহের সদগতির সংবাদ শুনিয়া কি চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্বাণ হইত না ? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধজয়ের সংবাদ শুনিয়াও মিটিত না ? হোসেন-পরিবারের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্তলোক প্রকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে। তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস না। তোকে কোন্ ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না ; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভের বশবর্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি। তোর এই অমানুষিক কীর্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখে কত শত প্রকারে ঈশ্বরের গুণকীর্তন—কতকাল ঈশ্বরের মহত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে ? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণ হরণ করিয়াছিস ; কিন্তু তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন ; তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। তাহার ঔরসে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব। রক্ত-মাংস বীর্য ও গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানব-শরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাহা যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না ; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদগতির উপায় করিবে, প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে না।”

আজরের স্ত্রী বলিলেন, “এই হোসেন, বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলি ছিলেন। হায়। হায়। তাঁহার এই দশা। এ জীবন থাক বা যাক, প্রভাত হইতে না হইতেই আমরা এ পবিত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে।”

পুত্রেরা বলিল, “আমাদের জীবন পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিকহস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।”

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন, "ধার্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক। ধর্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে—রক্তে রক্তে লেশমাত্রও যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমার প্রাণে আঘাত লাগিবে কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কেন? ধার্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর-প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। পরোপকার ব্রতে জীবন পণ কথাটা শুনিয়া কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না।"

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে; নিশাদেবী জগৎকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে; জগৎলোচন কবিদেবকে পূর্বগগন প্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ কল্য দেখিয়াছে, আজ আবার দেখুক—নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক—পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক—সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক—ধর্মে দ্বেষ, ধর্মে হিংসা মানুষের শরীরে আছে কিনা তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক। ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র জায়া পরিজন বিয়োগ হইলে কাঁদিয়া থাকে। জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জীবন থাকিতেই জীবলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কাঁদিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে—মানুষের পরিচয় কি—মহাশক্তিসম্পন্ন হৃদয়ের ক্ষমতা কি—নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি—আজ ভাল করিয়া শিক্ষালাভ করুক।

জগৎ জাগিল। পূর্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া বর্শাহস্তে দণ্ডায়মান এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ। তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই রাগ করিও না। ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃতশরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই মৃত শত্রুর

শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ, তোমার রাজ্য সুসভ্য; তুমিও দিব্য সভ্য। এ অবস্থায় এ পশু-আচরণ কেন ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ; তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি; সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান। ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব। বিড়াল-তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী জগতে অনেক আছে—অনেক দেখিয়াছি, আজও দেখিলাম। তোমার ধর্মকাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, কারণ, বিধি-ব্যবস্থা সমুদয় তুলিয়া রাখ। ধর্মাবতারের ধূর্ততা, চতুরতা, সীমারের বুঝিতে আর বাকী নাই, ও কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ সোজা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে গিয়া মহারাজের নিকটে বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই। আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, যশঃকীর্তি, পরম দুঃখ কাতরতা—এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি ভাই?"

"ওহে ধার্মিক প্রবর। আমি ও সকল কথা অনেক জানি। টাকা যে কি জিনিস তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান আর কোথাও নাই—সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই—ভ্রাতা ভগ্নির নিকট একটি কথা বলিবার সুযোগও নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসার আশা নাই; কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে জীবনান্তেও টাকা,—জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ, তাহা

তুমি চিন বা না চিন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয়ই জানিও আমিও নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি? ওরে পাগল। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?"

"রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই। তোমার সহিত বাদ-বিসম্বাদ ও কৌশল করিতে আর ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাহার অধীনস্থ প্রজা, সাধ্য কি রাজ-কর্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি, মস্তক পাইলেই ত ভাই তুমি ক্ষান্ত হও?" "হ্যাঁ মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি, মহারাজের নিকট তোমার প্রশংসাই করিব। আমাকে আদর আহ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা করিয়াছ, সকলই বলিব। হয়ত ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দাও।"

আজর স্ত্রী-পুত্রগণের নিকট যাইয়া বিনম্রভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা ওই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আবার সে-ও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এ অবস্থায় উহার প্রাণ বধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপপঙ্কিলে ডুবিতে হয়! রাজ অনুচর, রাজকর্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে, প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সে-ও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও। সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্ধ কালও সে এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া দেহ সন্ধান করিরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ, আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইবে? একি কথা। আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক্ আমাদের জীবনে। ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে। যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষের পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সেই পিতার শির যে কারণে দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে, সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতঃ, আর বিলম্ব করিবেন না; খণ্ডিত মস্তক প্রদত্ত হইলেই যদি সৈনিক পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ। তুমি ধন্য। জগতে তুমি ধন্য। পরোপকারব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত। তোমার জন্ম সার্থক। প্রাণাধিক, আমারও জীবন সার্থক; যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক। প্রাণাধিক, জগতে জন্মিয়া পশু-পক্ষীদের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্তে উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য—বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য—আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রীবালক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন; আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

উঃ! কি সাহস। কি সহ্যগুণ। দেখরে পাষণ্ডহৃদয় এজিদ। দেখ্। পরোপকারব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ্। দেখ্রে সীমার, তুইও দেখ্। মনুষ্য জীবনের ব্যবহার দেখ্। খড়্গ কম্পিত হইল, রঞ্জিত হইল; পরোপকার আর মৃত শিরের সংকার হেতু প্রাণাধিক পুত্র-শোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল। লৌহনির্মিত খড়্গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন্ ঝন্ রবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু আজরের রক্তমাংসের শরীর হেলিল না; শিহরিল না—মুখমণ্ডল মলিন হইল না। ধন্য রে পরোপকার। ধন্য রে হৃদয়।

এদিকে সীমার বর্শাহস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহাচীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে।"

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সীমার মহাহর্ষে শির বর্শাবিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল, সদ্যোকর্তিত শির শোণিতে রঞ্জিত, রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, "একি? তুমি উন্মাদ হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। আহা এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ। এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত। নরাধম, এই বুঝি তোর সাধুতা? কি প্রবঞ্চক। কি পাষণ্ড। ওরে নরপিশাচ। আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস?"

"ভ্রাতঃ। আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন একি কথা—এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানি যে, তুমি একজন প্রধান দস্যু। টাকার লোভে কাহার কি সর্বনাশ করিবে কে জানে।"

"তুমি কি পুণ্যফলে হোসেনের মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই? মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম। এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।"

"কথা কাটাকাটি করা চলিবে না। যে মস্তকের জন্য কারবালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকের জন্য চতুর্দিকে 'হায় হোসেন', 'হায় হোসেন' রব হইতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্তে এ কি? ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

"ভাই, তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। ইহা ত মানুষের ধর্ম নহে।"

সীমার মহা গোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এখানেই রাখিয়া দাও; আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায়

প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবার হোসেনের শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি?"

আজরের মুখের ভাব দেখিয়া মধ্যম পুত্র বলিলেন, "পিতঃ, চিন্তা কি? আমরা সকলই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিকপ্রবর চলিয়া যাইবে। মধ্যম সন্তান দণ্ডায়মান হইল, খড়গ হস্তে করুন। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্ক রাজ্যের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।"

আজর পুনরায় খড়গ হস্তে লইলেন। যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে সীমার আরও আশ্চর্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উন্মাদ কি করিতেছে?" প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে পাগল। তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"একি কথা ভ্রাতঃ। তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে।"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই, হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে; বল ত ইহারা তোমার কে?"

"এই দুইটি আমার সন্তান।"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত ডাকাত। টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছ। ছি। ছি। তোমার ন্যায় অর্থ পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দাও। নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ। আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি লইয়া যাও।"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটাই চাহিতেছি। সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলে আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল যে, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ। আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনও পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাই না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই। তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ। টাকার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস? তোর সকলই কপটতা; শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্তে তিনটি দিয়াছি, আর দিব না, তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি, এই যা, একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা।" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়নগৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে। আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার একলম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না; ভয় নাই, সীমারের হস্ত কখনও স্ত্রীবধে উত্তোলিত হয় নাই। কোন ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিল, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইয়া গেল। এক পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম—আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না—হোসেন-শির কারবালায় হইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আর কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

"কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস না? ওরে পাপীয়সী। তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস না?" এই বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই, আজরের স্ত্রী খড়্গ-হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস। ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম,

দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি; পরপর আঘাতের স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিলেন, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব। আমার বাঁচিয়া থাকা, আর না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়্গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবনসর্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস।" এই কথা বলিতে বলিতে আজর-স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শাবিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজরের স্ত্রী মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বাম হস্তে সাধ্বীসতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্মবিসর্জন করিলেন,—সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

গো-জীবন

(প্রথম সংস্করণ—১৮৮৯)

আমি মোস্লমান—গো-জাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো-বৎসের প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি; কিন্তু ন্যায়চক্ষে যাহা দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব। স্বাভাবিকভাবে কোন্ ভাব-বশে গোপন করিব? মনে এক, মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব। মার্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগৎ পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি

কোন মোস্লমান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের হালাল হারাম দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। এ কথাও স্বীকার্য যে, গো-মাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্ব-মাংসও অন্য মতে (শাফি) হালাল; আমার মতে (হানাফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে (মকরুহ); আবার ঐ শাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তস্থলে এ কথা বলিতে পারি যে, রজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্রধৌত ডুবিয়া থাকে, শাফি মতে দায় দিয়া সে মনুষ্য পদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝলসা লইয়া ঝলসা পোড়া, সিদ্ধ সুরুয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিয়া উদরে ফেল, কোন চিন্তা নাই, কখনো পাপের খাতায় নাম উঠিবে না। ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে এ কথা লিখা নাই যে, গো হাড় কামড়াতেই হইবে। গো-মাংস গলধঃ করিতেই হইবে; না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য—যথা বরাহ—সে বিষয় পবিত্র কোরান শরীফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইও না" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক জাহান্নাম তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে; আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে, খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গো-মাংস না খাইলে মোস্লমান থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—এ কথা কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি, খাই না। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা—গিলি না। গো-সাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষি না; যে ছাগীতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহু আকবর" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা-পরিতৃপ্ত আশায় বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটা গোটা চর্বিদার জিনিস বানাইয়া কোরমা কালিয়া কাবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উঁট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য; তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গো-জাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও

কি গো-মাংস না খাইলেই চলে না। ঘোড়া, মহিষ, বন-গরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোশ সকলি ত চলিতে পারে। এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার জবাব কে দিবে?

গো-দুগ্ধই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়—হায়। অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? মনে মনে একটি কথা উঠিতেছে—মায়ের ত দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গো-রস মায়ের উদরে না গেলে মায়ের স্তনে দুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গো-রসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্কান্নে সদ্যোজাত নবশক্তি প্রাণ রক্ষা হয় না; দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাদ্য নির্দিষ্ট নাই যে, শুধু সে খাদ্যটি খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।

উদাসীন পথিকের মনের কথা

(প্রকাশকাল—১২৯৭) (১৮৯০)

মুখবন্ধ

গুপ্তকথা, গুপ্তলিপি, গুপ্তকাণ্ড, গুপ্তরহস্য, গুপ্তপ্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মনের কথা মনেই রহিয়াছে। মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমনকি জীবনসংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতি স্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। সত্য কথা বলিতে দোষ কি? আমার জন্য যে কাঁদে এমন একটি চক্ষুও নাই। চক্ষু কাঁদে না মন কাঁদে? (যাহা চক্ষে দেখতে পাই) অনেকেই অনেকের জন্য কাঁদে। মনের কান্নার সহিত একত্র মিলিয়া-মিশিয়া কাঁদে? না উপরিভাবেই চক্ষে জল গড়াইতে থাকে? আবার পরস্পর তুমি "আমার" আমি তোমার বলিয়া প্রেমের হাট; মায়ার

বাজার বসাইয়া দেই। সকলেই কি প্রেমের দোকানদারী করিতে জানি? না—ঠিকভাবে খরিদ-বিক্রী করে মহাজনকে কিছু লাভ দেখাইতে পারি? না—সকলই মুখে। এখন বাকী রইল, "আমি" কারণ, "তুমি আমার আমি তোমার।" আমি কার কে? আমিই বা কে? সেই আমি—যাহার জন্য কাঁদিবার একটি চক্ষুও নাই—আমি সেই আমি। কিন্তু আমি এমনই অজ্ঞ যে, একত্র একদেহ একপ্রাণ লইয়া অনেকদিন কাটাইলাম। চক্ষুতে অন্ধকার ঘিরিল, কালকেশ ধবল হৈয়া আসিল। জীবনশেষে যাহা যাহা হইবার কথা, তাহা সকলই হইল, চিনিলাম না,—চিনিতে পারিলাম না—আমি কে? আভাষ-ইঙ্গিতে বুঝিতেও পারিলাম না—আমি কে?

আমারই যখন আমিত্বে নানা গোল—তখন "আমি তোমার" এ কথাটাও বোধ হয় মুখের কথা—কথারই কথা। আমাতেও সন্দেহ তোমাতেও সন্দেহ। আসলেই ভুল। আমিও আমার নহে। তুমি তোমার নহে। কাজেই "আমার" "তোমার" কথাটাও কিছু নহে। আপন বলিতে আমার কেহ নাই। কার্য এবং ব্যবহারেই মায়া—সংসারে স্বার্থের অপছায়া।

এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি" আমরা—ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, আর না-জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা। সে কথার ইতি নাই। জীবনের ইতির সহিতেই কথার ইতি—আমার মনের কথার শেষ।

জলধির জলের ঘাত-প্রতিঘাতেই স্তরের সৃষ্টি। সংসার-সাগরেরও ঠিক তাহাই। সেই ভীষণ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যে সকল স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইব। আর মনের কথা শুনাইব।

পাঠক। সমালোচনার ভয় আমার নাই। কথা শুনাইয়া যাইব এইমাত্র কথা। তবে একটি কথা, যদি কাহারো মনের কথার সহিত আমার মনের কথার কোন অংশ, ঝাঁকে জোঁকে, আকারে প্রকারে, ইঙ্গিতে আভাষে, ঠিক বেঠিক মিল গরমিল বোধ হয়, তবে কিছু মনে করিবেন না। কোন সন্দেহ করিবেন না। মার্জনা প্রার্থনা করি, ভুলভ্রান্তি সকলেরই আছে।

আপনাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী—উদাসী পথিক।

['বিষাদ সিন্ধু' (প্রথম পর্ব) প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় কভার পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন ছিল এরূপ, "নূতন পুস্তক—মনের কথা। নাম, নিবাস, স্থান এবং ঘটনা সমুদয় সত্য, বিন্দুমাত্রও কল্পিত নহে। এরূপ সত্য ঘটনার পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় আর আছে কিনা সন্দেহ। দুইশত গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই মীর মশাররফ হোসেনের মনের কথা প্রকাশ করিব। সুদ্ধ একখানি পত্র লিখিয়া আমার নিকট মনের কথা জানাইলেই অর্ধমূল্যে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, মুদ্রাঙ্কন-কার্য শেষ হইলেই মূল্য নির্ধারিত করিয়া 'বঙ্গবাসী'তে স্বতন্ত্ররূপে বিজ্ঞাপন দিব।—আইনউদ্দিন বিশ্বাস—কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া।]

উদাসীন পথিকের মনের কথা

(প্রথম সংস্করণ—১৮৯০)

সপ্তাবিংশ তরঙ্গ ঃ অপূর্ব দৃশ্য

[প্রকৃতপক্ষে এটি হবে দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ। কেননা পঞ্চদশ তরঙ্গের পর ষোড়শ তরঙ্গকে ভুলক্রমে 'একাদশ তরঙ্গ' মুদ্রিত হয়। এর ফলে এই বিভ্রান্তি।]

জগৎ অসীম নহে। সমুদ্রতলও অতলস্পর্শ নহে। জগতে যাহা আছে তাহার সীমা পরিমাণ শেষ যাহাই কেন বল না অবশ্যই আছে। সুখ-দুঃখ, বিরহ-যন্ত্রণা, উন্নতি-অবনতি সকলই ঐ সীমারেখারই মধ্যগত। জন্মই মৃত্যুর কারণ। সুস্থতাই পীড়ার পূর্ব-লক্ষণ, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ দুইটি কথার মধ্যে আদি, মধ্য, অন্ত, সীমা সকলই রহিয়াছে। আবার দেখুন, উদয়ই অস্তের কারণ। রজনীই প্রভাতের আদি লক্ষণ। আছে বলিয়াই আবার সন্ধ্যা। সুতরাং উন্নতির শেষ সীমাই অবনতির সুত্রপাত। সীমারেখা স্পর্শ করিলেই পরিবর্তন। কেনীর দৌতাত্ম্য-অগ্নি রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া একেবারে সীমারেখা পর্যন্ত ঠেকিয়াছে। কার সাধ্য রক্ষা করে? প্রকৃতি কাহারও নিজস্ব রূপে আয়ত্তাধীন নহে। স্বভাবের স্ব, ভাবের অভাব কখনই হইতে পারে না। জমিদার, তালুকদার, মধ্যশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর লোকের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না। কি করে কোথায় গেলে রক্ষা পায়। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের গতি অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে।

অন্যদিকে হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায় এবং 'পেটরিয়টে'র সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডায় অনেক বঙ্গভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। অনেকের হস্তে উঠিয়া যাহা দেখাইবার তাহাও দেখাইতেছে। ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালীসিংহ আনন্দসহকারে দান করিয়া তরজাকারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে শুভ্র জ্যোতিসহকারে, পূর্ণ কলেবরে, পূর্ণ চন্দ্ররূপে দেখা দিয়াছেন; প্রজার দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। প্রজার আর্তনাদে বঙ্গেশ্বরের আসন পর্যন্ত টলিয়াছে। মহামতি লাট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য, নীলকরের দৌরাত্ম্য স্বয়ং তদন্তের জন্য 'সোনামুখী' আশ্রয়ে মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন।

বর্ষাকাল। কালীগঙ্গা জলে পরিপূর্ণ। 'সোনামুখী' নদীয়া অঞ্চল ঘুরিয়া কুমার নদ হইয়া কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে। কালীগঙ্গার আজ অপার আনন্দ। বঙ্গেশ্বরের বাষ্পীয় তরী বক্ষে করিয়া প্রজার দুরবস্থা, নীলকরের অত্যাচার দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে শালঘর মধুয়ার কুঠি পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। পাঠক। যখন সৌভাগ্য-গগনে সুবাতাস বহিতে থাকে, তখন তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না। আজ প্রজার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই শুনিয়াছে যে, এই জাহাজে লাট সাহেব আসিয়াছেন। আমাদের যথার্থ রাজা এই কলের নৌকায় আসিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা—লাট সাহেবকে শুনাইব। মনের কথা মন ভরিয়া বলিব। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেই বঙ্গবধীপ স্বয়ং মফঃস্বলে বাহির হইয়াছেন। প্রজার মনে এই বিশ্বাস। ঘটনাও তাহাই—ঘটিলও তাহাই।

কালীগঙ্গার দুই ধারে সহস্রাধিক প্রজা স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিল। শুধু দৌড়িল তাহা নহে—সহস্র মুখে বলিতে লাগিল—দোহাই ধর্মাবতার। আমরা মারা গেলোম। আমরা একেবারে সারা হইলাম। আপনি রাজা, আমরা প্রজা; আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা ধনে প্রাণে সারা হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার। আমরা ধনে প্রাণে সারা হইয়াছি। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া যান। যমের হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যান। 'শ্যামচাঁদ' আঘাতে

পৃষ্ঠে দাগ বসিয়াছে; একবার পবিত্র চক্ষে সেই দাগগুলি দেখিয়া যান। আপনি দেশের রাজা, আমাদের পেটের দিকে মুখের দিকে একবার চাহিয়া যান। দোহাই ধর্মাবতার। আমাদের দুরবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া যান।

সে কান্না কে শোনে? কাহার কর্ণেই বা যাইবে? ইঞ্জিনের স্বাভাবিক বিকট শব্দে প্রজার আর্তনাদ লাট মহামতির কর্ণে উঠিবে কেন? বোধ হয় তাহারা ভাবিয়াছিলেন, গ্রাম্য লোক স্টিমার কখনও দেখে নাই, তাই ছুটাছুটি করিয়া সোরগোল করিয়া আমাদের সহিত দেখিতেছে। আহ্লাদে দৌড়াইতেছে। ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি; ক্রমেই কান্নার রোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি। স্টিমার উজানমুখে যাইতেছে। স্রোতবেগ অতিক্রম করিয়া যাইতে সম্ভবতঃ একটু ধীরে চলিয়াছে। কালীগঙ্গাও বেশী প্রশস্ত নহে। এক পারের কথা অপর পারের লোকে বিনা মনযোগে বুঝিতে পারে। স্টিমারের সেই কর্ণবেদী ধবধব ঘসঘস শব্দ পরাজয় করিয়া সে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ—গ্রাণ্ট মহামতির কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চৈতন্য হইলেন। যেমনই মনযোগ, অমনি হৃদয়ে আঘাত। উভয় কুলের বহুসংখ্যক প্রজার আর্তনাদে আজ বঙ্গেশ্বরের মন গলিয়া গেল। মনে মনে মনস্থ করিলেন যে, জেলায় যাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রজার দুরবস্থা নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। মহামতীর মনের ভাব প্রজার জানিবার ক্ষমতা হইল না। আশ্বাসমূলক একটি কথা শুনিতেও তাহাদের ভাগ্য হইল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, আমাদের এই কান্নায় লাট সাহেব স্টিমার থামাইতে আদেশ করিবেন; আমরা মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইব। দুরবস্থার কাহিনী আজ মনের সাধে শুনাইব। তাহা হইল না। স্টিমার থামিল না। কি ভীষণ দৃশ্য। "নীলকরের দৌরাত্ম্য-আগুনে আর কতকাল জ্বলিব। রাজ-গোচরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জন করিব সেও স্বীকার। তত্রাচ নীল আর বুনিব না।" এই কথা স্থির করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা নদীকূল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে ডুবিতে স্টিমারের দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণের মায়া নাই। জীবনের আশা নাই, কোনরূপ সুখের ইচ্ছাও আর নাই। কেনীর দৌরাত্ম্যে মরিতেই হইবে। আর কেন? রাজ-সম্মুখেই ডুবিয়া মরিব। এই কথা মনে করিয়াই সহস্রাধিক প্রজা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; নদীস্রোতে অঙ্গ ভাসাইল। মহামতি লাট বাহাদুর মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। স্টিমার থামাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং স্টিমারস্থ সমুদয় জালি-বোট জলে নামাইয়া প্রজাদিগকে উঠাইতে আদেশ করিলেন। যাহারা সন্তরণ দিয়া

স্টিমার ধরিল, স্টিমারের উপর উঠিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। ক্রমে সমুদয় প্রজা স্টিমারের চতুঃপার্শ্বে, কেহ জলে, কেহ জালী-বোটে, কেহ ডাঙ্গায় থাকিয়া আপন আপন দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া লাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। ১০।১২ জন প্রজাকে স্টিমারে লইয়া অপর অপর সকলকে আশ্বাসবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, তোমাদের যাহার যে নালিশ থাকে, আগামী পরশু শনিবার পাবনায় গিয়া আমাকে জানাইও। আমি তোমাদের বিচার অবশ্যই করিব। তোমরা কুঠিয়ালকে ভয় করিও না। এদেশে তাহারাও যেমন প্রজা, তোমরাও সেইরূপ প্রজা। এই বলিয়া স্টিমার ছাড়িয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সোনামুখী গৌরীর অগাধ জলে আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে গৌরী পার হইয়া পদ্মার স্রোতে ভাসিয়া পাবনা অভিমুখে চলিল।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ (প্রকৃতপক্ষে ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ)

নীলবিদ্রোহের সূত্রপাত। বাঙ্গালায় নীলকরের অধঃপতনের সূত্রপাত। প্রজার আনন্দের সীমা নাই। সকালে সকালে স্নান আহার করিয়া ঘরে যাহা ছিল সিদ্ধ-পোড়া-ভাতে ভাত, যাহা জুটিল আহার করিয়া গ্রামের মাথাল মাথাল প্রজা ছাতি লাঠি গামছা লইয়া লাট-দরবারে যাত্রা করিল। নীলকরের দৌরাত্ম্য-আগুনে যাহারা পুড়িয়া ছারখারে যাইতেছিল, তাহারাই জিলায় চলিল।

এদিকে কেনী পথে পথে লাঠিয়াল সর্দার, দেশওয়ালী, দোবে, চোবে পাঁড়ে সিং মতাইন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এলাকায় যে প্রজা পাবনায় যাইবে তাহার পীঠের চামড়া থাকিবার ত কথাই নাই। তাহার পর অন্য ব্যবস্থা। ফিরে গিয়ে বাস্তুভিটার মাটি আর চক্ষে দেখিতে হইবে না। স্ত্রী পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

এ কথা কুঠিয়াল পক্ষের মুখে জারী হইল। প্রজার কানে উঠিতেও বাকি রহিল না। কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাতাসের কথা বাতাসেই উড়িয়া গেল। প্রজার মনে সেই উৎসাহ, সেই আনন্দ। কার কথা কে শোনে? কে আজ সে কথা গ্রাহ্য করে? আমীন, তাগাদগীর, পাইক-বরকন্দাজের হুকুমের চোটেই আগুন জ্বলিয়াছে; আজ খোদ কেনীর হুকুম শুন্যে শুন্যে

উড়িয়া গেল। এক কানে প্রবেশ—অন্য কানে বাহির। হুকুম-দখলের ভয়ে প্রজার হৃদয় থরহরি কম্পে আজ কাঁপিয়া উঠিল না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে এক-জোটবদ্ধ হইয়া জিলায় চলিল। কি আশ্চর্য। খোদ যমের হুকুম আজ শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল।

হিন্দু-মুসলমান একত্রে একযোগে পূর্ণ উৎসাহে বক্ষ বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিল। কাহারও কোন কথা কানে করিল না। কারও বাধা মানিল না। কাল বঙ্গেশ্বরের মুখে যে কথা শুনিয়াছে সেই কথাতেই প্রজার চিরপরিশুষ্ক হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশা-বারির সঞ্চার হইয়াছে। তাহাতেই এত আনন্দ। কার সাধ্য বাধা দেয়? কার সাধ্য সে মাতোয়ারাদিগের গতি ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক রোধ করে? কে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে ঐ কথা মুখে করিয়া দাঁড়ায়? পথঘাট ভরিয়া প্রজাগণ দলে দলে পাবনা অভিমুখে মনের আনন্দে চলিল। প্রজার বল, প্রজার সাহস, প্রজার ঐ সকল কথা কেনীর কর্ণে উঠিলে কেনী কি করিতেন জানি না। তাঁহার কর্ণে এইমাত্র উঠিল যে,—"অমুক অমুক গ্রামের প্রজারা হুকুম মানিল না। নিশ্চয়ই তাহারা পাবনায় যাইবে।"

আর কি কথা আছে? যেই শুনা অমনি হুকুম। প্রধান প্রধান আমলাগণ হাতি ঘোড়ায় চড়িয়া, যমদূতের ন্যায় বাছা বাছা সর্দার-লাঠিয়াল, হিন্দুস্থানী, দেশওয়ালী সেপাইগণ সঙ্গে করিয়া মনিবের নিকট বাহাদুরী লইতে, গ্রামে গ্রামে প্রজা-দমনে চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চলিলেন। চলিলেন না—ছুটিলেন। যে দল যে গ্রামের প্রজা চক্ষে পড়িল, তাহাদের চক্ষের চাউনী দেখিয়াই তাঁহাদের শরীর গরম হইয়া গেল। চক্ষের কথা ত আগেই বলা হয়েছে। কারণ যাহা কখনও দেখেন নাই, কানে শুনেন নাই, তাহাই দেখিলেন এবং শুনিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই একজন সোর করিয়া উঠিল—"ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে, তোরা কে কোথায়?"—

হাতের মাথায় যে যাহা পাইল, সে-ই তাহা লইয়া ছুটিল। চক্ষের পলক ফিরাইতে না ফিরাইতে বহু লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল—"ভাল মানুষ হও তবে চলে যাও, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে ফিরে যাও। আর এক পা এদিকে আসিলেই মাথা ভাঙ্গবো। কাল লাট সাহেবের মুখে শুনিয়াছি, কুঠেল সাহেবরা আমাদের রাজা নয়; হর্তা-

কর্তার মালিকও নয়। ওরে আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই। আজ আমরা আমাদের রাজার দরবারে যাইব। এতদিন যা যা করেছ, তাই জানাব। একটি কথাও মিছে বলিব না। এখন বেশ বুঝেছি। আর হবে না। এখন খুব বুঝেছি, আমরাও প্রজা তোমরাও প্রজা। আমরাও যা তোমরাও তাই। ভালাই চাস ফিরে যা—আর আগে বাড়িস না। আমরা যথার্থ রাজার কাছে যাচ্ছি। তোদের ও ভেল রাজার কথা কে শোনে রে?"

কুঠির চাকর। কম পাত্র নহে। সহসা হটিবার লোক নহে—হটিল না। কিন্তু প্রজার কথায় পায়ের তালু হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল। ভাবিল না, চিন্তাও করিল না, চিন্তা করিবার সময়ও পাইল না। হঠাৎ এরূপ কেন হইল? এরূপ পরিবর্তন কেন ঘটিল? উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাবাও কঠিন কথা। চিন্তা করাও শক্ত কথা। তাহাতে কুঠির চাকর, পূর্ণ মাত্রায় সর্বদাই রাগে চড়া! ঐ সকল মর্মভেদী কথায় রেগে ভূত হইলেন। স্ব স্ব পদমর্যাদা, কুঠির ক্ষমতা, নিজ এলাকা। কাল যাকে চাবুক সই করেছি, সাহেবের শ্যামচাঁদের ঘা আজ পর্যন্ত পিঠে বিরাজ কচ্ছে। উঠতে কানমলা, বসতে কান-মলা, লাথী, কীল, চড়-চাপড়ের সীমা কে করে? মেয়ে মানুষ ধরে নীল কাটাইয়াছি। যে ব্যাটা হাত নেড়ে বেশী কথা বলছে, কালও এই কালি-গঙ্গায় ঐ ব্যাটার ঘাড়ে গুণ-বাড়ি দিয়া নীলের নৌকায় গুণ টানাইয়াছি। আজ এত বড় কথা? কি কাণ্ড। এই সকল কথা মনে মনে তুলিয়া শেষ করিতে করিতেই উত্তেজিতভাবে তেরী মেরী করিয়া মুখে স্পষ্ট কথা ফুটিল—মার + + + দের। মার + + + দের। এক মুখ হইতে কথা ছুটিতেই অধীনস্থদিগের ৫০ মুখে ঐ কথা—

ঐ পীট পীট প্রায় ৫ শত মুখে আন্তরিক ক্রোধের সহিত ঐ কথা বেশীরভাগ প্রজার মনের অন্তঃস্থান হইতে বাহির হইল আর কি। কর খুন। মার + + + দের। ভাঙ্গ মাথা, মার লাঠি—

যাহা ঘটিবার ঘটিল—শেষে যাহা ঘটিল, সে কথা প্রকাশ করিতে যথার্থ বলিতেছি, পথিকের মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। চক্ষে জল আসিল। পাঠক। যথার্থ বলিতেছি, মনে সেই এক প্রকার ভাবের উদয় হইল। যে, হা। কাল কি? আজ কি? ভগবান। তোমার যে অপার মহিমা, তোমার যে অপার লীলা, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজিকার ঘটনা। নীলকর এবং প্রজার ঘটনা, সাধারণ চক্ষে দেখিতে গেলে কিছুই নহে। হয়ত কাহারও চক্ষে নাও পড়িতে

পারে। কিন্তু স্থিরভাবে একবার ভাবিয়া দেখিলে আজিকার এই ঘটনায় ভগবানের একটি মহৎ মহিমার সপ্রমাণ হইল।

পাঠক। অনেকেই গান গায়, অনেকেই গানে গলিয়া যায়। কেনীর কার্যকারক, লাঠিয়ালদিগের অবস্থা দেখিয়া মাননীয় ভ্রাতার একটি গান পথিকের মনে পড়িল। গানটি শুনুন—উপস্থিত ঘটনার ভাব এই গানেই পাইবেন—বিস্তারিত বর্ণনার আর শক্তি হইল না, গানেই বুঝিবেন। শুনুন।

গান

দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ, কিবা অদ্ভুত ; দুনিয়া সব আজব খেলা।
আজি কেউ বাদশা হয়ে দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা—
কাল আবার সব হারায়ে ফকির হয়ে সার করেছে গাছের তলা—
আজি যে ধন গরিমায়, লোকের মাথায় মারছে জুতা এড়িতোলা—
কাল আবার কপনী পরে টুকনী করে, কান্দে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা॥
আজি যেখানে শহর কতই বহর বসিয়াছে বাজার মেলা—
কাল আবার তথা নিরবধি করছে রে তরঙ্গ খেলা॥

পাঠক। কুঠির লোক প্রজা-শাসনে দল বান্ধিয়া দলে দলে কুঠির নিকটবর্তী যে যে গ্রামে বাহাদুরী লইতে আসিয়াছিল,—যে দল যে গ্রামে ঢুকিল, সেই গ্রামেই ঐ এক কথা। একরূপ অভ্যর্থনা। একরূপ ভাব। শেষফল সকল স্থানেই সমান। গ্রামবিশেষে কিছু ইতরবিশেষ যে না ঘটিল তাহাও নহে। কোন দলই দল বাঁধিয়া আর কুঠিমুখ হইতে পারিল না। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা আকারে, যে যে প্রকারে সুবিধা-সুযোগ পাইল, প্রাণ লইয়া কুঠিমুখে ছুটিল। ছুটিল কি। পালাইল। কাহাকে বাধ্য হইয়া ঘোড়াটি ছাড়িয়া যাইতে হইল। কেহ কেহ পরিধেয় বসন ফেলিয়া বাধ্য হইয়া দিগম্বর-বেশে মাঠে মাঠে দৌড়িয়া পালাইল। ঢাল, তরবারি, লাঠি-ঠেঙ্গা কালি-গঙ্গার স্রোতে যাহা ভাসিবার ভাসিয়া চলিল, যাহা ডুবিবার ঐখানেই ডুবিয়া পড়িল। জলে ফেলিল কে? অমোঘ অস্ত্রসকল আজ প্রথম জলে ভাসিল। এই প্রথম জলে ডুবিল। যাহারা দরবারে যাইতে একটু বাধা পাইয়াছিল, তাহারা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মনের আনন্দে সম্পূর্ণ উৎসাহে জিলায় লাট-দরবারে চলিল। পূর্বে যাহাদের যাইবার কোন কথাই ছিল না, উপস্থিত ঘটনায় তাহারাও অনেকে তাহাদের সঙ্গী হইল। কি জানি আবার কোন্ দুষমন

কোন্ পথে কি ঘটনা ঘটায়। হিন্দু-মুসলমান একত্রে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নাম করিয়া সার বাঁধিয়া পথে বাহির হইল। কালিগঙ্গায়, গৌরী-গর্ভে নৌকায় পদ্মার ঘাটে এবং চলতি রাস্তায়, পদব্রজে কত লোক যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সকলের মুখেই আনন্দের আভা, সকলেই যেন কি একটা মহৎকার্যে কৃতকার্য হইবে আশায়ই মহাখুশী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত। সকলেই যেন জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। অবিচারে অত্যাচারে এতদিন জেলখানায় পচিতেছিল। দৈববলে বলিয়ান হইয়া জেল ভাঙ্গিয়া যেন কোন যথার্থ আশ্রয়দাতার পদাশ্রয় লইতে বেগে ছুটিয়াছে। পদ্মা-গৌরী সংযোগস্থল বড়ই ভয়ানক। পদ্মা পারি না দিলে জিলায় যাইবার উপায় নাই। নৌকাতে পদ্মা পার হইতে হয়। সুখ পথে বান্দা রাস্তা বহিয়া গেলেও কাঁচা দিয়াড়ের ঘাটে পাটনির নৌকায় খেয়া পার হইতে হয়। পাঠক। চলুন আমরাও পদ্মাপারে যাই।

এর উপায় কি ?

(দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৯২)

দ্বিতীয় রঙ্গভূমি

রাধাকান্ত বাবুর বাড়ী, মুক্তকেশীর শয়নঘর।

(মুক্তকেশী এবং রাইমণি আসীনা।)

রাই। তুমি হয়ে এত সয়ে থাক। আমি হলে এতদিন যা মনে হত তাই কর্তেম। কার মুখের দিকে চাইতেম না। কয়েদির মত দু'বেলা দুটো খাব, আর মনের আগুনে গুমরে মরব ; একটি কথাও বলতে পার্ব না। বল ত, এত কার প্রাণে সয় ? আজকাল ঘরের বৌ হলেই যে চিরকাল মনের আগুনে জলে-পুড়ে মর্তে হবে, এ ত আর বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই ?

মুক্ত। বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি করে বুঝতে পারি। শতেকের মধ্যে যখন একটাও খুঁজে পাইনে, তখন আর অদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ দেব।

রাই। সুধু অদৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমারও দোষ আছে। তুমি কি করে সয়ে থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না। এত কি আর চক্ষে দেখে সওয়া যায়?

মুক্ত। (মলিন মুখে) সৈ। আমার মনের কথা ত তোমার কাছে কিছুই ছাপা নাই। যখন যেভাবে রয়েছি তুমি সকলই জান। আজকাল যে দুঃখে দিন-রাত যাচ্ছে, তা না জাস্তে পাচ্ছ এমন নয়। একি হল? এখন আর প্রাণে সয় না। আগে মাসান্তরে দুই-একদিন দেখা পেতেম, কোন কোন দিন হাসি-তামাসা করে দুই-একটা কথা বলতেন। আমি ভাবতেম যে আমার—আমারই আছে, সময় সময় মুখখানা দেখলেই হল, সাধও মিটলো। যেমন চেয়েছি, তেমনি বিধি দিয়েছেন। সুখই কি আর দুঃখই কি? এখন এমন হয়েছে, দেখাশুনার নাম নেই। আমি যে একজন তার বাড়ীতে আছি, আমায় যে কখনও বিয়ে করেছিলেন (ক্রন্দন) এ তাঁর মনে আছে কিনা সন্দেহ। চিরকাল আইবড় থাকতেম সেও ভাল ছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রইতেম তাতেও দুঃখ হত না; থেকে—নেই, আমার আমার নয়, আমি যার, সে পরের। আমি দিন রাত কাঁদি। সে মনেও করে না, এ দুঃখ আর কাকে বলি।

রাই। তুমি আগে হাত থাট করে কিল দিয়ে ঠকেছো, মনে মনে জাস্তে আমিই সকল, আমি ভালবাসা। সময় সময় হেসে দুটো কথা বলতো তাতেই আহ্লাদে গলে পড়তে। সৈ। পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই। এক কথাই আছে, "নূতনে পোড়ে মন পুরাতনে জ্বালাতন।" এরপর তুমি যেমন হাবা, এ কালে আর একটা জোড়া পাওয়া ভার। এখন কলি কাল, সোজা কথায় কাজ চলে না; হাবা মেয়ে হলে ভাতার জব্দ থাকে না; নরম গরম দুই-ই চাই। কখনও ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি ত অনেকদিন হতেই দেখে আসছি, যদি কোনদিন রাগ করে মুখখানি ভারি করে বসে থাক, বাবু এসে দুটো কথা বলতেই জল হয়ে গেলে, হাসি দেখে অমনি হেসে ফেলে সকল কথাই ভুলে বসলে, এতে ছাই আর কি হবে?

মুক্ত। সৈ। মনের কথা বলি। মনে মনে আঁচ করি যে, আজ একখানা করব, আবার ভাবি যে, আজ না হয় কাল করব ; এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন তার মুখখানি নজরে পড়লে সকলই ভুলে যাই। হাসিমুখে দুটো কথা শুনলে আর আগের ভাব কিছুই মনে থাকে না।

রাই। তা বুঝেছি। অমন করেই ত তোমার মাথা তুমি খেয়েছ। বানরকে লাই দিলে মাথায়,—তা জান ?

মুক্ত। ছি সৈ। স্বামী, তাকে—

রাই। তা যাই বল, যাই বল। মনমোহিনীর কথা শোন নাই, আজকাল স্বামী পূজা কল্লে চলে না। সে কালও নাই, তেমন স্বামীও নাই। এখনকার মদখোর আর বেশ্যাখোর স্বামী যে বানর হতেও বাড়া। তুমি যদি দু'বেলা দু' ঘা কসে জুতো মারতে তা হলে এত করে মাথায় চড়ত না। মেয়ে বলি মনমোহিনী। যেমন বিষ তেমনি বোজা। একদিন কার বাড়ীতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে রসিক বাবুকে ত আচ্ছা করে বিষঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে। চন্দ্র দাদা, নেতার ঘরে বসে ইয়ার নিয়ে মজা করছিলেন। কুমুদিনী সেই রাত্রে বাড়ী হতে গোপনে বেরিয়ে নেতার ঘরের কানাচি দাঁড়িয়ে বড় বড় করে বলতে লাগল, চন্দ্রবাবু আপনি আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে নুকুচুরি খেলচেন, আমিও চল্লেম। চন্দ্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কত রকমে সেধে বাড়ী নিয়ে গেলেন। আর কখনও কারও নাম করেন না।

মুক্ত। (কাতরস্বরে) যা হবার তা হয়েছে। সৈ এখন এর উপায় কি ? কত লোকের কাছে কত কথা শুনি। পাড়ার ছেলেমেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে আরও কত বলে। কেউ বলে দুইজনে মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। লজ্জা ত নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই। আবার শুনি যে, একদিন দু'জনে মারামারি করে যা না-বলতে পারে, তা-ও বলাবলি করেছে।

রাই। কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এই ত ? ও কথা ত মাতালের আসল বোল। ও কথায় কিছু গোল নাই। ভালবাসার ডাকই ঐ।

মুক্ত। মিছে নয় ; আবার শুনি যে, কিছুই না। যেমন তেমনি রয়েছে। ছি। ছি। কি ঘৃণা।

(নেপথ্যে)

জিতারাও বাবা, বৈতরণী পার হই, দেখে যেও বাবা। দেখে যেও বাবা। আঁধারেতে পা সাবধান ; দেখে যেও।

"দেখে যেও সোনার যাদু, (আমি) যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে, ধীরে যাও—এ ব্রজ মাঈ ধীরে যাও।"

মুক্ত। এ যে বাবুর গলার আওয়াজ। একি? বাড়ীর মধ্যে আসছেন তবু যে গান থামছে না।

রাই। বুঝি বেশী করে খেয়েছেন, আজ বড়দিন, দু'-তিন বোতল খেয়ে ঢুলতে ঢুলতে গলাবাজ করে আসছেন। কথায় বৈঠিক হচ্ছে, যা মুখে আসছে তাই বলছেন। এই আমি একটু আড়ালে যাই, সৈ—। মাতাল হলে মন বড় সাদা হয়। এই রেতে যে গান কর্তে কর্তে তোমার কাছে আসছেন, অবিশ্যি মনে পড়েছে ; অবিশ্যি কিছু মনে হয়েছে। আমার মাথা খাও আজ ছেড় না ; একটু ধল্লেই মনের কথা শুনতে পাবে। ঐ যে আসছেন আড়ালে গিয়ে বসি।

(প্রস্থান)

(বোতল বগলে গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদন বাবুর সহিত রাধাকান্তের প্রবেশ।)

রাধা। (নয়নতারার প্রতি) প্রিয়ে। এই বিবি সাহেবের ঘর, ঐ আমার ঘরের লক্ষ্মী। মদন দাদা। ঐ আমার অঙ্কলক্ষ্মী ; ঐ আমার মুখ-পানে চাহিনী, ঐ আমার মাথার মণি, ঐ আমার মাথার তাজ, কুল মান রক্ষাকারিণী, (যাত্রার সুরে) ঐ বসে আছেন। তোরা দেখ্। দেখ্ একবার চেয়ে দেখ্। (হস্ত দ্বারা দর্শন) ঐ গগনের চাঁদ আমার ঘরে, একবার চেয়ে দেখ্।

মুক্ত। পোড়া অদৃষ্টে আর কি আছে ; পরমেশ্বর। এই দেখালে ? (পলাইতে উদ্যত)

রাধা। (বোতল, গ্লাস রাখিয়া মুক্তকেশীকে ধারণ) ভয় পেয়েছে ? গা কাঁপছে যে ? ভয় নাই, ভয় নাই। চক্ষে জল পড়ছে ? ছি ছি। আমায় লজ্জা দিলে ? ছি লক্ষ্মী। আমার এয়ারের মজলিস মাটি কল্লে ? আমি এমন রসিক, আমি এমন চতুর বাবা ; আমার ঘরের গিন্নী ভয় খেক ? মানুষ দেখে কেঁপে কেঁদে ফেল্লে ? ছি ছি। চেয়ে দেখ, দেখ

তোমার জোড়া মিলিয়ে এনেছি। কেষ্ঠাকুর মেয়ে মানুষের হাতী সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে মজা করে চড়ে বেড়াতেন; আমি হাতী ঘোড়া কর্ব না, তোমাদের খুড়ি হেঁকে বেলাতী চক্কর ঘুরব, এইটি বড় সাধ আছে। (মুক্তকেশীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে উপবেশন) আমার কোলে বস; না না আমার মাথায় বস, মান করেছ—বিবিজান মান করেছ? সাজা কর; যা ইচ্ছে সাজা কর, মান ভাঙ্গুক। একটু মদ খাও দেখি (গ্লাস লইয়া মুখের নিকট ধরণ) সব রাগ মাটি হবে। তুমি জান না এতে রাগ মাটি হয়। দ্বেষ হিংসা মন থেকে দু'শ হাত সরে যায়, একবার খাও দেখি।

নয়ন। কিরে ডেকরা পোড়ার মুখ। এই—দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে এসেছিস? আমি যাই; জামাই চল, আমার মাথা খাও, (মদন বাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে) চল এখানে আর থাকব না।

রাধা। তুই বাবা ঘরে যা। আমি এই ঘরে থাকি।

নয়ন। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তোর মনে এই ছিল, আমায় বাড়ীতে নিয়ে এসে এত অপমান কল্লি; আমি এ প্রাণ রাখব না; আমি যাই, (যাইতে উদ্যত এবং মদন বাবু কর্তৃক ধরণ) জামাই আমায় ধর না। আমি আজ গলায় দড়ি দেব। ও বেহায়া পাজী মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড় আমি গলায় দড়ি দেব।

রাধা। (ত্রস্তে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া নয়নতারাকে ধরণ) তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

নয়ন। (রাধাকান্তকে পদাঘাত করিয়া) তুই তোর মাগকে (মাকে) নিয়ে থাক। আমি তোর মুখ দেখবো না—আমি কখনও তোর মুখ দেখবো না।

রাধা। (যোড় করে) মাপ কর; আমি আর কখনও এ ঘরে আসব না, মুক্তকেশীর মুখ আর দেখব না। আমায় মাপ কর।

মুক্ত। জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুনকালী দেবে। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানেই থাকা ভাল ছিল। এভাবে কেন বাড়ীতে আমার সর্বনাশ কর্তে এয়েছ? আর ঐ ভদ্র সন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কি এই দেখালে? আর গোল কর না; যেখান হতে এয়েছ, সেই-খানে চলে যাও।

নয়ন। দেখ্, পাজি। কোন্ মুখে এখানে রয়েছিস ; দূর দূর করে শেয়াল কুকুরের মত তোকে তাড়াচ্ছে ; তবু তোর লজ্জা হচ্ছে না ?

রাধা। কার সাধ্য আমাকে তাড়াতে পারে ? যে বলবে, আমি তার মাথা ভাংব। (তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া) এই বোতলের বাড়িতে মাথা ভাংব। (সজোরে মুক্তকেশীর দিকে গ্লাস নিক্ষেপ ; গ্লাস মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি মদ খাব কিসে ? আমার গ্লাস ভেঙ্গে গেল, আমার গ্লাস দে। দে—দে—

নয়ন। ভাল চাও, তবে বাড়ী চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাংব।

মদন। (নয়নতারার প্রতি) তুই বেটি ভারী—পাজী। ভদ্রলোকের বাড়ী এসে —একি ? যা তোর বাবাকে নিয়ে, যা ইচ্ছে কর, আমি বাড়ী যাই।

নয়ন। ওদিকে যোগাড় হল নাকি ? আমিই পাজী। বেশ বল্লে।

রাধা। মদন বাবু। একটু দাঁড়াও, তোমায় মারে কে ? আমি আজ ঘর থেকে যাব না। মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে পালঙ্গে শুইয়ে তুমি, আমি খাড়া পাহারা দেব।

নয়ন। তোর আর ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই চল।

রাধা। আচ্ছা, আমায় একটু ছেড়ে দেও, আমি এ ঘর থেকে মুক্তকেশী হারামজাদীকে তাড়িয়ে দেই।

নয়ন। যা বলতে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না। মার্তে গিয়ে কাছে দাঁড়ালেও আমার গা জ্বালা করে ![১]

---

[১] দ্বিতীয় সংস্করণ, 'এর উপায় কি ?' প্রহসনটি ডঃ আনিসুজ্জামান কর্তৃক শিকাগো থেকে সংগৃহীত।

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

(প্রথম সংস্করণ—১৮৯৯)

অষ্টম নথি

গাজী মিয়াঁ বলিতেছেন, তাই ইংরেজ আমাদের রাজা। তাই ইংরেজ সাগর মহাসাগর পার, দূর দেশান্তরে থাকিয়া, ত্রিশ কোটি লোকের উপর আধিপত্য করিতেছেন, তাই ইংরেজ আমাদের ভক্তির ভাজন, তাই ইংরেজ আমাদের মাথার মণি, তাই ইংরেজ আমাদের হর্তা কর্তা বিধাতা। তাই ইংরেজ দেবতা, অসীম ক্ষমতা। তাই ইংরেজরাজ্যে সূর্যের অস্ত নাই; ইংরেজরাজ্যে সূর্যদেবের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ইংরেজ চক্ষে অবিচার-অত্যাচার স্থান পায় না। বিচারক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট, মহাকণ্টক বিষ-লতার অঙ্কুর দূরে থাকুক—নাম পর্যন্ত শুনা যায় না। সে ক্ষেত্রে রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, সবল, দুর্বল, সুশ্রী, বালক, বৃদ্ধ, নর, নারী—সকলই সমান। উপরোধে অনুরোধে পরের কথায়, হক না-হক, বিবেকের বিপর্যয়, বোধ হয় কখনই ঘটে না। কেহ ঘটাইতে পারে না। বিচার অন্যায় রটে না, ধর্মাসনের অপমানও সম্ভবে না। তাই ইংরেজকে হৃদয়ের সহিত নমস্কার। মাথা নোয়াইয়া, দু'হাতে হাজার হাজার বার নমস্কার। ইংরাজ-রাজ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করুন, জগৎ শাসন করুন, সমগ্র ধরার আধিপত্য লাভ করুন, কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি।

কথায় বলে, সকল চাল বাইশ পশুরী নহে, সকল ফল রসাল নহে, সকল ফুল খোশবুদার নহে, সকল দেবতা দয়ালু নহে। দেশীয় হাকিমগণ-মধ্যে কেহ একগুঁয়ে, কেহ খামখেয়ালী, কেহ বদরোকা, কেহ কানপাতলা, কেহ দু'চোখো, কেহ বেজায় হটকারী, কেহ সফরিবৎ ফরফরায়তে, কেহ নিরেট, কেহ ঘোলে অম্বলে, কেহ দো'পিটে, কেহ হবুচন্দ্র, কেহ গবুচন্দ্র, কেহ আর কিছু, কেহ সাক্ষাৎ যম, কেহ ধর্ম-যুধিষ্ঠিরাত্মা, কেহ একেবারে মাটির মানুষ, কেহ যথার্থ বিচারপতি, কেহ বিচারাসনের মণিময় অলঙ্কার, কেহ ধর্মাসনে প্রকৃত ধর্মের অবতার।

সোনাবিবি কয়েদ—কষ্টের একশেষ। জবরাণে দলীল লিখিয়া লওয়ার চেষ্টা—কৃতকার্য না হইলে একেবারে জীবন শেষ করার পরামর্শও আছে। চাকর-চাকরাণী অন্যের কুপরামর্শে বিদ্রোহী। আত্মীয়স্বজন স্বার্থে অন্ধ। কেহ

পূর্ব-শক্রতা সাধনে খড়্গহস্ত; সুযোগ-সুবিধা পাইলে বিষের প্যালা মুখে ধরিতেও প্রস্তুত। পুত্র পুত্রবধূ ঘোর বিপক্ষ; ভয়ানক শত্রু। তাদের কৌশলেই কয়েদ। প্রতিবাসীর চক্রেই আপন গৃহে বন্দী। সবলোট সাহেবের অনুগ্রহেই এই দশা। এ সকল কথা দেশ-মশহুর। কোণের কনে বউ, রাস্তার বালক, আঙ্গিনার অঙ্গনা, বাহিরের বৃদ্ধ যুবা, কাহারও শুনিতে বাকী নাই। পুত্রের হাতে মায়ের কয়েদ, অন্নজল পর্যন্ত বন্ধ, মিনিটে মিনিটে প্রাণের আশঙ্কা। যে শুনিতেছে, সেই দুঃখ করিতেছে। কিন্তু অরাজকপুরের হাকিম বাহাদুর জানিয়া শুনিয়া আপন গুমরে বিভোর।

"ওহুঁ", ও কথাই নহে, হতেই পারে না, কখনই হতে পারে না, বিশ্বাস হয় না। কিছুতেই মনে ধরে না, কানে লাগে না, মাকে ছেলে কয়েদ করতে পারে না। আপন বাড়ী আপন ঘর, এ কথা কখনই সম্ভবে না। মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। দরখাস্ত অগ্রাহ্য।"

সোনাবিবির পক্ষের উকীল মুক্তার গলবস্ত্রে যোড় করে "হুজুর। হুজুর।" হুজুর শুনিবামাত্র অমনি মঞ্জুর। প্রতিদিন দরখাস্ত পড়িতেছে—হুজুর বাহাদুরের বিচারে প্রতিদিনই অগ্রাহ্য হইতেছে। হায়রে স্বার্থ। হায়রে অর্থ। এমন রাক্ষসের হস্তে রাজদণ্ড। ক্রমেই এক পক্ষের অত্যাচার বৃদ্ধি। দালান ফাটাইয়া গগনভেদী উচ্চরব করিয়া কাঁদিলে কে শুনে? প্রাণ যায়, কখন কি হয়। এইভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিতেছে। দেশীয় হাকিম শুনিলেন না। এত কাকুতী মিনতিতেও তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। ধন্য ইংরেজ। সেই ইংরেজ বিচারপতির কর্ণগোচর হইয়াছে। যেই ভেড়াকান্তের কৌশলে এই অত্যাচার-কাহিনী তারযোগে জিলার বিচারক সাহেবের গোচর হইয়াছে, তখনি আদেশ, তখনি হুকুম, তখনই কয়েদ খালাসের আজ্ঞা, তখনি রাজকীয় আদেশ, লিখিত পরওয়ানা, খালাসের হুকুম। সোনাবিবি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, বিশেষ হেফাজতের সঙ্গে পাঠাইতে আদেশ আসিয়াছে। তেসমার খাঁ ইন্সপেক্টার সাহেবের উপর তাগীদ হুকুম জারি হইয়াছে। ইন্সপেক্টার সাহেব উভয় দলের কার্যকারকগণকে পৃথক পৃথকরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতি সংগোপনে হুকুমের কথা শুনাইয়া দিলেন। দুই দলের লোকই জানিল যে, ইন্সপেক্টার সাহেব আমাদেরই পক্ষে, আমাদেরই হাতে। রাত্র প্রভাত হইতে হইতে পুলিশ দলবলসহ ঘটনাস্থানে যাইয়া কয়েদ খালাস করিলেন। তখনই কথা চারদিক ছড়াইয়া পড়িল, ক্ষণকাল মধ্যে দশমুখে

রটিয়া গেল। হাকিম, আমলা, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার—অরাজকপুরের স্থানে অস্থানে, রাস্তায় ঘাটে, পথে দোকানে, বাজারে সকলেই শুনিল জানিল যে, জিলার সাহেব শুনিবামাত্র সোনাবিবিকে কয়েদ হইতে খালাসের হুকুম দিয়াছেন। ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার। সকলের মুখেই ঐ কথা—ধন্য ইংরেজ, ধন্য তোমার সুবিচার—একটি ভদ্রমহিলার প্রাণ বাঁচিল। এদিকে পুত্রপক্ষ এবং মাতাপক্ষের শৃগাল, কুকুর, শকুনী, রাক্ষস, অসুর, আমলা কায়াধারী তদবিরকারক হিতৈষীবাবু লোকেরা; একপক্ষ বাধা, অপর পক্ষ খালাস বিষয়ে ছলা পরামর্শ; কি আকারে, কি প্রকারে, কিরূপে, কিভাবে ঘটিবে—হইবে, তাহারই মীমাংসা ও স্থির সিদ্ধান্ত জন্য আপন আপন উকীল মোক্তারের বাসা, মন্ত্রদাতার বাসা, এ বাসা ও বাসা যাওয়া-আসা আরম্ভ করিলেন। সূর্যদেব প্রায় অদৃশ্য হইতেছেন। সময় নাই। হাকিম সাহেব এজলাস বরখাস্ত করিয়া বাসায় গিয়াছেন। কি করি, সাতপাঁচ ভাবিয়া মনিবিবির মোক্তার তুড়ুকপাহাড় রায় হাকিম বাহাদুরের বাসগৃহেই চলিলেন। সকল অবস্থা বলিলেন। কোর্ট-ফি আঁটিয়া একখানা দরখাস্ত দাখিল হইল। তখনই হুকুম লিখা হইল। হাকিম সাহেব চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া চুরুট-মুখে কথা চিবাইয়া চিবাইয়া তুড়ুকপাহাড় রায় মহাশয়কে বলিলেন ঃ

"মহাশয়। এই ভেড়াকান্তটাকে ফাঁদে ফেলতে পাল্লেন না? আমি জানি ঐ বেটাই এই বিবাদ বাঁধাবার গোড়া। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, ঐ বেটাই সোনাবিবিকে পরামর্শ দিয়ে বাটীর বার করছে। তারই কৌশলে জিলার হাকিমের কানে এই কয়েদের খবর গিয়েছে। আপনি জানবেন, ভেড়াকান্তের কৌশলেই খালাসের হুকুম এসেছে। ভয়ানক ধূর্ত। এখানকার যত খবর কলিকাতায় লিখে। ওকে জব্দ না কল্লে আপনাদের ভালাই নাই। আমি শীঘ্র ওর মাথা খাচ্ছি। এখন আপনারা কোন প্রকারে একটা যেমন তেমন ফরিয়াদী খাড়া করে দিলেই আমি একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিব। আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। তবে আমার অনেক কাজে বাধা দিয়েছে। তা যাক, তাতে আমার মনে কিছুই নাই। নাবালকের ঘর একেবারে মাটি করতে বসেছে। দেখুন। আর কোন সময় আসবেন; ওর সম্বন্ধে—আরও অনেক কথা আছে—বলবো।"

রায় মোক্তার যোড়হাতে বলিলেন, "ধর্মাবতার। হুজুরের হুকুম আমাদের শিরোধার্য। শীঘ্রই হুজুরের হাতে দিচ্ছি। আমরা সে চেষ্টায় প্রাণপণে

লেগে আছি। আর কতদিন। সময় ঘনিয়ে এসেছে। হুজুর। হুকুমনামা খানা?"

"সে কথা কি আর বলতে? প্রভাত হতে হতে খাস আরদালী প্যাদার দ্বারা রওয়ানা হবে।"

মোক্তার বাবু সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন। বাসায় আসিয়া, পত্র লোক যেখানে যাহা পাঠান আবশ্যক, সেখানেই পাঠাইলেন।

সোনাবিবির পক্ষের লোকেরা ভেড়াকান্ত মহাশয়ের মন্ত্রণায় কুলী মজুর, পাল্কী বেহারার জোগাড় করিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অতি অল্পসময়-মধ্যে সমুদয় জোগাড় করিয়া রাত্র ১২টার পূর্বে সোনাবিবির নিকট সংবাদ পাঠান হইল। সংবাদ পাইয়া সোনাবিবি, দাগাদারী ভাই মহাখুশী। ভেড়াকান্ত মহাশয়ের বহুত তারিফ। ভারি চালাক্। খুব তুখর। খুব চতুর। পঞ্চমুখে সুখ্যাতি। তাহার পর বাক্স, পেটারা, তোরঙ্গ, আলমারী, খোলা জিনিসপত্র গাঁঠুরি, বোঁচকা বাঁধা, এক বাক্সের জিনিস অন্য বাক্সে রাখা, যাহা মাথায় যাইতে পারে, বাঁকে লইতে পারে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। সোনা রূপার আসবাব, দামী জিনিস, দলীল দস্তাবেজ, তামা কাঁসা, পিতল—ঘোড়া বোঝাই করিয়া গোপনে গোপনে নিশিযোগে চিরাপুঞ্জীতে পার করিয়া, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই ছোট ছোট বাক্সে, পেটারায়, পোর্টমানে, গাঁঠুরিতে, যাহা মাথায় চলে সেইরূপে বাঁধিয়া বন্ধ করিরা চাবি দিলেন। কত দড়ি দিয়া, ছালা জড়াইয়া, খুব কসিয়া বাঁধিলেন। কোন বাক্সে জমা-খরচ, কোন বাক্সে সাল-তামামী, কোন বাক্সে অন্য কাগজ, প্রজার দস্তা কবুলিয়ত, কোন পেটারায় গ্রাম গ্রাম জরিপী চিঠা, কোন গাঁঠুরিতে শাল বনাত। আবার কোন বোঁচকার মধ্যে মূল্যবান জিনিস, উপরে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া লেপ। এই প্রকার বাঁদন ছঁদন জড়ান আরম্ভ হইল। ছেঁড়া নেকড়ায় জরির পোশাক ঢাকা পড়িল। কত বাক্স লোহার পেরেগে একেবারে বন্ধ করা হইল। কত ছালাজাত হইল। বাড়ীতে যাহা থাকিল তাহার কোনটার মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া, কোন বাক্সের মধ্যে পচা খড়, কোন সিন্দুকে সুরখির গুঁড়া, কোন পেটারায় রাবিস ছাই; কোন আলমারীতে ইন্দুরের মাটি, ধানের তুষ, বড় বড় ইঁট, মাটির ডেলা, খোলা-খাপরা পূর্ণ করিয়া তালা-চাবিতে বন্ধ করা হইল। এই প্রকার বাঁধা ছাঁদা করিতে করিতে আকাশে শুক্তারা দেখা দিল। এদিকে ভেড়াকান্ত প্রেরিত

পাল্কী বেহারা মুটে মজুর অরাজকপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল— তৎপরেই প্রভাত। উষার আগমন। উষাদেবী ঘোমটা খুলিয়া সোনাবিবির ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-ফলকের অপূর্ব চিত্র দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে দিনমণির প্রকাশ। সঙ্গে সঙ্গে তেসমার খাঁ ইন্সপেক্টার একজন জমাদার, পাঁচজন কনস্টেবলসহ নির্দিষ্ট পোশাকে জমদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

হুলস্থূল ব্যাপার।

সোনাবিবি আজ কয়েদ হইতে খালাস হইবেন; যথেচ্ছা চলিয়া যাইবেন। দালান কোঠা, জিনিসপত্র, এমনকি রাজার রাজভাণ্ডার ফেলিয়া, পুত্রের মায়া বিসর্জন দিয়া স্বামীর মৃত্যুকালীন আদেশ উপদেশ বিধি-ব্যবস্থা অবহেলে, আত্মীয়-স্বজনের মুখে চুনকালি মাখাইয়া, দেশময় কলঙ্ক রটাইয়া, ঘৃণা, ক্রোধ, অভিমান, রোষ, সন্তোষ, পরিতোষ, অহঙ্কারে এবং মিছে কুহকে মজাইয়া মিছা মায়াজালে জড়িত হইয়া, বোধ হয় জীবনের মত জমদ্বার পরিত্যাগ করিবেন। আর আসিবেন না। জয়ঢাক বাবাজি কিছুতেই চলন্ত ঢাক বাজাইতে দিবেন না। মনিবিবি সাহায্যকারিণী, কিছুতেই যাইতে দিবেন না! খুন জখম সকলি স্বীকার; বন্দুকের গুলি বুক পাতিয়া লইবে। তরবারের আঘাত, লাঠির বাড়ি মাথায় ধরিবে; সড়কির খোঁচা অকাতরে সহিবে; তত্রাচ, স্বর্গাদপি গরিয়সী জননীকে—যাহাকে লইয়া এত কথা, যাহার জন্য এত কেলেঙ্কারী, তাহার সঙ্গে পুলিশের পাহারায় হাসিতে খেলিতে কিছুতেই বাড়ীর বাহির হইতে দিবে না। দিনে দুপুরে দু'হাজার চক্ষুর গোচরে, দাগাদারীর হাত ধরিয়া, পাল্কীতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে কোন মতে দেখিতে পারিবে না। কেমন করিয়াই বা দেখিতে পারে? রক্ত-মাংসের শরীরে কেমন করিয়াই বা এ গমন সহ্য হয়? পুলিশকে বশে আনিতে কতক্ষণ? শুন্য-শুন্য-শুন্য। ধরিতে গেলে জগতে প্রায় সকলি শুন্য। শুন্যে শুন্যেই উড়িয়া যাইবে। কোথাকার হুকুম কোথায় পড়িয়া থাকিবে। নিতান্ত নাছোড় হন; কয়েদ খালাস হইবে, বাড়ীর বাহিরও হইবেন। কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে। যে বন্দী সেই বন্দী। যাইতে পারিবেন না। একত্র যাইতে পারিবেন না। একত্র থাকিতে পারিবেন না। স্বেচ্ছাধীন চাল চলিতে পারিবেন না। যে কয়েদ সেই কয়েদ। পুনরায় কয়েদ। তবে স্থান ভিন্ন, ঘর ভিন্ন, এইমাত্র প্রভেদ। মানুষ থাকে ত ইহা না হইয়া যায় না। বুদ্ধি থাকে ত না আটকাইয়া ছাড়িবে না।

কেহ বলিতেছে, "অত হাঙ্গামার কাজ কি? বেহারাগুলিকে মেরে ভূত ভাগানের মত ভাগিয়ে দিলেই ত সকল দিক ফরসা হয়।"

উত্তর, "ওহে ভায়া। তাই বা কেন না হবে? এখনই দেখবে, কোন্ দিকের বাতাস কোন্ দিকে বয়। মারধর, ধরপাকড়, কিছু না কিছু হবেই হবে। নির্বিঘ্নে বাড়ীর বাহির কখনই নয়, কখনই নয়। একটা গোলযোগ নিশ্চয় নিশ্চয়।"

সাধারণ লোকের মুখে এই রসভাবের নানা আভাস। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি। ক্রমেই জনতার ভিড়। বহু দর্শক, উপস্থিত ঘটনা রহস্য দেখিতে, সোনাবিবির বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে, কাছারি ঘরের আঙ্গিনায় ক্রমে আসিয়া খাড়া হইল।

আজ সোনাবিবির কক্ষমধ্যে কখনও হাসির লহরী খেলিতেছে, খুসী, খোস-মেজাজের প্রবাহ ছুটিতেছে,—কখনও ক্রন্দনের সুরও শুনা যাইতেছে। বন্দী-গৃহে কখনও হাসি, কখনও ক্রন্দন—কারণ কি? এ হাসি হাসে কে? এ কান্দা কান্দে কে? এ সময় এমন গঙ্গা-যমুনার ভাব আনে কে? এমন কঠিন সময় সন্ধ্যা-প্রভাতের দৃশ্য দেখায় কে? যে মুখে হাসি সেই মুখেই ক্রন্দন। একা এক মুখে হাসি খেলে না, ক্রন্দনের বেগও স্বভাবসিদ্ধ বেগ হইতে একা একা বেশী হয় না। উত্তেজনার লোক চাই। পঞ্চমে চড়াইবার উপকরণ চাই।

সোনাবিবি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। প্রতিবাসী রমনগণ মধ্যে কাহারও আগমনে মনের কথা রস রহস্যে ভাঙ্গচুর, কাহারও আগমনে আক্ষেপ, কাহারও আগমনে মাঝামাঝি ভাব। যাহার সহিত যেমন ভাব, সেই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণই হাসি কান্না, মধ্যভাব। পাঁচির মা আসিল, রঙ্গের উপর রঙ্গ মিশাইয়া রসের উপর রস ঢালিয়া কথা আরম্ভ হইল।

"শিকল কেটেছে, ডানা বাহির হয়েছে। এই উড়ি, বেশী বিলম্ব নাই। বোধ হয় ঘণ্টা আড়াই। যমদ্বার মুখে সাতশত উনিশ, তার উপরে শতকরা এক 'ফাও' ঝাঁটা খাঙ্গরা জোড়ে-বেজোড়ে গণে মেরে; কারও কারও মুখে জলে গোবরে ছড়া ঢেলে; স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াব। মনের সুখে দিন কাটাব। ঢাক ঢাক গুড় গুড় দরজা দেও। বাবাজী এলেন পর্দা ফেল; নায়েবজী এলেন, আড়ালে যাও; দেওয়ানজী গেলেন, সরে বসো; কলেজার জী পরাণের জী একটু গড়াবেন, উঠে যাও; মুন্সীজী পত্র শুনাবেন,

সরে এসো—এ সকল দায় হতে সরে পড়বো। বলতো পাঁচির মা, এ খুশী রাখি কোথা? তবে ডাক হাসি, আয় হাসি। যাক হাসি। হা হাসি। সুতরাং হাসি খুশী খেলা ও মেলা। আর দোদেল বান্দা, দোমুখো শাঁইখানী, দোধারের শাঁখের করাত, দোঘরের মাসী, কনের পিশী, পাড়া ঢলানী, মুখে সরল, বুকে গরল মামানীজান, এবং বুবুজানেরা, আসলেই পুরন কথা, পুরাতন আলাপ, পুরন ভালবাসা উথলি উঠে; তাতেই আর্তনাদ, তাতেই বুকচেরা ক্রন্দন। তাতেই আকাশ-ফাটা নাক্সাট; তাতেই বহুদিনের জমাট বাঁধা মায়া-বারি, নাকে মুখে চক্ষে জল হয়ে গলে বাহির। সঙ্গে সঙ্গে হা হুতাশ।"

এদিকে তেসমার খাঁ ইন্সপেক্টার সহিত দাগাদারী ভাই সাহেবের কথোপকথন হইয়া গিয়াছে। সেখানেও শূন্য এখানেও শূন্য। শূন্যে শূন্যে পৌছছাইয়া দিবেন। বিপক্ষ দলেরও অভিনয় আছে। সেক্ষেত্রেও শূন্য। শূন্য শৃন্য-শৃন্য লইয়া যাইবেন। সংসারে অভিনয়ই সার। এখানেও অভিনয়, সেখানেও অভিনয়। ক্রমে ডাক বাড়িতেছে—"নও শ' রোপায়া, নও শ' রোপায়া এক। —নও শ' রোপায়া দো।" ডাক চড়িতেছে। কোথাও চলিতেছে।

"যান নিয়ে যান—যেখানেই ইচ্ছা চলে যান। জলে স্থলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, সাগরে দ্বীপে, যেখানে মন চলে, চলে যান, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু একটু বিলম্বে। বিলম্বে কার্যসিদ্ধি।"

ইন্সপেক্টার বলিলেন, "বিলম্বে কার্যসিদ্ধি। এ কথার অর্থ কি? ভাবই বা কি? এ বিলম্বের কারণই বা কি? লাভ কি?

উত্তরে,—"দেখিতে পাইবেন। এখনই স্বচক্ষে দেখিবেন। কয়েদী খালাস করুন, সঙ্গে লইয়া যাউন—আমাদের কোনো আপত্তি নাই; কিন্তু কাতরে করজোড়ে সবিনয় প্রার্থনা—একটু বিলম্বে।"

"কেন? এ বিলম্ব কিসের জন্য? চতুর ইন্সপেক্টার বলিলেন, তবে কি আপনাদের মনে অন্য কিছু আছে? যা আছে, তার যোগাড় হয় নাই, লোকজন জোটে নাই। তাহাতেই কি বিলম্ব প্রার্থনা?"

উত্তর, "না না, তা নয়। আপনি যা ভাবিয়াছেন, তা নয়। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন। কোনরূপ বে-আইনি, কোন প্রকারে অন্যায় কার্য করিয়া গোলযোগ করা হইবে না। খাঁটি খবর। নিশ্চয় কথা।"

একটু বিলম্ব করিলে এক পক্ষ সন্তুষ্ট হয়, অথচ কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামার আশঙ্কা না থাকে, বেশীর ভাগ খাতির রক্ষা হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে মুঠা ভরা, হাত পোরা চিড়ে মুড়কি, মণ্ডা মতিচুরের ব্যবস্থা থাকে, তবে পুলিশের পাল্লায় আসে কে? তার কাছে ঘেঁসে কে? হঠাৎ মন্দ বলে কে? পুলিশের এই 'বিলম্ব' কথাটা বড়ই মূল্যবান। এর চেয়ে সুপ্রশস্ত পথ আর নাই।

বিলম্ব হইলে পুলিশের দোষ কি? মালামাল গোছাইতে, বাক্স পেটারা মুটিয়া মজুরদিগের জিম্বা করিতে বিলম্ব হইল। হাজার হউক স্ত্রীলোক, কারণে অকারণে চক্ষের জল ফেলিতে, বিদায়সূচক দু'টো দুঃখমাখা কথা বলিতে বিলম্ব হইল।

সময়ে কথা গোপন রহিল না। জয়ঢাকের পক্ষ হইতে ইন্সপেক্টার সাহেবের নিকট আপত্তি উপস্থিত হইল। সোনাবিবি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে পারেন, কিন্তু নাবালকের কোন সম্পত্তি অথাৎ অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া যাইতে পারিবেন না। বাটীর বাহির করিতে পারিবেন না।

ইনস্পেক্টার বলিলেন, "কথা ত ঠিক। শুনতেও ভাল। কিন্তু আটকাবার পথ কৈ? তারা আমার কথা শুনবে কেন? আপন দখলে আছে—বল করে নিয়ে গেলে জয়ঢাক বাবুর জিনিস বলে ত আমি আটক করতে পাববো না।"

উত্তর, "সেইজন্যই আপনার এত তোষামোদ। হুজুর, সেইজন্যই ত এত কথা। যাতে আপনার ক্ষমতা জন্মে, যাতে আপনি আটকাতে পারেন তার উপায় হলে ত আপনি পারবেন?"

"হ্যাঁ, তাতে কি আর কেউ কাছে আসতে পারে। আটকাবার কোন পাকা উপায় কর্তে পারেন, যাতে আমারও কোনরূপ বদনাম না হয়, তা হলে আর যায় কোথা?"

কথা বাতাসের আগে আগে ধায়। এক কানে উঠিতে দশ কানে যায়। এক মুখে নাড়াচাড়া হইতে হইতে দেখিতে দেখিতে বিশ মুখে হইয়া পড়ে। সোনাবিবি শুনিলেন, দাগাদারী শুনিলেন। শুনিয়া রাগে জ্বলিলা উঠিলেন। দাগাদারী ভাই ক্রোধে চক্ষু দু'টি লাল করিয়া কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কার সাধ্য সোনাবিবির বাক্স পেটারা আটকায়? কার সাধ্য দাগাদারীর জিনিসের গায়ে হাত দেয়? কোন্ পিতার কত বড় পুত্র, কার এত বড় বুকের পাটা যে আমাদের জিনিসপত্রে মোজাহেম হয়? কার এত বড় মাথা, এই সকল বাঁধা প্যাক করা মাল এইখানে রাখে?"

সোনাবিবি পর্দার আড়ালে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন :

"কোন্ পাজী, কোন্ বেঈমান, কোন্ হারামির বাচ্চা বলে এ সকল মাল আমার নয়? আসুক, সে হারামজাদা আসুক, আমার সম্মুখে এসে বলুক যে, এ সকল মাল আমার নয়। আমি এখনি বাহির হব, আমি এখনি উঠব। আমার বাক্স পেটারায় কে হাত দেয় দেখি। আমি এখনি বাহির হব। কৈ দাগা। দাগাদারী কৈ? আমার কিসের লজ্জা। কিসের মান। কিসের ইজ্জত। কিসের পর্দা। নিয়ে আয় পাল্কী। মুটিয়ার মাথায় আগে বাক্স পেটারা সকল চাপিয়ে দিয়ে রওয়ানা কর—তারপর আমি উঠব। এ ঘরে আর থাকবো না।"

এই সকল কথা রাগে, ক্রোধে, মহাক্রোধে বলিতে বলিতে পর্দার বাহির হইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। দাগাদারী ভাই রক্ত-আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তর্জন গর্জনে দালান কাঁপাইয়া বলিতে লাগিলেন :

"কৈ—মুটিয়ারা কোথায়? উঠাও বাক্স। উঠাও পেটারা। উঠাও ঐ গাঁটুরী। দেখি। দেখি কে বাধা দিতে আসিবি আয়। যে আমার জিনিসের গায়ে হাত দিবি, কি কাছে আসবি, তার মাথা ভাঙ্গবো।"

মুটিয়াগণ একে একে আপন মোট নির্দিষ্ট করিয়া মাথায় তুলিতে সবলোট সাহেবের গুপ্ত উত্তেজনায় ও পরামর্শে মনিবিবির পক্ষের লোকের কেহ বাঘের মত গর্জিয়া, কেহ সিংহের মত লাফাইয়া, কেহ খেঁকির মত সাদা দাঁত বাহির করিয়া, ইন্সপেক্টার সম্মুখে মার মার শব্দে আসিয়া পড়িল। মুটিয়াদিগের কাহারো ঘাড়ে গর্দানে, কাহাকে কীল, কাহাকে লাথি, কাহারো মুখে চড়, কাহাকে ঘুষি, কাহাকে ধাক্কা দিয়া চিতপাত, কাহাকে বিষম পাক, পাকের উপর পাক, হাত ধরিয়া পাকে বিপাকে ঘুরাইয়া—বাক্স, পেটারা, বোঁচকা গাঁটুরি কাড়িয়া লইল।

দাগাদারী ভাইও মহাতেজে একেবারে পঞ্চমে উঠিয়া আসরে নামিলেন। ঐ সকল জিনিসপত্র পুনরায় মুটিয়াদিগের মাথায় চাপাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। মুখে বলিলেন, "কি? এত বড় বুকের পাটা? এত বড় ক্ষমতা? ধর; বেটাদের মার। নে কেড়ে।" সোনাবিবির পক্ষের লোকও ঝুঁকিল। কিন্তু জয়ঢাকের গভীর গর্জনে, তুমুল আরবে, মহামিষ্ট সুমধুর সম্বোধনে, অতি উচ্চভাবে, সম্মান রক্ষার ভাব অবলোকনে, মনে মনে একেবারে দমিয়া গেলেন। তখনি খেয়াল হইল—যে জয়ঢাক মুখ তুলে কথা কহিতে সাহস

পায় নাই, চক্ষু তুলে উঁচুনজরে তাকাইতে ক্ষমতা হয় নাই, সাত ঘা চাবুক কসিলে যে কথাটি বলে নাই, ঘটনাক্রমে চক্ষে চক্ষে নজর পড়লে, কোথায় যে লুকাবে, কোন্ কোণে পালাবে, তার পথ খুঁজিয়া পায় নাই, সেই জয়ঢাক, সেই দুধের ছেলে জয়ঢাক, আজ আমার সম্মুখে সমানভাবে খাড়া। সমান বলি কেন? অভদ্রোচিত, বদজবান, লাম্বজবান, যা কখনও শুনি নাই, সেই সকল বোল মুখে করিয়া, গরম নজরে খাড়া, চক্ষু তেড়া, ক্রোধে কম্পিত, চক্ষু লাল, চেহারা গরম, দন্তে দন্তে পেষণ। দশ কথা জিজ্ঞাসিলে যে একটি কথা মুখে আনিতে পারে নাই, তারই মুখে আজ লম্বা-চওড়া কথা। ভয়ানক বিপরীত ভাব। প্রাণ যাইবার লক্ষণ। এই সকল ভাবিয়া মনে মনে দমিলেন, কিন্তু মুখে কমিলেন না। ক্রমেই কথার বৃদ্ধি। উত্তরে অপমানের মাত্রা বেশী।

এমন সময় অশ্বারোহণে হাকিম সাহেবের—অরাজকপুরের হাকিম সাহেবের খাস আরদালী প্যাদা একখানি লেফাফা হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কাড়াকাড়ি, গালাগালি, বাকযুদ্ধস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনই হুকুম জারি হইল। পুলিশের উপরও একখণ্ড জারি হইল। যে কারণে বিলম্ব, যে বিলম্বের জন্য পুলিশের পদতলে বোতল বোতল তেল-জল, জলপান, পান-তামাক, অতি উচ্চভাবে অভ্যর্থনা, তাহা সম্পন্ন হইল। আশা পুরিল, সোনা-বিবির সর্বনাশ হইল।

হাকিম বাহাদুরের আদেশ, সোনাবিবির প্রতি আদেশ যে, নাবালক জয়ঢাকের কোন মাল, কোন জিনিস, কোন অস্থাবর সম্পত্তি, তিনি সঙ্গে না লয়েন, বাড়ী ছাড়া না করেন। পুলিশ প্রতিও হুকুম—তবে একটু ভিন্ন ভেদ্—নাবালকের কোন অস্থাবর যদি কেহ তাহার বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করে কি করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে ৩৮০ ধারায় রীতিমত হাতে হাত-কড়া দিয়ে চালান দেয়।

আর পায় কে? আর কথা বলে কে? সোনাবিবির মস্তকে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাগাদারী ভাই এবং তেনাচোরা খাঁ, বে-আক্কেল প্রভৃতির মুখে কথাটি নাই। ম্লানমুখে নীরব। কি করিবেন, কি ভাবিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সোনাবিবি পাল্কীতে উঠিয়াছেন। দাগাদারী ভাই পাল্কীর পার্শ্বে নিজ পাল্কীর ছাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হাকিম বাহাদুরের হুকুম ইন্সপেক্টার সাহেব উচ্চরবে সোনাবিবিকে শুনাইয়া দিলেন।

এক ব্যাপার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাপার আসিয়া এক পক্ষের রাগ, হিংস', দ্বেষ, দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। পরিণাম ফল যাহা হইয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। পুলিশের চক্ষের উপর অত্যাচার স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইল।

সোনাবিবি, দাগাদারী পুলিশের সম্মুখে কত মিনতি, কত কান্নাকাটি করিয়া বলিলেন, "এ সকল অস্থাবর সম্পত্তির একটিও জয়ঢাকের নহে। সকলি আমার আর দাগাদারীর।"

পুলিশের ঐ বাঁধা কথা। "হাকিমের হুকুম—আমি কি করিব। হাকিম বাহাদুর যখন অস্থাবর মাল লইয়া যাইতে নিষেধ আজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তখন আমি কি করিব? যার মাল সে লইবে কোন বাধা নাই। আপনার মাল হয়, আপনি নিন, জয়ঢাকের মাল হয়, জয়ঢাক নিন। আমি শান্তি ভঙ্গ হইতে দিব না।

অন্যদিক হইতে শুষ্ককণ্ঠে, উচ্চরবে, এক প্রকার মাথায় বাড়ি দেওয়া আকারে চীৎকার হইল, "দোহাই মহারানীর, দোহাই পুলিশের। মেরে ফেল্লে—কেড়ে নিল; আমার বাক্স পেটারা মনিবিবির সর্দারেরা কাড়িয়া লইল।" অন্য ঘরে—"আমার গায়ের রেপারখানা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। এ বাক্স তোমাদের নয়। ওগো ও পোটমান আমার; ওটা নিও না। ও পেটারা বে-আক্কেলের। ও তেনাচোরা চাচা। তোমার শালখানা চিরে ফেড়ে কেড়ে নিল। ওরে ও গাঁঠুরী দাগাদারী ভাইজানের।"

উচ্চৈঃস্বরে, ঘোর কাতরে বলিতে লাগিল, "ইন্সপেক্টার সাহেব। আমরা মলেম। জমাদার বাবু দেখুন। আমাদের সকলই কেড়ে নিল। তোষক, বালিশ, গায়ের চাদর, মাথার টুপী, পায়ের জুতা পর্যন্ত গেল। আপনারা উপস্থিত থাকিতে দিনে দুপুরে এই অত্যাচার।"

লোক দেখাইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া "কৈ কি হলো। কৈ কৈ কোথা গেল? কে কে? ধর ধর।" এ সকল বাঁধুটি বোল মুখে আউড়াতে আউড়াতে রুল হাতে, পেটী কোমরে কসিতে কসিতে ঘটনাস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

"দোহাই মহারানী। দোহাই ভারতেশ্বরী। তোমরা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিও না। কাড়াকাড়ি মারধর করিও না।"

কার কথা কে শুনে। পূর্বেই গড়াপেটা হইয়া আছে। হাজার বার মহারানী, মহারানী বলিলে তারা শুনিবে কেন? মনিবিবির পক্ষের সর্দার, লাঠিয়াল, খানসামা, খেদমতগার, যার হাতে যে পড়িল, সোনাবিবির পক্ষের

লোকজনের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। সোনাবিবির পক্ষের লোকজনের কিছু বলিলেই পুলিশ আসিয়া মহাজেম হয়, বাধা দেয়—কিন্তু মনিবিবির পক্ষের লোকেরা পুলিশের সম্মুখে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করিল। পুলিশ নিবারণ করা দূরে থাকুক, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, চক্ষেই যেন দৃষ্ট হইল না, কথাও সরিল না। ধন্য বিচার। ধন্য শান্তিরক্ষা। ধন্য রে পুলিশ। ধন্য হাকিমের হুকুম।

এই পর্যন্তই কি ইতি হইল, তাহা নহে। অত্যাচারের কাহিনী যে এখানেই শেষ হইল তাহা নহে। লোকে শিখাইয়া দিয়াছে, উৎসাহ দিয়া দিয়াছে, জয়ঢাকের কানে মন্ত্র ফুঁকিয়াছে যে, তোমার মাতা পাল্কীর মধ্যে অনেক মূল্যবান পাথর, মতি, জওহেরাত, জরির কাপড়, শাল, রূপার আসবাব গোপনে তুলিয়াছেন। হ্যাঁ চক্ষু ঠারিয়া দেখ, ইত্যাদি ইঙ্গিতেই জয়ঢাক জগঝম্প বা ইংরাজি ঢাকের দ্বিগুণ ফুলিয়া মায়ের পাল্কীর নিকট আসিয়া যাহা করিল, যেরূপ আচরণ আরম্ভ করিল, তাহা মায়ের সন্তান কখনই চক্ষু পাতিয়া দেখিতে পারে না। হায় রে সমাজ। হায় রে বঙ্গের মুসলমান সমাজ। ধিক্ স্বার্থে। ধিক্ অর্থে। শত ধিক্ মন্ত্রদাতা মন্ত্রিগণে। সহস্র ধিক্ নিমকহারাম হিন্দু আমলাগণে। এতদিন সোনাবিবির অন্নে প্রতিপালিত রক্ষিত হইয়া, আজ তাহার কি দুর্দশা করিলি? স্বার্থ সাধনে তাঁহাকে কোন্ কূপে না ডুবাইলি। হায় জগৎ। আর তোমার চিত্র দেখিতে চাহি না।

সোনাবিবি পাল্কীর মধ্য হইতে কাতরস্বরে বলিতেছেন, "ওরে জয়ঢাক। আমাকে বেইজ্জত করিস না, আমার গায়ে এভাবে হাত দিস না, আমার গায়ে কিছু নাই। ওরে আমার কোমরে কিছু নাই, উহু, ধাক্কা দিয়া আমার পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিস না, আমার গায়ে কিছু নাই। আমার বিছানার নীচে কিছু নাই, ও খানা খালি তোষক, ছেঁড়া তোষক, পাল্কীর মধ্যে কিছু নাই। ও বাবা। আমার মাথার চুলের মধ্যে কিছু নাই বাপ। আমি তোর কোন জিনিস লই নাই। ওরে, ওখানা আমার পরণের কাপড়। দোহাই তোর বাপের। ওরে দোহাই তোর খোদা রসুলের। আমাকে উলঙ্গ করিস না। এত লোকের মধ্যে পাল্কীর দরজা ভেঙ্গে ফেলেছিস, লাথি মেরে ভেঙ্গে বেশী ফাঁক করে ফেলেছিস, ভালই করেছিস। আমি তোরই মা। ওরে আমি তোরই জন্মদাতার ভালবাসা স্ত্রী। ও জয়ঢাক। তোর পায় ধরি বাবা। আমার পরণের কাপড় টেনে আমাকে বে-আবরু করিস না। তুই ত

সকলি নিয়েছিস। পাল্কীর মধ্যে যা যা ছিল সকলি নিয়েছিস। পানি খাবার একটা কাচের গ্লাস ছিল তাও আছড়ে ফেলে ভেঙ্গে দিয়েছিস। পানের একটা খাসদান ছিল, তাও আছড়ে তিন-চার খণ্ড করে ভেঙ্গে শানে আছড়ে আছড়ে পা দিয়ে দলিয়ে ফেলে দিয়েছিস। কিছু নাই। ওরে আমার পিঠের পাশে বালিশের নীচে কিছু নাই। তুই লোকজন সরিয়ে তফাত কর, আমি পাল্কী হতে নেমে ঝাড়া দিচ্ছি, তুই তন্ন তন্ন করে দেখ, আমার কাছে কিছু নাই। ও বাবা, তোর দু'খানি পায়ে ধরি বাপ। আমার পরণের কাপড়খানা কেড়ে নিস না। আমি উলঙ্গ হলেম। শীত-কাল গায়ে একটা ছেঁড়া কোরতা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েছিস। গায়ের চাদরখানা টানাটানি করে ফেড়ে ফেলেছিস। মাত্র একখানা ছেঁড়া কাপড় আমার পরণে আছে, তাও কি তুই কেড়ে নিবি? ওরে এইজন্য কি তোকে দশমাস দশদিন এই পোড়া পেটে কত কষ্টে রেখেছিলাম? ওরে, এইজন্য কি পুত্র-কামনায় কত রোজা, কত দান, ওষুধ, কত তাবিজ, কত প্রকারে কত কষ্ট খেয়ে না খেয়ে সহ্য করেছিলাম। এইজন্যই কি ওরে। এইজন্যই কি বুক চিরে ফকীরের আস্তানায় রক্ত পাঠিয়েছিলাম বাবা। আমার গায়ের কাপড় কেড়ে নিস না। কত মল, কত প্রস্রাব এই দু'হাতে ঘেঁটেছি। শীতে রাতে, বুকখানির মাঝে রাখিয়া এই শরীরের রস দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি। বুকের তাপ বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করিয়াছি। বাবা, আমায় উলঙ্গ করিস না। তুই যেদিন জগতের মুখ দেখিয়াছিলি, সেদিন তোকে কে বাঁচাইয়াছিল? তোর অঙ্গের সেই ঘৃণাকর দুর্গন্ধময় পুঁজ-রক্ত কে সরাইয়াছিল? কে ঐ সকল সমেত যতনে তুলিয়া বুকে রাখিয়া মুখে চুমা দিয়াছিল? ও জয়ঢাক, একটু দয়া কর। একটু শান্ত হ। হায়। হায়। পেটের সন্তান, তুই আমার শরীরের সার—প্রাণের সার—কলিজার অংশ। হায়। হায় তোর এই কাজ। তুই এই করিলি। আজ যে হাতে যে বলে, জবরাণে মায়ের সর্বস্ব কাড়িয়া লইলি, সে বল, সে হাত, তুই কোথা পাইলি? হায়। হায়। আমার কপালে আগুন। আমার অদৃষ্টে শত ঝাঁটা। পেটের সন্তান হয়ে মাকে উলঙ্গ ক'রে পরণের কাপড় নিতে চায়। হা অদৃষ্ট।

"উহু। মলেম। মলেম। তুই আমার পা ছেড়ে দে। এ প্রাণ-ঘাতক ভক্তি তোকে কে শিখাল? ওরে ছেড়ে দে। আমাকে টেনে পাল্কীর বাহির করিস না। এমন ভক্তি তোকে কে শিখাল? বুঝেছি বুঝেছি; এ তোর

পৈতৃক বুদ্ধি নহে। তুই তোর পিতার প্রস্রাবেই জন্মেছিস, তাতে সন্দেহ নাই। তবে তোর এত গুণ কিসে হল? কে শিখাল? তোর জন্মদাতা ত এত নিষ্ঠুর ছিল না। তবে তুই কোথায় শিখলি? বুঝেছি; ওরে বুঝেছি। দুরন্ত জালেম-খুনে ডাকাতের পুত্র তোর শিক্ষাগুরু; তারই এ শিক্ষা। আমি তোর দু'খানি পায় ধরে বলি, ওরে আমাকে ছেড়ে দে। আর সহ্য হয় না, ছেড়ে দে।"

পাঠক, মনে করিবেন না যে, গাজী মিয়াঁ কল্পনার চক্ষে এই মাতা-পুত্রের চিত্র আঁকিয়াছেন। জয়ঢাকের মন্ত্রদাতা মহাশয়গণের সৎ বিবেচনাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। জোরে জবরাণে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাল্কী হইতে টানিয়া লইয়া ঘরে পুরিতে পারিলেই কথা রটিবে যে, হাজার হোক মা আর ছেলে। জয়ঢাক কাঁদাকাটি করিয়া মায়ের পদতলে পড়িতেই মায়ার বেগ উথলিয়া উঠিল। পুত্রস্নেহ-বারি নাকে-মুখে ঝরিয়া মনের ভাব পরিবর্তন করিয়া দিল। আর যাওয়া হইল না। এ সকল চক্রের চক্রিই সবলোট সাহেব, আর ঘর-ভাঙ্গা ও মাথা-পাগলা হিন্দু আমলা।

কল খাটিল না। কৌশল টিকিল না। সোনাবিবির আর্তনাদে ইন্সপেক্টার তেসমার খাঁ আসিয়া জয়ঢাককে টানিয়া তফাত করিলেন। সোনাবিবি খালি হাতে ছেঁড়া কাপড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কী উঠাইতে বলিলেন। আগে পাছে পুলিশ; মধ্যে সোনাবিবি আর দাগাদারী ভাই সাহেবের পাল্কী। দর্শকগণমধ্যে কাহারও নয়নে অজস্র বারি, কাহারও মুখ ভারী। কেহ আনন্দে ঢলঢল; কেহ মনে মনে অতি প্রফুল্ল। অনেকে নয়ন-জল বস্ত্রাঞ্চলে পুঁছিতে পুঁছিতে সোনাবিবির পাল্কীর সঙ্গে বহু দূর যাইয়া, পুরাতন হিন্দু-আমলাদিগের চন্দো পুরুষের নামে শ্রাদ্ধ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। সকলের মুখেই ঐ কথা—আমলারা আপন স্বার্থ সাধন জন্য সবলোট সাহেবকে পালের গোদা করিয়া সোনাবিবির এই সর্বনাশ করিল। মনিবিবি আর জয়ঢাকই যে সেই ক্রুরবুদ্ধি, দুরাচার খল, বিশ্বাসঘাতক হিংস্র হিন্দু আমলাদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহা নহে। সময় ও সুযোগ পাইলে দংশন করিবে; উল্টামন্ত্রে উল্টাভাবে বিষ ঝাড়িয়া ছারেখার করিবে।

সকলেই মনে করিয়াছিল যে, সোনাবিবি চিরাপুঞ্জিতে যাইবেন। কিন্তু দেখা গেল, পাল্কী চিরাপুঞ্জীর পথে না গিয়া অরাজকপুরের বাঁধা রাস্তা ধরিল।

এসলামের জয়

(প্রথম সংস্করণ, ১৯০৮)

করুণাময় এলাহির কৃপায় এসলাম ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী মদিনা নগরে চিরস্থায়ীরূপে স্থাপিত হইয়াছে। এসলাম পতাকা সকল যেন আনন্দে মাতিয়া বিজয়ী মোসলেমগণের বীরত্ব গৌরবগাথা—একত্ববাদের শুভবার্তা হেলিয়া দুলিয়া বায়ুপ্রবাহে বহিয়া দেশ-দেশান্তরে লইয়া যাইতেছে, সোহাগে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, অনুরোধ করিতেছে। পতাকারাজির স্বুবর্ণখচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণকণিকা-সকল দীর্ঘাকারে, লম্বিত হইয়া জগজ্জয়ের শুভচিহ্নস্বরূপ মোসলেম হৃদয়ে আনন্দ বর্ধন করিতেছে। বিধর্মিগণের নয়নমনে—স্নুতীক্ষ্ণ মহাবাণের ন্যায় হানিয়া—ক্ষতস্থানে চিরস্থায়ী বাণবিদ্ধের জ্বালা-যন্ত্রণা মহা-বেদনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে।

আরবের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। মোসলেমগণের সাহস, বল-বিক্রম, শক্তি-সামর্থ্য, সদ্ব্যবহার, সরলতা, একতা এবং ধর্মগত প্রাণের গুণকীর্তন দেশ-দেশান্তরে প্রান্তরে পর্বতশিখরে গিরিকন্দরে সমুদ্রপোতে বিজনবনে, মানবমুখে মুখরিত হইয়া অতি উচ্চভাবে প্রশংসার সহিত আলোচিত হইতেছে।

লা' ইলাহা ইল্লাল্লাহু

মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

এই অদ্বিতীয় স্বর্গীয় পবিত্র বাণীর স্নুমহান জ্বলন্ত জ্যোতি সর্বসাধারণ জনগণের হৃদয়ে মহাতেজে প্রবেশ করিয়া মানবকুলকে আকুলিত করিয়া তুলিতেছে।

... ...

প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ খালেদ এসলাম-পতাকাহস্তে অশ্বদাপটে মদিনার সৈন্যগণের কখনো পশ্চাৎ কখনো অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ-দানের সহিত এসলামের জয় ঘোষণা করিতেছেন, আর চোখের নিমিষে রোমীয় সৈন্যগণের পশ্চাৎ দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিতেছেন, দেখ ভাই ঈসাইগণ, খালেদ কাহারও পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্র ব্যবহার করে না।

খালেদ অশ্ব ছুটাইলেন। অশ্বদাপটে প্রস্তর ঘর্ষণে অশ্বের পদতল হইতে আগুণের কণা ছুটিতে লাগিল। ঈসাইগণ চক্ষে যেন দেখিতে লাগিল—তাহাদের অগ্র-পশ্চাতে এসলাম-বিজয়পতাকা আর মোহাম্মদ খালেদের অশ্বখুর-উৎপন্ন

অগ্নিকণা,—খালেদকে কেহই স্থিরচক্ষে দেখিতে সক্ষম হইতেছে না। তৃতীয় চক্রের পরই রোমীয় সৈন্য কাতারে কাতারে রক্তমাখা হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কেহই পথ ছাড়িল না। পলাইল না। রক্তবীজের বংশের ন্যায় এক দলের রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হইতে অন্য দল আসিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করিতেছে। তাহাদের অস্ত্রও খালেদ-শিরে অবিরত পতিত হইতেছে।

খালেদ অসি চালনায়—নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় ব্যর্থ করিতেছেন। শত্রুগণের অস্ত্রবল সম্পূর্ণরূপে অসিতে প্রতিঘাত হইতেছে। অসি জরাজীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে বীরবর মহামতি খালেদের হস্তস্থিত তরবারি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনি পৃষ্ঠরক্ষক রক্ষীদল দ্বিতীয় অসি জোগাইল। সে সময় রোমীয় সৈন্য প্রবল ঝঞ্ঝাঘাতে কদলীবৃক্ষপত্র সদৃশ খালেদের তরবারি-তেজে মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। শত্রুগণের আঘাত-প্রতিঘাতে অতি অল্পক্ষণমধ্যে দ্বিতীয় অসি ভগ্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে উড়িয়া গেল। রক্ষীদল তৃতীয় অসি অতি ত্রস্তে মোহাম্মদ খালেদের হস্তে অর্পণ করিলে; একদল রোমীয় সৈন্য-শির ধূলায় গড়াইয়া দিয়া তৃতীয় অসিও ভাঙ্গিয়া বহু খণ্ডে ছুটিয়া পড়িল। এবার চতুর্থ অসির পালা। চতুর্থ অসি তৃতীয় অসি অপেক্ষা অল্পসময়-মধ্যে খণ্ড খণ্ড আকারে রণ-প্রাঙ্গণে পতিত হইল। এই প্রকার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম অসি পর্যন্ত ভগ্ন হইয়া ··· ··· রক্ষীগণের মনে ভয়ের কারণ জন্মাইয়া দিল। কিন্তু বীরবর খালেদ অটল।

ধন্য বীর। ধন্য বীর খালেদ। ধন্য তোমার বাহুবল। শত ধন্য—তোমার অসি ধারণের কৌশল।

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

সুধার কৃপাণশ্রেণীর সুনির্মল দেহছটার চাক্‌চিক্য-প্রতিবিম্বে সোহাগা নিক্ষিপ্ত হইয়া উত্তপ্ত রজতের ক্ষুদ্রকায় প্রবাহ ছুটিয়া চক্ষের পলকে সৈন্যশ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে। প্রান্তরস্থ বায়ুপ্রভাবে অথবা স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে, সূর্যরশ্মির কথঞ্চিত আভার চঞ্চলতায় রজতরাগের পরিবর্তে সুবর্ণ লহরী সচঞ্চল চন্দলার ন্যায় চমক দেখাইয়া সরিয়া পড়িতেছে। স্থিরদৃষ্টিতে একটু দূর হইতে দেখিলে বোধ হইতেছে যে,—স্ফটিক নিন্দিত জলধারা। প্রতি রোমীয় সৈন্যের বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণে বক্রভাবে সজ্জিত বক্ষোপরি গড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের বিশাল মুষ্টিমধ্যে লুকাইয়া যাইতেছে।

আমার জীবনী

'আমার জীবনী' সংক্রান্ত কয়েকটি কথা

১। 'আমার জীবনী' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ৮ পেজী ডিমাই চার ফর্মা মাসে মাসে অথবা মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে।

২। প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্মা 'আমার জীবনী' থাকিবে। অপর ফর্মায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। 'আমার জীবনী'র সহিত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র শেষ অংশের বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া জীবনীর সঙ্গেই প্রকাশ হইবে।

৩। 'আমার জীবনী'র সংস্রবি কোন জীবনীর কোন কোন বিষয় যদি কেহ জ্ঞাত থাকেন, তাহা লিখিয়া 'আমার জীবনী'র সাহায্য করিলে লেখকের নিকট চিরবাধিত হইব।

৪। 'আমার জীবনী'র ১২ খণ্ড আপাততঃ মূল্য নাই। সামান্য খরচ ১০ আনা মাত্র। তিন খণ্ড প্রকাশ হইলেও যিনি অনুগ্রহ প্রকাশ না করিবেন, অর্থাৎ ঐ ১০ আনা না পাঠাইবেন তাহার নিকট 'আমার জীবনী' আর প্রেরিত হইবে না। পাঠকগণ সমীপে বিনীত প্রার্থনা—২য় খণ্ড প্রকাশ হইলেই উপরোক্ত ১০ আনা পাঠাইতে মনোযোগী হইবেন।

৫। 'আমার জীবনী' সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তিজনিত উপদেশ দান পক্ষে যাহার বিবেচনায় যাহা হয় লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা শিরোধার্যপূর্বক গ্রহণ করিয়া 'জীবনী'তে প্রকাশ করিব। সঙ্গত হইলে সংশোধনের চেষ্টা করিব। এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থান হইতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।

৬। খরচ ১০ আনা আদায় জন্য আমরা ভিঃ পিঃ করিব না। এবং তাহা করিতে কোন গ্রাহক আমাদিগকে অনুরোধ করিবেন না।

৭। কোন বিষয়ের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড অথবা ৴১০ আনা মুল্যের টিকিট না পাঠাইয়া কোন বিষয়ের উত্তর তলব করিবেন না। ইহা সবিনয়ে প্রার্থনা।

৮। কোন মহানুভব মহোদয় 'আমার জীবনী' প্রকাশে এককালীন কিছু সাহায্য করিলে তা সাদরে গ্রহণ করিয়া 'জীবনী'র শেষ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি-

স্বীকার করিব। যদি নাম ধাম গোপন করিতে আজ্ঞা করেন, সে আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইবে।

৯। চিঠিপত্র, টাকা সমুদায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় তাহার নামে পাঠাইতে হইবে।

১০। কোন গোপনীয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পত্রের শিরোনামার উপরে 'গোপনীয়' শব্দ বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে।

বিনয়াবনত—

আমার জীবনী

প্রথম খণ্ড প্রকাশকাল ১লা আশ্বিন ১৩১৫ (১৯০৮)

দ্বাদশ খণ্ড, ১৯১০

আমার আত্মকথা

প্রার্থনা

হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন—অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর। সর্বনিয়ন্তা জগৎপাতা; সর্বময় সৃষ্টিকর্তা এলাহি। তোমার অনন্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সহিত তোমারই সহায়ে 'আমার জীবনী' জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভু সহায় হও। সত্য তত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে লিখনি সঙ্কোচিত কর। সদাসর্বদা পরহিংসা, পরদ্বেষ পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।

দয়াময়। তোমার এই দাসানুদাস অধমের আজিকার দিন পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ জীবনবৃত্তান্ত 'আমার জীবনী'তে প্রকাশের অবসর প্রদান করিয়া জীবনান্তের পূর্বে 'আমার জীবনী' শেষ করিতে শক্তি দিও। আশা নাই, আর আশা নাই। মৌলুদ শরীফের বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে আক্ষেপ করিয়াছি—

কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হল, দন্তপাতি খসে পল
চক্ষু জ্যোতি হইল মলিন।
সুন্দর সুকান্তি হায়, একে একে সরে যায়,
দেখিতে দেখিতে গত দিন।

শরীর হয়েছে জরা   বেদনা যাতনা ভরা
আজ এটা কাল ওটা ছায়।
শিথিল গায়ের চর্ম   এমনি দেহের ধর্ম,
সব স্থানে সরাসন প্রায়॥

এই ত অবস্থা শরীরের। আশা নাই। দয়াময়, জীবনে আর আশা নাই। তাহাতেই কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি, জীবন শেষের পূর্বে 'আমার জীবনী' যেন শেষ হয়। দয়াময়, তুমি দয়ার অবতার। তোমার কৃপা ও দয়া ভিন্ন কোন কার্যই পূর্ণ হইবার নহে। এলাহি, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্ব অন্তর্যামী। তোমার চক্ষে ধূলি দিয়া চতুরতার সহিত চতুরালী খেলিবার সাধ্য কাহারও নাই। হৃদয়ের অন্তস্থানের কথা মুখে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তোমার জ্ঞান-গোচর হয়। এখন আর কোন আশা নাই।—মাত্র এই জীবনী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ-আশাই অন্তরে সদাসর্বদা জাগিতেছে।

দয়াময়। 'এসলামের জয়' প্রকাশ-আশা পূর্ণ করিয়াছ। 'হজরত ইউসোফ' যন্ত্রস্থ। শেষ আশাই 'আমার জীবনী'। করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, অধমের মনের আশা পূর্ণ করিও।

মাননীয় পাঠকগণ সমীপে,

প্রিয় পাঠকগণ, 'আমার জীবনী' প্রকাশ-কথা হঠাৎ মনে হইয়া অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। এ সংকল্প বহু দিনের—এ আশা এক যুগেরও অধিক কালের। কালচক্রের চক্রে, অবস্থার গতিকে আজ ১৬ বৎসর পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশা-পথে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন প্রমাণ। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' পুস্তকের দ্বিতীয় তরঙ্গে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন, কি লিখা আছে। বাঙ্গালা ১২৯৭ সালে 'আমার জীবনী'র বিষয় আলোচনা হইয়াছে। পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন। আজ কোন্ দিন? ১লা আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৯ বৎসর পূর্বের সংকল্প।

খোদা তায়ালার কৃপা না হইলে কিছুই হয় না। ১৯ বৎসর মধ্যে সুযোগ সুবিধা করিতে পারি নাই। এখন দয়াময় প্রভুর অভিপ্রায় হইয়াছে—বোধ হয় তাহাতেই প্রকৃতি আজ আমার ঘাড় ধরিয়া 'আমার জীবনী' প্রকাশে দণ্ডায়মান করিয়াছেন।

আমার জীবনের শত শত ত্রুটী, শত শত 'জাহেলী' (মূর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান-সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি। 'আমার জীবনী' অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্বসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি-কঠোরতায় কেউ শুনিতেই ইচ্ছা করে না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেইরূপই প্রকাশ করিব।

উপক্রমণিকা

আমি কে?

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম, কত চিন্তা করিলাম—মাথার মগজ ক্ষয় করিলাম, কিছুই হইল না,—আভাস-ইঙ্গিতেও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জন-মানবহীন বিজনবনে, কতদিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, নিশীথ সময়ে নির্জন গৃহে, শয়নশয্যায়, দার্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে, নির্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরীনদীর তটে বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি—জানিতে পারিলাম না—আমি কে? যুগ-যুগান্তর কাটাইলাম—কিছুই নির্ণয় হইল না। পরিচয় পাইলাম না। আমি কে?

তবে একটা সত্য আবিষ্কার হইল, প্রমাণের সহিত উপলব্ধ হইল, আমি আদম-সন্তান, মানবকুলের অন্তর্গত, মনুষ্যত্ব বিহীন নরাকার জীববিশেষ। মানুষের সকলই আছে, আকারে সকলই আছে, নাই কেবল মনুষ্যত্ব।

হস্ত-পদ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক যাহা মানুষের দেহে দেখিতে পাই, তাহা আমার আছে। আর পেটের মধ্যে যাহা আছে শুনুন। প্রথম ক্ষুধা, পিপাসা, হিংসা-দ্বেষ, কুবাসনা, সুখভোগের ইচ্ছা, টাকার লোভ, লালসা, আশা, শঠতা, কৃত্রিমতা, কপটতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বহু সাজ-সরঞ্জাম পেটের মধ্যে আছে।

মাথা একটি। মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়। মাথায় কিছু থাকিলে এভাব হইবে কেন। যাহা সাধনা করিবার সাধ্য নাই—তাহাতে সাধ হয় কেন? যাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই—তাহা ধরিতে যাই কেন? যে আশা কখনই সফল হইবার নহে,—সে আশা হৃদয়ে পোষণ করি কেন? তাহাতেই স্থির করিয়াছি মাথাটায় কিছু নাই। চক্ষু আছে—থাকিলে কি হইবে? গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া থাকিলে মনের সহিত লড়াই করিতে হয়। দূর কর, বাহিরে যাই মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে খোলা মাঠে আমরা খোলা রাস্তায় যাই। কৃত্রিম সাজে সাজিয়া, যাহা নয় তাহা সাজিয়া, যে দরের লোক আমি নই তাহা সাজিয়া—পিতা প্রপিতামহ যে দরের সাজে বিশেষ বিশেষ স্থানে গমনাগমন করিতেন, হতভাগা আমি—এখন এইরূপ সাজে সাজিয়া সচরাচর রাস্তাঘাটে বাহির হই। আমার সাজ পোশাক দেখিলে—অচেনা লোকের নজরে পড়িলে তাহারা নিশ্চয় ভাবিবে যে, একজন দশ হাজারি লোক, অর্থাৎ আমার আয় বাৎসরিক দশ হাজার টাকা।

তাহা না হইলে সোনার ঘড়ি চেন। রেশমী কাপড়ের গোরার হাতের ছাঁটা 'চাপকান' আমার অঙ্গে শোভা করিবে কেন? দেশকালভেদে মন-মজান ছাঁট-কাটে, সে আর এখন চাপকান নাই পাপকান হইয়াছে। অর্থাৎ পাপকান সমান হইয়াছে—মাত্র মাথাটুকু জাগে। সে মাথাটুকু ঢাকিয়াছি কিসে? সব ধন্যবাদ, হাজার হাজার ধন্যবাদ না সারার। হ্যাটে মাথাটুক ঢাকি নাই। অসভ্য জাতির ন্যায় উলঙ্গও রাখি নাই—ঢাকিয়াছি। কিসে ঢাকিয়াছি? তুরুস্কদেশীয় ফেজ নগরের অথবা ইরানদেশীয় শিয়া সম্প্রদায়ের ইরানী টুপীতে। ভারতীয় মুসলমানের কি কিছুই নাই। মাথায় দিবার, মাথার শোভা বর্ধন করিবার কি কিছুই নাই?

যাহা হউক পথে বাহির হইলে চক্ষে দেখিতে চায় কি? লজ্জার কথা কি বলিব? সত্য কথা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই দু'টি চক্ষুই দেখিতে চায় —কামিনী আর কাঞ্চন। যেখানে টাকার ঝন্‌ঝনি আর শাঁখা বাজানার কন্‌কনি, সেইদিকেই দু'টি চক্ষু ছুটিয়া যাইতে চায়। ঘৃণার কথা। লজ্জার কথা—পাপের কথা—আর কি বলিব? ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতরা, রোগে শোকে জরাজীর্ণ-শীর্ণা স্থবিরার দিকে দৃষ্টিযন্ত্র দৃষ্টি করিতে চাহে না, বড়ই নারাজ। এই চক্ষের দশা।

হাত পা আছে—অকর্মার একশেষ। মসজিদে যাইতে কষ্টবোধ করে। অতি নিকটস্থ মসজিদে নামাজ (উপাসনা) সময়ে যাইতে কষ্টবোধ করে—

কিন্তু যে স্থানে পুণ্যের নামগন্ধ নাই,—পবিত্রতার কণামাত্র নাই, এমন স্থানে যাইতে পদমহাশয় পাথর ঠেলিয়া, ইট মাড়াইয়া, ঝাড়-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইতে প্রস্তুত। হস্তের কথা আর কি বলিব? সৎকার্যে বড়ই নারাজ—অপকার্যে ইচ্ছা না করিলেও তিনি প্রশস্ত।

কর্ণ মহোদয় শ্রবণ ইন্দ্রিয়, সকল কথাই তাহার শুনিবার শক্তি আছে। কিন্তু সৎ কথা সৎ উপদেশ শুনিতে চাহেন না। ঈশ্বরের করুণার কথা শুনিতে চাহেন না। সৎ কথার প্রসঙ্গেই কান পাতিতে চাহেন না—চাহেন কি? ওহে, আমার কর্ণ শুনিতে চায় কি?—পরনিন্দা, পরকুৎসা, আত্মীয়স্বজন, জাতির কষ্টের কথা, তাহাদের অনাটন অনাসন কথা, আর দু'কান পাতিয়া শুনিতে চায় আমার প্রশংসার কথা।

মনের কথা আর কি বলিব? সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।

এইত আমার দশা, সেই আমি। আমার আবার 'জীবনী'। তবে লোকাচারে যাহা দেখিতেছি, যাহা বুঝিতেছি—সেই পরিচয় দিয়াই জগৎ-সমাজে দণ্ডায়মান হইতেছি। জীবনের আদি-অন্ত ঘটনা শুনাইব। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব। হয়ত যেদিন আমার জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন হইবে, জীবনের ইতিও সেইদিন হইবে।

প্রিয় পাঠকগণ। আমি কপটভাব শিক্ষা করি নাই। যে কথা খোদা তায়ালার নিকট গোপন নাই, তাহা মানুষের নিকট গোপন করিব কেন? খোদা তায়ালা অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, শাস্তিদাতা, রক্ষাকর্তা—মার্জনাকারী।

। মীর মশাররফের কাছে লতিফুন্নেসার পত্র ।

প্রথম পত্র

কাকে বিষ্ঠা খায়—অনর্থক ডাকে। পেটে কিছুই রাখে না। ছোট লোক, মূর্খ, যা ইচ্ছে খায় পেটে রাখে না। কথা ভাল—কিন্তু সমাজভেদে দোষগুণের প্রভেদ, মূর্খের দলে বদনাম ও ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছু গোপন থাকিবে না। শয়নশয্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের আশা। যেখানেই পাইবেন, সেখানেই রাখিবেন। পাইব— কেহ নয়—

কালি কলম।

দ্বিতীয় পত্র

"আপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বিদেশ, আপন লোক কেহই সঙ্গে নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই। সকলেই পর—এ কয়েকটা কথা মন হইতে চিরকালের জন্য দূর করিবেন। এখানে সকলই আপনার—পর কেহই নাই। আপনার জীবনের সঙ্গিনী। আপনার সুখ-দুঃখের ভাগিনী যে—সেই এখানে আছে। জগতে এমন মায়া মমতা, একপ ভালবাসা সম্বন্ধ কাহার সহিত নাইও হইবে না—সেই এ বাড়ীতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্যগুণ বড় গুণ, বহু কালের কথা। আপনার নিকটে বলিতে লজ্জা হয়—"সবুরে মেওয়া ফলে।" আপনার উপরে—আপনার হস্তে যে আত্ম মন দেহ জাতি কুলমান মর্যাদা সমর্পণ করিবে, সেই এখানে আছে। প্রতিদিন এক পথে বেড়াইবেন না। এই গ্রামে আবালবৃদ্ধ সকলেই আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে পান সেখানেই রাখিবেন।

আপনারই—

'ল'"

তৃতীয় পত্র

মাথা খাও, পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি-ভাবে পড়িও না—আজ মন খুলিয়া লিখিলাম। আর শীঘ্র লিখিব না। দুইবার পড়িও। ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার তুমি আমার। তুমি আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী। ধর্মসূত্রে বাঁধা পড়ি নাই; তুমিও বাঁধা পড় নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় ভালরূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি। তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ জগতে থাকিতে তুমি অন্য কাহারও হইতে পার না। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি, স্থির করিয়াছি, তোমায় ছাড়া আমিও অন্য কাহারও হইতে পারিব না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল। আমি বয়োপ্রাপ্তা কুমারী—আমার কথাও অটল খাঁটি এবং বলবৎ। আমার কথা ওলট পালট করিবার সাধ্য কাহার নাই। "যদি" কথায় যেমন কথায় বাঁধা পড়ে, "কিন্তু" কথায় কথাটা উল্টাইয়া দেয়। তোমার আমার কথায় "যদি" বলিতে পারে না, "কিন্তু"ও আসিতে পারে না। তত্রাচ বলিয়া

রাখি, তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও—দাসীর এই ভিক্ষা। তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয়ই আমাকে বামে বসাইতে তোমারও সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা—ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা—জীবনেও তুমি, জীবনান্তেও তুমি আমার। মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়া শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও তুমিই আমার স্বামী; জীবন অন্তেও তুমিই আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ তাহা বলিতে পার। কারণ আমি প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখি। যখনি দেখি, বোধ হয় তুমি যেন কি ভাবিতেছ? তুমি পুরুষ, তোমার ভাবনা কিসের? আর যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভুল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে জানাইও। আমিও ভাবিব। কারণ আমি তোমার অর্ধাঙ্গিণী। ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও—সে-চক্ষের উপরে শূন্যভাবে আমার ছায়া সদাসর্বদা তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে। তোমার থাকিবে না কেন? যাই হউক, আমি তোমার দেখিবার উপায় করিব। আর বেশী নাই। এই আমার শেষ পত্র। সে সময় মুখেই বলিব। লিখা লিখির কথা থাকিবে না।

তোমারই দাসী।

চতুর্থ পত্র

স্বামীন। আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকারেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। দুইজন সাক্ষীর দরকার; আর একটা প্রধান কথা মোহরানা। দেন-মোহর কি পরিমাণ কত টাকা? প্রস্তাব স্বীকার উভয় পক্ষেরই হইয়াছে। বাকী দেন-মোহরের কথাটা। আমরা ইচ্ছা করিলে মোহরানাও ঠিক করিতে পারি। তাহা করি নাই কেন জান? পিতামাতা ভ্রাতার অবাধ্যতা প্রকাশ পায়। শুক্রবারে অবশ্যই হইবে। বিবাহ কথায় সকলেই সুখী হয়; অজানা অচেনা দেশের স্বামী-স্ত্রী হইলেই দুই পক্ষেই খুশীতে থাকে। যতই দিন ঘনাইয়া আইসে, ততই আহ্লাদ বাড়িতে থাকে। আমি যখনই দেখি, তোমার মুখে হাসি খুশীর চিহ্ন নাই। আমার যদিও পূর্বের এক ভাব ছিল, গতরাত্র

হইতে আর এক ভাব হইয়াছে। কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন। তুমি বোধ হয় স্বপ্ন বিশ্বাস কর। আমিও বিশ্বাস করি। আমাদের শাস্ত্রে আছে সকল স্বপ্ন সত্য হয় না। স্বপ্নমধ্যে অনেক কুস্বপ্নও আছে। আমাদের পয়গাম্বরগণ যখন সত্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফল ভোগ করিয়াছেন। আমরাও বিশ্বাস করিব। স্বপ্ন সকল মিথ্যা বলি কোন্ সাহসে? আমার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন। তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা। তোমার নিকট এখন আমার কোন কথা ত গোপন নাই। গোপনীয় ভাব নাই। গুপ্ত-নামের কিছুই নাই, সকলি প্রকাশ্য। আমার দেহ জীবন যৌবন সকলি তোমার। আজই শুনিয়াছি—মা বাপ দু'জনাই আমাকে তোমায় দিয়াছেন। কেবল লোকাচার আচার ব্যবহার কয়েকটি বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার। আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্ত হও, এ কথা আমার প্রাণে সহিবে না। তোমার জন্য আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর—কি সংসার পরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রিয় প্রাণ। প্রাণের ভালবাসা স্বামী। গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি। তোমার আমার বিবাহ হইতেছে। ধর্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইতেছে। ইহারই মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন প্রবীণ ব্যাঘ্র আসিয়া এক লম্ফে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল। তুমি বাঘের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়াছ; বাঘ যেন শেষে মানবরূপ ধারণ করিল। কদাকার ভয়ানক মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশীথ-রাত্রে তুমি যে গান করিয়া থাক, বাড়ীর লোকে কেউ জানে না। কেহ শুনিতে পায় না। যে সময় তুমি গান কর সে সময় কাহারও চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি। আর শুনিবার বিশেষ কারণ, তোমার শয়নকামরা আর আমার শয়নকক্ষ অতি নিকট তাহা তুমি জান না।

"স্বপ্নে দেখা দিয়ে আজি প্রভাতেতে কাঁদাইলে।" গানের শেষ চরণ যেন আমার কানে যাইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার মনে ডাকিয়া বলিতেছে, আমাদের কপালে সুখ নাই। চারদিকেই বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ হয় হউক, আমার জন্মভূমি, স্বদেশ, কোন ভয়ের কারণ নাই। একদিন জন্মিয়াছি, মরিব, নিশ্চয় মরিব বলিয়াই জন্মিয়াছি। মরিব জেনেই একাজ করিয়াছি তাহাতে আর ভয়ের কারণ কি?

তুমি সাবধানে থাকিও, হঠাৎ পাগলের মত কোন কার্য করিও না। এদেশে তোমার অতুল যশ চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খুব সাবধান। খুব সাবধান। সত্যিই যদি আমাকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার জন্য উতলা হইও না। এই আমার অনুরোধ।

মঙ্গলমতো বিবাহ হইয়া শুক্রবার গত না হইলে আমি বিবাহের বসন-ভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর সাজিয়া বাহিরে বার দিও।

তোমার চিরসঙ্গিনী
'স্ত্রী'

পূঃ আমি প্রতিদিন দেখিয়া থাকি; তুমি আমাকে দেখ নাই। উপায় করিব বলিয়াছিলাম। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আমায় কিছুই করিতে হয় নাই। মাতার পত্রই তাহার মূল। মাতার আন্তরিক যত্নই আমার প্রতিজ্ঞা সফল।

তোমারই লতীফন।

[মীর মশাররফের পত্র]

প্রথম ছত্রে 'প্রা' লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর 'প' লিখিয়াছেন। আমার মন সন্দেহযুক্ত নয়, খাঁটি মন। যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি; ঠিক করিতে পারিলাম না। আজ আপনি কিছুই বলেন নাই। আমিও কিছু বলিলাম না। দেখি প্রথমে আপনাকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমার 'মা' নাই আপনার আছে। আমার পিতা আছেন। আমার মাতামহী আছেন, আপনারও আছে। আমার মাতামহ নাই, আপনার আছে; আমার যাহারা আছেন, আজ পর্যন্ত কেহ জানেন না, আমি আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি। তাঁহারা হয়তো ভাবিতেছেন—আমি কলিকাতায় থাকিয়া ভাল থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন জানিতেছেন একরূপ, আমার আত্মীয়স্বজন জানিতেছেন অন্যরূপ। আমি কেন আসিলাম, ঈশ্বর জানেন। মনের কথা ঈশ্বর জানেন। যার জন্য আসিলাম—আসিয়াছি। "সে আমার" আমার মনে ইহা ধ্রুববিশ্বাস। পাহাড় টলিতে পারে, আমার এ কথা টলিতে পারে না। তবে সে কাহার তা সেই জানে। কারণ আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণ নির্ভর করা কর্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা

করে কে? পিতামাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন। যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না। এই যে এক ভয়ানক প্রথা—ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্বদা কাঁদে। কাকে বলিব। লোক নাই। নিজের কান্না নিজেই শুনি। পারিলাম না, লিখিতে পারিলাম না।

তোমারই—আমি।

[পত্রগুলি 'আমার জীবনী' দ্বাদশ খণ্ডের ৩৩৩-৩৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। মূল পুস্তকের প্রথম সংস্করণ লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য]

বিবি কুলসুম

(প্রথম সংস্করণ, ১৯১০, চৈত্র ১৩১৬)

আমি যে ঘ্রাণে আত্মহারা, মাতওয়ারা—যে ঘ্রাণ প্রাণ মন শীতল করিত, তাহা আর এখন পাই না। বাড়ীর সকলেই আছে, সুন্দর শ্যামবর্ণ কাল, একেবারে সাদা ধবধব তাহাও আছে, সকল প্রকার মুখই আছে দেখি, কিন্তু আমি যে মুখ চাই, তাহা দেখিতে পাই না। সে মুখ চাঁদবদনী নয়, সূর্যমুখী নয়, শুকতারার ন্যায় শুভ্র নয়, অপ্সরা সদৃশ সুদৃশ্য কান্তি নয়, সুরচার-বাসিনী সুন্দরীগণের ন্যায় মুখের অবয়ব নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গোলাল নহে, একটু দীর্ঘ ছাঁদের; হাসিভরা মুখখানি দেখিতে চাই। সেই দীর্ঘায়তন চক্ষু দু'টির স্নেহভাব, সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা, পূর্ণ চাহনি দেখিতে চাই, পাই না। কোথায় গেল। ঘরময় খুঁজি; পাই না। কোথায় গেল।

... ...

বিবি কুলসুম আমার জীবনীর জীবনী, জীবনের জীবনী, নয়ন মনরঞ্জনী, চিত্তহারিণী, চিত্তাকর্ষিণী, আমার কানে মধুর ভাষিণী, সুহাসিনী, আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদুঃখ ভোগিনী সমচক্ষে কমল-সদৃশ কমলা, সরলা, সতীসাধ্বী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, দয়াবতী, সর্বকার্যে সুমতি। স্নেহবতী, সত্যপ্রিয়া, সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী, পরিচালিকা, পাচিকা, ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী, পতিগতপ্রাণা, স্বামী-সোহাগিনী, প্রণয়িনী, স্বামী-

প্রেমে আত্মহারা, স্বামীর গুপ্ততত্ত্ব হৃদয় অভ্যন্তরে সুরক্ষিণী ; পরস্পর প্রেমানুরাগ, অপ্রকাশ্য ব্যবহার, ভালবাসা, প্রেম লিখন, পঠন, আন্তরিক যত্নে গুপ্ত অতি গুপ্তভাবে সংরক্ষিণী। জীবনের সঙ্গিনী পবিত্র অর্ধাঙ্গিনী। ধর্মপত্নী, একাদশ সন্তানের জননী, আমার বুদ্ধি-বিবেকে এত গুণের অধিকারিণী বিবি কুলসুম সুশ্রী ছিলেন না। তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ সুশ্রী নারী দুনিয়ায় রহিয়াছে। কিন্তু আমার চক্ষে যাহা তাহা প্রায় সকলি বলিয়াছি।

... ...

একদিন বেলা দুই প্রহর সময় দেখি আমাদের গ্রামের দক্ষিণের মাঝি-দিগের পাড়ায় আগুন লাগিয়েছে। ফাল্গুন মাস বাতাসও একটানা। ... ...

একটি যুবতী একাই দৌড়িয়াছে—আগুনের তাড়না, তাহার পর দুইটা ঘোড়ার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে হতাশ হইয়া ছুটিয়াছে। আমাকে রক্ষা কর, বাঁচাও বলিতেছে। দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই যে দেখিলাম। ঘরপোড়া আগুন দেখিতে না গেলে দেখিতাম না ; ঘোড়ায় তাড়া না করিলে আমার বক্ষের মাঝে লুকাইত না। অভয় দান করিলাম। বক্ষে বক্ষে স্পর্শ হইল। সে সুখে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রতি রক্তবিন্দুতে, আমার প্রতি রক্তবিন্দুতে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া দেহমন উষ্ণতর প্রবাহে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি দেখিতেছি কুলসুম কাঁপিতেছে। তাহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে। আমার বক্ষে তাহার বক্ষ, আমার কণ্ঠে তাহার মস্তক।

... ...

ধর্মতঃ তোমার গা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, পূর্ব হইতে, আমার যৌবন-কাল হইতে এখন তোমাকে চতুর্গুণ ভালবাসি। আর কিছুই নহে। সুখ-ভোগ আমি যত করিয়াছি, স্বামীর ভালবাসা প্রেম আমি যত লাভ করিয়াছি, এই চক্ষে আমি কাহাকেও আমার সমান স্বামীসুখে খুঁজিয়া পাই নাই।

নির্দেশিকা

ঈ

উ

এ

ও

ক

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধ পাঠ
৬	৮	গিয়াছে	গিয়েছে
৬	৮	'গো-জীবনী'	'গো-জীবন'
২০	২২	'জমিদার দর্পণ'	'জমীদার দর্পণ'
২৯	১৪	মিনতী	মিনতি
৩৪	৪	'হুতুম প্যাঁচার নকসা'	'হুতোম প্যাঁচার নকসা'
৩৯	৭	শেক্‌সপীয়ার ও	শেক্‌সপীয়ারও
৪৭	১২	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
৪৯	২৩	জমিদার দর্পণ	জমীদার দর্পণ
৫২	২১	অগ্নিসর্মা	অগ্নিশর্মা
৫৭	২৯	ধরনটি	ধারণাটি
৭৪	১৪	sweetten	sweeten
৮৪	১৮	'শোক-প্রকাশে'	'সোম প্রকাশে'
৯৩	২৮	যথাযথ	যথাযথ কারণ
৯৪	৭	ভেরাকান্তের	ভেড়াকান্তের
৯৪	১৫	হিতাকাঙ্ক্ষীণী	হিতাকাঙ্ক্ষিণী
৯৮	২৭	তথই	তখনই
১০১	২২	বিধৃত	বিবৃত
১০৮	৩০	প্রচারের	প্রচারকের
১১৫	১৬	পদ্যে	গদ্যে
১২৩	৪	নবকাল	নবকলি
১২৪	২৪	অল্লার	আল্লার
১২৬	২১	স্রোতা	শ্রোতা
১২৬	২৬	Strengther and sweeter	strengthen and sweeten
১৩৬	২৮	বাধিরা	বাধিয়া

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধ পাঠ
১৪১	১৯	আবৃতি	আবৃত্তি
১৪৭	২৬	বগদ	বনাদ
১৫২	৯	firied	fired
১৫৭	২৭	man	master
১৫৮	৬	দাসত্বপ্রথার	দাসত্বপ্রথা
১৫৯	২১	one	our
১৬১	২৫	Paramounty	Paramountey
১৮১	৯	Show	Shew
১৮১	১৪	Sumantan	Sumantau
১৮১	২৪	Conceald	Concealed
১৮৮	১৭	'সমর'	'সময়'
১৯৪	৩	dilect	dialect
১৯৪	৪	Pato is	Patois
১৯৭	২৫	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
২০০	২৬	ফ্রিডা	ফিড্রা
২০০	২৭	ফার্সী	ফরাসী
২০০	২৯	মুনির	মুনীর
২০৩	২১	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
২০৪	১, ২	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
২১০	১৪	সংমিশ্রণ ।[৭]	সংমিশ্রণ ।"[৭]
২২০	২০	অবদান ।"	অবদান ।
২১১	২৮	Rajosthan	Rajasthan
২১৪	১৭	no	not
২২২	১	যস্তু	বস্তু

বসন্তকুমারী নাটক

—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।"—

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

প্রণীত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সম্বৎ ১৯২৯।

উদাসীন পথিকের মনের কথা।

\ Udāsīna Pathika, pseud

স্বত্বাধিকারী

মীর মশাররফ্ হোসেন।

সান্তিকুঞ্জ—টাঙ্গাইল।

কুষ্টিয়া,—লাহিনীপাড়া হইতে

মীর মহতাব আলি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ১৲এক টাকা। *Price Re. 1.*

বিষাদ-সিন্ধু!!!

মহরম পর্ব্ব ।

BISHAD-SINDHU!!!

THE HISTORY OF THE MOHARAM.

মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রণীত,

ও

আইনুউদ্দীন বিশ্বাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY D. C. DASS AND CO., AT THE "CORINTHIAN" PRESS,

83, NEW CHINA BAZAR.

1885.

গাজীমিয়াঁর বস্তানী।

প্রথম অংশ।

স্বত্বাধিকারী

উদাসীন পথিক।

প্রকাশক

M. U. AHMUD.

কলিকাতা,

উইলিয়ম্‌স্ লেন, ৪ নং ভবনস্থ

দাস যন্ত্রে,

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৹, ডাক মাশুল ✓৹।